প্রাচীন বাংলা গীত ও গীতিকার

সুকৃতি সেন

এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৫৯

প্রকাশিকা
গৌরী সেন
ব্লক-ডি/১, ফ্ল্যাট্-৬
৪০/১ ট্যাংরা রোড
কলিকাতা-৭০০০১৫

পরিবেশক
এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা—৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ অলংকরণ
শুভাপ্রসন্ন

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক আর্থানুকুল্যে প্রকাশিত)

মুদ্রক
শুভেন্দু রায়
ঊষা প্রেস
৩২/এ, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৪

প্রকাশিকার কথা

সঙ্গীত জগতের পুরোধা আমার স্বামী সুকৃতি সেন মহাশয়ের হাতে বাংলা গান পরিপুষ্টি লাভ করেছে। তাঁর রচিত এবং সুরারোপিত বহু গান আজও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে আছে বহু জায়গায়। তিনি তাঁর এই সঙ্গীত প্রতিভাকে বিশেষভাবে উৎসর্গ করেছিলেন দেশমাতৃকার চরণে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মাধ্যমে গণ-জাগরণে আমার স্বামী যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তা ছিল সর্বজনবিদিত, আজ তা প্রায় বিস্মৃতির অতলে। এক সময়ে "জাগে নব ভারতের জনতা—এক জাতি এক প্রাণ একতা" বা "বন্ধন ভয় তুচ্ছ করেছি উচ্চে তুলেছি মাথা" প্রভৃতি গান মুখরিত হত বাংলার ঘরে ঘরে। 'অভ্যুদয়' গীতিনাট্যে স্বাধীনতাকামী আত্মত্যাগী মানুষ পেয়েছিল এগিয়ে যাবার প্রেরণা। আজ যেন শুধুই স্মৃতি। এখন সময় এসেছে সেই নির্ভীক একনিষ্ঠ দেশপ্রেমী সঙ্গীতাচার্য্যের অতীতকে আবার বাংলা তথা ভারতের জনমানসের সামনে তুলে ধরবার। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আমি প্রয়াসী হয়েছি তাঁর রচিত "প্রাচীন বাংলা গীত ও গীতিকার" এই গবেষণামূলক মূল্যবান গ্রন্থখানি প্রকাশ করবার দুর্লভ দায়িত্বপালনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে। শ্রী সেনের প্রতিভা শুধু সঙ্গীতজগতেই আবদ্ধ ছিল না তা ছিল বহুমুখী—এই গ্রন্থ রচনা তারই নিদর্শন হিসেবে নির্ণীত হবে। তাঁর অবর্তমানে বইটি প্রকাশ করতে আমাদের কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিছু ভুলত্রুটি রয়ে গেছে। আশা রাখি পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সংশোধিত আকারে প্রকাশে সমর্থ হব। বাংলা তথা ভারতবর্ষের পাঠক সমাজে বইখানি সমাদরে গৃহীত হলে বুঝব সেই হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির প্রদীপ আবার যথাযোগ্য সম্মান নিয়ে প্রজ্জ্বলিত হল আর আমিও হব কৃতার্থ ও ধন্য।

বইটি প্রকাশে যাঁর সাহায্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। যাঁর আংশিক আর্থিক আনুকুল্যে বইটি প্রকাশিত। 'ধন্যবাদ' এই ছোট্ট শব্দের ব্যবহারে খাটো না করে তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় এবং কবি শ্রীমান শ্যামসুন্দর দের সর্বতো উৎসাহ ও সহায়তাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের জন্য রইল আমার অকুণ্ঠ প্রীতি ও শুভেচ্ছা। পরিশেষে আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা

শ্রীমান অশোক রায়চৌধুরী যে দায়িত্ব পালন করেছে ও জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান চন্দন, জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুদেষ্ণা, কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুমিতা ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুরজ্যোতি এই গ্রন্থপ্রকাশে যে কর্তব্যবোধের পরিচয় দিয়ে স্বীয় পিতৃদেবের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছে—তাদের জন্য রইল আমার চির আশীর্বাদ ও দীর্ঘায়ুকামনা।

শুভায় ভবতু

শ্রীমতী গৌরী সেন

প্রাক্‌কথন

প্রয়াত শ্রীযুক্ত সুকৃতি সেন মহাশয় এ যুগের একজন খ্যাতনামা সুরকার ছিলেন। আধুনিক বাংলার গানের জগতে তাঁর অবদান বিশেষ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। গীতিকার এবং সুরকার এই দুই ভূমিকাতেই তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল তবে সুরকার হিসাবেই তিনি বাংলার সংগীতামোদী মহলে বিশিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠার স্থান আপন কৃতিত্ব বলে সহজে অধিকার করে নিয়েছিলেন। চল্লিশের দশকে কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের প্রযোজিত 'অভ্যুদয়' গীতি-নাট্যের গানে তিনি যেসব সুর সংযোজনা করেছিলেন তার চমৎকারিত্ব এখনও আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। অভ্যুদয় ছাড়াও আরও একাধিক গীতি-আলেখ্যে তিনি সুরসংযোগ করেছিলেন। তার মধ্যে 'শপথ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর বাণী ও সুর দুই-ই তাঁর নিজকৃত।

সর্বত্রই দেখা যায় তাঁর সুরের ভঙ্গীতে এমন একটা কিছু ছিল যা মৌলিকতার পর্যায়ে পড়ে। এই মৌলিকত্বের পিছনে ছিল আধুনিককালীন শ্রোতার রুচি-পছন্দ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সজাগতা অথচ ক্লাসিকাল সুরের বুনিয়াদকে বাদ দিয়ে যে আধুনিক সুরের মনোহারিতা দাড়াতে পারে না একই কালে সে সম্বন্ধেও সুস্থ সচেতনতা। ফলে তাঁর সুর সংযোজনায় ক্লাসিকাল ও মডার্নের যুগ্ম সমাহার সাধিত হয়ে তাঁর গানগুলি অপূর্ব শ্রী ধারণ করত। আধুনিক বাংলা গানের সুরারোপের ইতিহাসে সুকৃতি সেনের খ্যাতি সেই কারণে কোন দিনই নিষ্প্রভ হবার নয়।

কিন্তু চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সুকৃতি সেন মূলত সুরকাররূপে পরিচিত হলেও তাঁর নিজস্ব গীতিরচনার পরিমাণও কম নয়। এই ক্ষেত্রে দুটি কারণে তিনি ঐতিহ্যের ধারারক্ষী হবার গর্ব করতে পারেন। প্রথমতঃ কৌলিক সূত্রে তিনি সুপ্রসিদ্ধ গীতিকার কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের উত্তরবংশীয় ছিলেন, সুতরাং গীত ও সুরের সংস্কার তাঁর মজ্জার মধ্যেই ছিল। দ্বিতীয়ত বাংলার দীর্ঘকালগত সংগীত রচনার পরম্পরা সম্বন্ধে তাঁর সবিশেষ চর্চা ও অভিনিবেশ ছিল। চর্যাপদের কাল থেকে শুরু করে নানা বিবর্তনের স্তর বেয়ে একেবারে আধুনিক কালের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়া পর্যন্ত বাংলা গান কমপক্ষে হাজার বছরের সময়-সীমা পার হয়ে এসেছে। এই দীর্ঘবিস্তৃত অধ্যায়ের পরিধি-মধ্যে

বাংলা গানের যেসব বিশিষ্ট শ্রেণীরূপ গড়ে উঠেছিল, যথা চর্যাগান, কীর্তন, শাক্ত-সংগীত, পদাবলী কীর্তন, রামায়ণ গান, মঙ্গলগীতি, বারোমাস্যা, আগমনী ও বিজয়া গান, রামপ্রসাদী, শিবের গান, পাঁচালী, কবিওয়ালাদের গান, টপ্পা, তর্জা, হাফ-আখড়াই, থিয়েটারের গান, ব্রহ্মসংগীত, রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-নজরুল এবং উত্তর আধুনিক বাংলা গানের ধারা—বাংলা গানের নূতন-পুরাতন এই সব কয়টি রূপভেদ সম্বন্ধেই সুকৃতি সেন মহাশয়ের প্রভূত জ্ঞান ছিল। শুধু কিতাবী জ্ঞান মাত্র নয়, প্রায়োগিক জ্ঞান, অর্থাৎ হাতে-কলমে অনুশীলনের জ্ঞান। এই দ্বিবিধ জ্ঞানই তিনি তাঁর গীতিরচনায় ও সুররচনায় উভয়ত্র সুর সার্থকভাবে ব্যবহার করেছিলেন।

বাংলার ঐতিহ্যক্রমাগত সমৃদ্ধ গানের ভাণ্ডারের নানামুখী সঞ্চয় সম্বন্ধে তাঁর অধিকার কত পাকা ছিল এই সংকলন-গ্রন্থখানিই তার প্রমাণ। 'প্রাচীন বাংলার গীত ও গীতিকার', সংগ্রহের এই নামকরণ থেকেই বোঝা যায় তিনি এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন গ্রথিত করবার কথা ভেবেছিলেন, যার আরম্ভ চর্যাপদ থেকে এবং শেষ এই কালের সূচনা-পর্বে এসে। অর্থাৎ 'আধুনিক বাংলা গান' নামধেয় সংগীতের সূত্রপাত হওয়ার আগে পর্যন্ত অতীত, মধ্য ও বর্তমান বাংলা গানের দীর্ঘবিসর্পিত সংগীত সৃষ্টির বিশিষ্ট নমুনা সকল তিনি একটি প্রামাণ্য ও প্রতিনিধিত্বমূলক সংকলনের মধ্যে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই বৃহৎ পরিকল্পনার রূপদান প্রয়াসের এটি প্রথম খণ্ড। এতে অবশ্য তিনি শুরু করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর দুই শ্রেষ্ঠ বাংলা গানের রচয়িতা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় ও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের গানের সংগ্রহ দিয়ে; তবে তার ভূমিকা থেকেই জানা যায় তিনি তাঁর এই সংগ্রহ ও সংকলন প্রচেষ্টায় বাংলা গানের বহুশতাব্দীব্যাপী গোটা পরিধিটাকেই খণ্ডে খণ্ডে আবরিত করবার কথা ভেবেছিলেন। দুঃখের বিষয় ১৯৭২ সালে মৃত্যু এসে তাঁর এই বড় সাধের প্রকল্পের বাস্তবায়ণ প্রক্রিয়ায় অর্ধপথেই ছেদ ঘটিয়ে দিয়ে যায়, নয়তো তাঁর সংকলনের আদি-অন্ত-মধ্য সবকটি পর্বই হয়ত সুষ্ঠুভাবে ও সুসময়ে সুনির্বাচিত গীতিগুচ্ছের মাধ্যমে যথাবিধি আবৃত হতে পারতো। সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় হাজার বছরের বাংলা গানের একখানি ভাগে ভাগে বিন্যস্ত সংকলন পুস্তক প্রকাশিত হলে সে বড় চমৎকার জিনিস হতো।

আলোচ্য সংকলনে গ্রন্থকার ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা আলোচনা করার পর দুজনারই রচিত গানের বহুসংখ্যক নমুনা উপস্থিত

করেছেন। রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীত বাংলার ঘরে ঘরে সুপ্রচলিত ভক্তির সরল আকৃতি ও আত্মসমর্পণের সুতীব্র ব্যাকুলতায় এ গানের কোন তুলনা নেই। ভারতচন্দ্রের শিবগীতি ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ অবশ্য সেই অনুপাতে এতটা প্রচার-আনুকূল্য লাভ করেনি তাহলেও তার রচনায় শব্দঝঙ্কার, ছন্দনৈপুণ্য, মিলের কারিকুরি, এক কথায় শিল্পের উৎকর্ষ আজও রসভোক্তাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। রামপ্রসাদে ভাবের আন্তরিকতা; ভারতচন্দ্রে বুদ্ধি-বৈদগ্ধ্যের ঔজ্জ্বল্য—রসিকের নিকট দুইয়েরই আবেদন গ্রাহ্য।

এই গ্রন্থে সংকলক সর্বমোট চুয়াল্লিশজন গীতিকারের রচিত পদ সন্নিবেশ করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুজন ছাড়া আরও যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে কতিপয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন—রঘুনাথ দাস, রামনিধিগুপ্ত (নিধুবাবু), শ্রীধর কথক, রাজা রামমোহন রায়, দেওয়ান রামদুলাল, রাম বসু, হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা, রাসু ও নৃসিংহ, গোজলা গুঁই, নিত্যানন্দ বৈরাগী, কালী মীর্জা, রূপচাঁদ পক্ষী প্রভৃতি। নাম তালিকায় কবিওয়ালাদেরই প্রাধান্য এবং এঁদের অনেকে ইংরেজ অভ্যাগমের পরে আবির্ভূত হলেও তাঁদের মানসিকতায় বিগত যুগের ধ্যান-ধারণার প্রভাবই ছিল বোধহয় সমধিক। তাঁরা পূর্বতন শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব গীতের ভাবধারাতেই মূলত লালিত ছিলেন বলা যায়। একমাত্র প্রসিদ্ধ টপ্পাগীতিকার নিধুবাবু ছিলেন এ কথার ব্যতিক্রম। তাঁর ভাবজীবনে কম-বেশী ইংরেজী শিক্ষার আলো ক্রমে প্রবেশ করেছিল। ফলে তাঁর প্রণয়গীতির ধরণটাই যেন বদলে গিয়েছিল। যদিও শ্রীধর কথকের কোন কোন গানকে নিধুবাবুর অথবা বিপরীতক্রমে নিধুবাবুর কোন কোন গানকে শ্রীধর কথকের গান বলে চালানো হয়, তাহলেও একটু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে উভয়ের মধ্যেকার ভাবগত মৌলিক পার্থক্য চোখে না পড়েই পারে না।

সংকলক মাইকেল মধুসূদন-রচিত কতিপয় পদের সংগ্রহের দ্বারা এই গ্রন্থের সংকলন কার্য সমাপ্ত করেছেন। এটি উপযুক্ত কাজই হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাংস্কৃতির আবহে কর্ষিত রুচি অথচ বাংলাদেশের ধারাবাহিক কাব্য ঐতিহ্যেও যথোচিত পরিমাণে নিস্নাত অসামান্য প্রতিভাধর কোন কবির নাম করতে গেলেই অবধারিতভাবে আমাদের মধুসূদনের নাম মনে পড়ে। মধুসূদনের গীতচয়নের মধ্য দিয়ে এই খণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে সংকলন-সম্পাদক সম্ভবতঃ এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, অতঃপর বাংলা গানের যে সমস্ত নমুনা পরিবেশিত হবে সেগুলির মধ্যে আর পূর্বযুগের গানের ঘরোয়া আটপৌরে সুর আশা করা অনুচিত হবে, তাতে মিলবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাব সম্মিলনের জারক

রসে জারিত মিশ্র সংস্কৃতির রস। এই মিশ্র বা যুগ্ম-সংস্কৃতিই আধুনিক গানের প্রাণ।

বইখানায় এক আধারে প্রচুর জ্ঞানের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বমূলক এত গান একসঙ্গে পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়। বইয়ের অন্য আকর্ষণ ছেড়েই দিলাম এইজন্যও বইখানি বাংলার ঘরে ঘরে আদৃত হওয়া উচিত।

নারায়ণ চৌধুরী

কয়েকটি কথা

চল্লিশের দশকে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বর্গত সুকৃতি সেন বাংলার সংগীত জগতে যে এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন সে কথা ভুলবার নয়। সুকৃতিবাবু নিজে ছিলেন নিপুণ গায়ক, তদুপরি গীতিকার এবং সুরকার। তাঁর কণ্ঠে বাংলা গান বিশেষত দেশাত্মবোধক গান একই সঙ্গে কত মধুর ও ওজ: শক্তি সম্পন্ন হ'য়ে উঠত তা স্বকর্ণে যারা না শুনেছেন তারা হয়ত' আজ উপলব্ধি করতে পারবেন না।

বর্তমান গ্রন্থে সুকৃতিবাবুর আর একটি পরিচয় উদ্ঘাটিত হল। তিনি কেবল গীতি-শিল্পের নিবেদিতপ্রাণ সাধকই ছিলেন না, বাংলা সংগীতের একজন তথ্যনিষ্ঠ গবেষকও ছিলেন। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে মাইকেল মধুসূদন পর্যন্ত চুয়াল্লিশ জন প্রাচীন বাংলা গীতিকারের রচনা সংকলন করে একত্রে গ্রথিত করেছেন, এবং প্রত্যেক গীতিকার সম্বন্ধে ভূমিকাস্বরূপ মনোজ্ঞ আলোচনাও করেছেন।

এ বই কেবল গবেষক পণ্ডিতজনের কাছেই নয়, সংগীতরসপিপাসু সকল ব্যক্তির কাছেই সমাদৃত হবে বলে আশা রাখি। আরেকটি কথা এই গ্রন্থপ্রকাশে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকার রূপ নিয়ে গ্রন্থপ্রকাশে সফল হয়েছে আমার সেই স্নেহভাজন শ্রীমান্ অশোক ও সুদেষ্ণাকে জানাই সাধুবাদ ও অন্তরের চির আশীর্বাদ। অলমতি।

বিনয় সরকার

প্রতিষ্ঠাতা, ভারতীয় সংস্কৃতি ভবন

ও

বাংলা সাহিত্য একাডেমি।

নিবেদন

১৯৪৪ সালে কলকাতার কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ যখন দেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করিয়াছে, সৌভাগ্যক্রমে আমি তখন তাহার সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়ি। সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য ও প্রচার বিভাগের পরিচালক হিসাবে কাজ করিবার সময়ে শ্রদ্ধেয় অনাথদার (অনাথবন্ধু) তাগিদে খুঁজিয়া খুঁজিয়া পুরানো গীত সব বাহির করিতাম। শ্রদ্ধেয় 'সজনীদা (সজনীকান্ত দাস), প্রিয়দা (প্রঃ প্রিয়রঞ্জন সেন) বন্ধু শহীদ শচীন মিত্র আর সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের তাগিদেও নানা আসরে পুরানো সব গীত গাহিতে হইত। এই সবার চাপে পড়িয়াই প্রাচীন গীতসংগ্রহ করিবার বাসনা আমার জন্মে। ধীরে ধীরে কিছু কিছু কাজ করিতে থাকি।

বহুদিন পর বাংলার সুযোগ্য ও অন্যতম প্রকাশক বন্ধু অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় একদিন সহসা এই ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে আমার রুদ্ধ উৎসাহ যেন একটি প্রকাশের পথ খুঁজিয়া পায়। এই সঙ্গে আরও দুইজন বন্ধুর উৎসাহও আমাকে উদ্দীপিত করিয়াছিল। তাঁহারা দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। সাহিত্যিক নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ও এই গ্রন্থের মুদ্রণের ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাকেও এই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই।

যাহাদের উৎসাহে আমার এই লেখার শুরু ও প্রকাশ সেই অকৃত্রিম শ্রদ্ধেয় বন্ধু সকলের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

বইটির মালমশ্‌লা সংগ্রহ করিতে অনেক গ্রন্থের সঙ্গে বহু প্রাচীনকালে প্রকাশিত "বাঙ্গালীর গান" গ্রন্থটি হইতে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, সেজন্য ওই সব গ্রন্থের সংগ্রাহক ও প্রকাশকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এ বইটির প্রকাশে বাংলাভাষার বনিয়াদের উপর শ্রদ্ধা ও আগ্রহ যদি জনসাধারণের মধ্যে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে আমি কৃতার্থবোধ করিব।

বিনীত—

সুকৃতি সেন

সূচীপত্র

ভূমিকা

কথ্য বাংলা ভাষার জন্ম বহুদিন হইলেও লেখ্য বাংলা ভাষার জন্ম বোধ হয় বৌদ্ধ চর্যাগানের পদ হইতেই। কিন্তু সে ভাষা আজ আর সহজবোধ্য নয় বলিয়া সাধারণ্যে প্রচারিত নহে। তাহার পর চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং সম-সাময়িক রচনাগুলিও আজ আর সহজবোধ্য নহে। পরিবর্তনই জীবনের লক্ষণ। তাই পৃথিবীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দেশের সংস্কৃতি ও ভাষা আপনা হইতেই বদলাইতে বদলাইতে আসিয়া আজ যে পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে আমাদের ভাষার পর্যায়ে তাহাকে আমরা আধুনিক বাংলা ভাষা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। কিন্তু যুগে যুগে পরিবর্তিত ভাষা, সেই যুগের আধুনিক ভাষা বলিয়াই পরিগণিত হইত। আজ যাহা প্রাচীন একদিন তাহা আধুনিক বলিয়াই প্রচলিত ছিল; এবং আজ যাহা আধুনিক সুদূর ভবিষ্যতে একদিন তাহা প্রাচীন বলিয়া কথিত হইবে।

বাংলা ভাষায় বহু শাখার রচনার মধ্যে প্রাচীন গীতিকারদের গীত-রচনা-গুলিই শ্রেষ্ঠ। আজ পর্যন্ত প্রাচীন যত রচনা সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রাচীনতম ভারতচন্দ্র হইতেই এই গ্রন্থের শুরু করিয়াছি। বাংলায় দ্বাদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ও সার্থক সাধক সিদ্ধকবিদের রচনা লইয়া আলোচনার কারণ ইহাই যে, আজিকার আধুনিক ভাষার গোড়ায় যে প্রাচীন ভাষা ওই রচনাগুলি সেই ভাষা হইতে সৃষ্টি। ওই সব রচনার উপর ভিত্তি করিয়াই পরবর্তী বা আধুনিক কালে বাংলা ভাষা সুদৃঢ় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ধারাবাহিকভাবে জন্ম-বৎসর লইয়াই কবি ও তাঁহাদের রচনা সন্নিবেশিত করা হইল। এই গ্রন্থে মাত্র ছয়চল্লিশজন বিখ্যাত কবির স্বল্প পরিসর জীবনী ও তাঁহাদের যতগুলি গীতরচনা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে তাহাই নিবদ্ধ করিয়াছি। ইহা কচিৎ হয়ত কখনও কোথাও কোন সুপ্রাচীন গ্রন্থে আরও দুই একটি রচনার সন্ধান মিলিতে পারে, তবে তাহা দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। ইহা ছাড়াও বহু অখ্যাত ও অনামী লোকের রচনাও ভণিতাসহ

ভ্রমবশতঃ কোনোদিন অতর্কিতে হয়ত খ্যাতনামা রচয়িতাদের রচনাগ্রন্থের মধ্যে সংযোজিত হইয়াছে। আজ আর সেগুলি আলাদা করা মুস্কিল। তবু যতটা সম্ভব রচনার মান দেখিয়া বুঝিয়া কোথাও কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকিলে, মাত্র তাহাই কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ করিয়াছি। যে সব রচনা সংগৃহীত হইয়াছে কবিপরিচিতির পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

এই প্রথম গ্রন্থে যে ছয়চল্লিশজন কবির রচনা সংযোজিত করিয়াছি তাঁহাদের নাম—১। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র; ২। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ; ৩। রঘুনাথ দাস; ৪। রামনিধি গুপ্ত। (নিধুবাবু); ৫। দেওয়ান ব্রজকিশোর; ৬। দেওয়ান মহাশয়; ৭। দেওয়ান নন্দকুমার; ৮। নিত্যানন্দ বৈরাগী; ৯। রাজা রামমোহন; ১০। দেওয়ান রামদুলাল ১১। রাম বসু; ১২। রাসু ও নৃসিংহ; ১৩। লালু নন্দলাল; ১৪। গোঁজলা গুঁই; ১৫। কেষ্টা মুচি; ১৬। ভোলা ময়রা; ১৭। নীলু ঠাকুর। ১৮। যজ্ঞেশ্বরী ইত্যাদি। ইহা ছাড়াও বহু বিখ্যাত কবির জীবনী ও রচনা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করার বাসনা রহিল। এইরূপ অসংখ্য রচনা সংগৃহীত রহিয়াছে। বাংলার জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সেগুলি প্রকাশ করিতে পারিলে একটা কাজের মত কাজ হইবে।

কবিতা রচনা এবং গীত রচনার মধ্যে বেশ একটা পার্থক্য আছে। কবিতা—পাঠ করিয়া, বুঝিয়া, রস উপলব্ধি করিতে হয়। কিন্তু গান কানে শ্রবণমাত্র বুঝিয়া সুর তাল মান সহযোগে রস উপলব্ধি করিতে হয়। তাই কবিতার ভাষা ও গঠন যদি একটু কঠিন হয় তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু গানের ভাষা কঠিন হইলে অনেক সময় তাহা শ্রোতার কাছে দুর্বোধ্যই থাকিয়া যায়। গানে শুধু ভাষা বুঝিলেই তো চলিবে না, একই সময়ে একই সঙ্গে সুর বুঝিতে হইবে, তাল বুঝিতে হইবে, মান ও লয়ও বুঝিতে হইবে, এবং সব জড়াইয়া উহার একটি অখণ্ড রস মনের ভিতর গ্রহণ করিতে হইবে। এই কারণেই যে গীত রচনার ভাষা যত সুন্দর অথচ সহজ ও সাবলীল হয় তাহাই শ্রোতার মনের উপর তত বেশী গভীরভাবে দাগ কাটে। গান শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে গীতরচনার অর্থ বোঝা চাই। নইলে একটু চিন্তা করিতে গেলেই পরেরটুকু গীতছন্দের গতিতে হারাইয়া যাইতে পারে। এই কারণে গীতরচনার ভাষা সর্বসাধারণের জন্য যত সহজবোধ্য হয় তত ভালো। এ-বিষয়ে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, হরুঠাকুর, নিধুবাবু এবং প্রাচীন অন্যান্য কবিরা যেন যাদুকর ছিলেন। কী অপূর্ব সহজবোধ্য ভাষায় গীত রচনা করিয়া তাঁহারা যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা মঙ্গলের' গান শিবসঙ্গীত বা দেবী সঙ্গীত শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের যে কেহ তাহার অর্থ বুঝিতে পারিবে। যেমন ;—

শিবনাম বলয়ে জীব বদনে
যদি আনন্দে যাবে শিব সদনে।

সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের দেবতা শিবের সম্বন্ধে এ গান ভক্তের মনে অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি করে ; যখন উপযুক্ত সুর সহযোগে কানের ভিতর দিয়া একথাগুলি মর্মে পৌছায় তখন উহাদের আক্ষরিক অর্থ ঘুচিয়া গিয়া উহাদের মধ্যে অসাধারণ ব্যাঞ্জনার সঞ্চার হয়। অন্নদামঙ্গলের দেবী সঙ্গীতেও অনুরূপ অপূর্ব সব রচনা রহিয়াছে।

উমা দয়া কর গো,
বিষম শমন ভয় হর গো
পাপেতে জড়িত মতি, কাতর হয়েছি অতি
পতিত পাবন নাম ধর গো॥

অথবা আগমনীর গান—

বড় আনন্দ উদয়,
বহু দিনে ভগবতী আইল আলয়"
শঙ্খ ঘণ্টারব মহামহোৎসব
ত্রিভুবনে জয় জয়।

এই সব গীত রচনা বাংলা ভাষার অতুলনীয় সম্পদ আজিও এই সব গান সুষ্ঠু সুরে ও ছন্দে পরিবেশিত হইলে অচিরেই তাহা শ্রোতার মনোহরণ করিবে।

হরগৌরীর মূর্তি যেন অন্য একটি গীত রচনায় সজীব হইয়া ফুটিয়া ওঠে।—

কি-এ নিরুপম শোভা মনোরম
হরগৌরী এক শরীরে।
শ্বেত পীতকায়, রাঙ্গা দুটী পায়
নিছনি লইয়া মরিরে।—

অপূর্ব এ রচনা। রস-সৌন্দর্যে একেবারে উজ্জ্বল, উদ্বেল, ভরপুর। সুরে গীত হইলে ইহার শক্তি আরও বাড়িয়া যায়। সহজ অথচ কথার অলঙ্কারের ছটায় ধ্বনির বিন্যাসের যে অপূর্ব যাদুকরী শক্তি, তাহা ভারতচন্দ্রের রচিত গীত রচনাতে পরিপূর্ণ গরিমায় জাজ্জ্বল্যমান। যেমন শিবসঙ্গীতে।—

জয় জয় জয় হর রঙ্গিয়া
কর বিলসিত নিশিত পরশু, অভয় বর কুরঙ্গিয়া।

লক্ লক্ ফণি জটা বিরাজ,

তক্ তক্ তক্ রজনী বাজ,

ধক্ ধক্ ধক্ দহন সাজ, বিমল চপল গঙ্গিয়া,

রাগ বসন্তে এ রচনা গীত হইলে শব্দ-বিন্যাসের ছটায় এ সুরের সৌন্দর্যে পৃথিবীর যে কোন লোক ভাষার অর্থ না বুঝিলেও গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইবে। বাণী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে যে ছবি অঙ্কিত হইতে থাকে তাহা সেই শ্মশানবাসী শিব ও তাহার পারিপার্শ্বিক ডাকিনী যোগিনী প্রমথর ছবি। সকলেরই মূর্তি যেন চোখের সামনে জ্বল জ্বল করিয়া ভাসিয়া ওঠে।

ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল,

হুলু হুলু হুলু যোগিনী-বোল,

কুলু কুলু কুলু ডাকিনী রোল, প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া

আবার হরগৌরীর গীত রচনাতে অর্ধনারীশ্বরের যে চিত্র চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে তাহা অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত।

আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে

আধ পট্টাম্বর সুন্দর সাজে,

আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে

আধ ফণীফণা ধরিয়ে ॥

আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা,

আধ মণিময় হার উজালা,

আধগলে শোভে গরল কালা

আধই সুধা মাধুরীয়ে ॥

বঙ্গ-সাহিত্যে এমন অপূর্ব গীত রচনা আধুনিক কালে কতটা হইয়াছে আমার জানা নাই। মনে হয় ভারতচন্দ্র এইরূপে গীত রচনাতে ধ্বনির সমন্বয়ে যে চিত্র আঁকিতেন, সে রূপ রচনায় তিনি অপরাজেয় কবি গীতিকার। আবার দেবী-সঙ্গীতে আধ্যাত্মিকতার চরমে উঠিয়া রায়গুণাকর গাহিয়াছেন—

কে তোমা চিনিতে পারে গো মা।

বেদে সীমা নাহি দিতে পারে ॥

কত মায়া কত, কত কায়া ধর,

হেরি হরি—হর—হারে।

জিত—জরামর হয় সেই নর

তুমি দয়া কর যারে ॥

কত আর নজীর দেখাইব! কত আর বিশদ ভাবে ভারতচন্দ্রের রচনা বিচার করিব! সব কিছু পড়িলে স্বতঃই বোঝা যায় কত বড় শক্তিধর গীত রচয়িতা ছিলেন বঙ্গ-সাহিত্যের অমর কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র। কৃষ্ণ সঙ্গীতেও তাঁহার সমান পারদর্শিতা।

জয় কৃষ্ণ কেশব রামরাঘব
কংস দানব ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন নন্দ-নন্দন
কুঞ্জ কানন রঞ্জন॥

রিন্ রিন্ করিয়া সঙ্গীতের সুর যেন ইহার ছত্রে ছত্রে স্বতঃই বাজিতে থাকে, অথচ কৃষ্ণচরিত্র এইটুকু রচনার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান—

জয় কেশিমর্দ্দন কেটভার্দ্দিন
গোপিকাগণ মোহন।
জয় গোপবালক বৎসপালক
পুতনাবক—নাশন॥
জয় গোপবল্লভ ভক্ত-সল্লভ
দেব দুর্লভ বন্দন।
জয় বেণুবাদক কুঞ্জ নাটক
পদ্ম নন্দক—মণ্ডন॥
জয় শান্তি-কালিয় রাধিকা প্রিয়
নিত্য নিষ্ক্রিয় মোচন।
জয় নিত্য চিন্ময় গোকুলালয়
দ্রৌপদী ভয় ভঞ্জন॥

বঙ্গ-ভাষা রসিক জনের পক্ষে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' পাঠ না করিলে পাঠকের একটা দিক অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। "কামগন্ধ নাহি তায় তবু অঙ্গ শিহরায়"—এমনি যে প্রেম, তাহারই অপূর্ব বর্ণনা বিদ্যাসুন্দরের বহু রচনার ছত্রে ছত্রে রহিয়াছে। যেমন—

কি বলিলি মালিনী ফিরে বল বল,
রসে তনু ডগমগ মন টল টল॥
শিহরিল কলেবর তনু কাঁপে থর থর
হিয়া হৈল জরজর আঁখি ছল ছল
তেয়াগিয়া লোকলাজ কুলের মাথায় বাজ
ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল॥

ভক্তিরসের সঙ্গে প্রেমধারার কি অপূর্ব মিলন! তাই ভারতচন্দ্র আজও আমাদের সাহিত্যে স্থায়ী আসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার রচিত গীতে প্রাণমন ভরিয়া যায়। তৃপ্তিতে নয়ন মুদিয়া আসে।—

মোর পরাণ-পুতলী রাধা
সুতনু তনুর আধা॥
দেখিতে রাধায় মন সদা ধায়
নাহি মানে কোন বাধা।
রাধা সে আমার আমি সে রাধার
আর যত সব বাঁধা॥
রাধা সে ধেয়ান রাধা সে গেয়ান
রাধা সে মনের সাধা॥

রসোদ্বেল এইরূপ গীত রচনা শুধু বর্তমানেই নয় ভবিষ্যতেও বহুদিন পর্যন্ত গীতিকারদের অপূর্ব খোরাক জোগাইয়া তাঁহাদের কাব্যের ঊর্ধ্বলোকে লইয়া যাইতে উদ্বুদ্ধ করিবে।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের সরস রচনাবলীর পরেই আমরা আসিয়া পড়িলাম সাধক রামপ্রসাদের কালী-বিষয়ক সার্থক সাধন সঙ্গীতের আলোচনায়। রামপ্রসাদী গান বলিলেই কালী কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত বোঝায় ইহা বাংলার কোন লোককে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হয় না। আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে না উঠিলে রামপ্রসাদের গীত রচনার মত অন্তর-নিংড়ানো ভক্তিরস-সিক্ত রচনা সকল বাহির হইতে পারে না ইহা স্বতঃই অনুমেয়। মা কালীর কাছে চাহিয়া বসিলেন তবিলদারী। সাধক না হইলে এমন স্পর্ধিত চাওয়া আর কাহার হইতে পারে—

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী॥
পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে মা,
ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা,
সে যে ভোলা ত্রিপুরারি॥

সহজ সরল স্বচ্ছ ভাষার অপূর্ব বাঁধুনি। গীত শুনিলে প্রাণ মন বিগলিত হইয়া যায়। গীত রচনার ভাষা যেন মায়ের কাছে সন্তানের আবদার—

শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা
তবু জিম্মা রাখ তারি

অর্ধ অঙ্গ জায়গির,

তবু শিবের মাইনে ভারি।

যাঁহার অন্তরে শিব প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, যিনি শ্যামা মায়ের দর্শন প্রতি মুহূর্তেই পাইয়া থাকেন, তিনি ছাড়া এমন রচনা কে লিখিবে।—

আমি বিনা মাইনের চাকর

কেবল চরণধূলার অধিকারী।

যদি তোমার বাপের ধারা ধর

তবে বটে আমি হারি॥

মহারাজ দক্ষ দেবীর পিতা। তাঁহার উল্লেখ মাত্রে বোঝা যায় তিনি পুরান বর্ণনায় কত সহজ রচনা রচিয়াছিলেন, কত নির্ভীক নির্মল সত্যদ্রষ্টা, জ্ঞানী রচয়িতা সাধক রামপ্রসাদ।

"যদি আমার বাপের ধারা ধর।"

আমার বাপ অর্থাৎ পিতা হচ্ছেন স্বয়ং শিব যিনি আশুতোষ রূপে অতি অল্পেই তুষ্ট এবং দানে মুক্তহস্ত—

তবে তোমা পেতে পারি।

প্রসাদ বলে এমন পদের

বালাই লয়ে আমি মরি

ও পদের মতো পদ পাই তো

সে পদ লয়ে বিপদ তরি।

একই ধরনের কালী বন্দনা, প্রায় সর্বত্রই একই ধরনের সুর অথচ প্রতিটি রচনা যতবার শোনা যায় ততবারই যেন নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়। প্রতিটি গীত রচনাই যেন পৃথক পৃথক হীরকখণ্ডের ন্যায় নিজের আলোকেই সমুজ্জ্বল।

ডুব দে মন কালী বলে

হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।

সাধক ডুব দিতেছেন কালী নাম স্মরণ করিয়া হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে, কত বিচিত্র মণিমুক্তাই যে তিনি সেখান হইতে আহরণ করিয়া আনিয়াছেন তাহার সীমা-সংখ্যা নাই ওই একই সুরে যখন গান শুনি—

মা আমায় ঘুরাবি কত?

কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মতো

ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা,

পাক দিতেছ অবিরত।

তুমি কি দোষে করিলে আমায়
ছটা কলুর অনুগত ॥

তখন এই ভবসংসার চক্রের পাক খুলিয়া শ্যামাপদে শরণ লইতে কার না ইচ্ছা যায়। ছয়টি কলু ছয়টি রিপু, তাহাদের বশবর্তী হইয়া থাকিতে রামপ্রসাদের অপরিসীম বেদনা। মুক্তি চাই, ছয়টি রিপুর কবল হইতে মুক্তি চাই। তাই শ্যামা ধ্যান শ্যামা জ্ঞান। একমাত্র শ্যামাই যাঁর সাধনা তিনি তীর্থধামে গিয়া পুণ্যাভিলাষী হইবেন না ইহা স্বতঃই বোঝা যায়। তাই সাধক রামপ্রসাদ গাহিলেন,—

আর কাজ কী আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া
গঙ্গা বারাণসী ॥
হৃৎকমলে ধ্যান-কালে আনন্দ সাগরে ভাসি,
ওরে কালী পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ॥

এমনি সব কালী সাধনার অপূর্ব গীত রচনা করিয়া সাধক রামপ্রসাদ শুধু যে বঙ্গ-সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন তাহা নহে; হিন্দু ধর্মাবলম্বী শক্তির পূজারীদের জন্য এক নূতন ও সহজ সরল পন্থাও রচনা করিয়া গিয়াছেন। কায়মন দিয়া ভক্তিরসে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই ধরনের গীত গাহিলে আর তন্ত্রমন্ত্র আওড়াইতে হয় না। এই গানেই মুক্তি, এই গানেই তৃপ্তি, এই গানেই মোক্ষফল পাওয়া যাইতে পারে। এই সব গীত রচনার ভিতর ধ্বনি সমন্বয়ের এমনই সাধকোচিত সিদ্ধহস্তের স্পর্শ। উত্তরকালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে আমরা যেন ওই রূপেই দেখিতে পাই। সর্বদাই কালী ভাবে তদ্‌গত হইয়া আছেন। এইরূপ উর্ধ্বমার্গের সাধনাবস্থাতেই রামপ্রসাদ লিখিয়া গিয়াছেন।—

"এবার কালী তোমায় খাব।"

সাধনার কোন্ পর্যায়ে উঠিলে উক্তরূপে রচনার গীত কেহ গাহিতে পারে তাহা স্বতঃই বোঝা যায়। অন্তরে কালী দর্শন না ঘটিলে, বা হৃৎকমলে সদা-জাগ্রতা কালী না থাকিলে এরূপ গীত রচনা স্পষ্টতঃই সম্ভব নয়। তাই সিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদের রচনা কালী কীর্তনগুলি ভক্তিরসে প্লাবিত হইয়া মনুষ্য-সমাজে চিরদিনই বর্তমান থাকিবে। আমাদের অসীম সৌভাগ্য যে রামপ্রসাদ বঙ্গভাষাভাষী ছিলেন, আর তাই আমাদের বঙ্গসাহিত্য এই সব রচনাতে সমৃদ্ধশালী হইয়াছে। কালীর রূপ বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত রামপ্রসাদ লিখিলেন।

(হের) কার রমণী নাচেরে ভয়ঙ্করা বেশে।
কেরে, নব-নীল-জলধর কায় হায় হায়,
কেরে হর হৃদে হৃদ্‌পদে দিগ্‌বাসে॥
কেরে নির্জনে বসিয়া নির্মাণ করিল
পদ রক্তোৎপল জিনি,
তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী ;
হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে,
বাঁধি প্রেমডোরে, রাখি হৃদি সরোবরে
হিল্লোলে ভাসে॥

শ্যামার রূপ যেন এই গীত রচনার ছত্রে ছত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।—মায়ের প্রতি ভালবাসার গভীরতা যথেষ্ট না থাকিলে এ ধরনের গীত কেহ রচনা করিতে পারে না। প্রতিদিন প্রভাতে প্রতিটি কর্মের শুরুতে, প্রতিটি পদক্ষেপে যাহাতে মানুষ দুর্গতিহারিণী দুর্গার কথা ভুলিয়া না গিয়া বরং শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁহাকে স্মরণ করে তাই রামপ্রসাদের মিনতি,—

শ্রীদুর্গা নাম ভুল না।
ভুল না ভুল না ভুল না
শ্রীদুর্গা স্মরণে সমুদ্র মন্থনে
বিষপানে, বিশ্বনাথ মল না।
যদ্যপি কখনো বিপদ ঘটে
শ্রীদুর্গা স্মরণ করগো সঙ্কটে।
তারায় দিয়ে ভার সুরথ রাজার
লক্ষ অসিঘাতে প্রাণ গেল না।

এই সব সাধক পুরুষেরা ধর্মকে যেভাবে ধারণ করিবার জন্য সত্যপথ অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহাই সুষ্ঠু ও মুক্তির উপায়। নহিলে পৃথিবীতে যে ধরনের ঘোর তমসা মাঝে মাঝে মনুষ্য সমাজকে অন্ধকারে নিয়ত পীড়ন করিতে থাকে তাহা কাটাইয়া আলোক দেখিবার কোন উপায়ই থাকিত না। আমাদের মনকে ডাকিয়া তাই রামপ্রসাদের ভাষায় বলিতে পারি

মনরে আমার ভোলা মামা,
ও তুই জানিস নারে খরচ-জমা।
যখন হইতে ভবে এলি
তখন হইতে খরচ পেলি
ওরে জমা খরচ ঠিক করিয়ে
বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা॥

সব গুণ কালীর চরণে জলাঞ্জলি দিয়া সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ তিনটি গুণই বিয়োগ দিয়া শূন্য করিয়া ফেলিতে পারিলেই তবেই তো আসল মুক্তি। সংসারে যাহা কিছু তোমার সম্বল আছে সব বিয়োগ করগো, সব বাদ দাও আর ক্রমে শূন্য নামাইতে থাক তবেই ত পূর্ণ মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটিবে। কী অপূর্ব বৈরাগ্যের বিশ্লেষণ! সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া পরমার্থ ভোগ করাই তো মানব জীবনের আসল কাম্য। কত সহজ কথায় কত দুরূহ বিষয়ের বিশ্লেষণ। তাই তো রামপ্রসাদ আজও চির নূতন।

রামপ্রসাদের নামোচ্চারণমাত্র শ্যামাসঙ্গীতের কথাই প্রথমে মনে পড়ে। কিন্তু রামপ্রসাদ-রচিত আগমনী সঙ্গীত, কৃষ্ণসঙ্গীত, শিবসঙ্গীত, তত্ত্বসঙ্গীতও অনেক আছে। এবং 'বিদ্যাসুন্দর'ও যে তিনি সার্থকভাবে রচনা করিয়াছিলেন তাহা দেশের অনেকেই হয়ত বিশদভাবে জানেন না। বিদ্বজ্জন অবশ্য তাঁহার ঐ সব রচনা খুঁজিয়া খুঁজিয়া পাঠ করেন। তাঁহার রচিত কৃষ্ণসঙ্গীত শ্রবণে শব্দ ও ভাবের অপূর্ব বিন্যাসে অন্তরে যেন পূর্ণচন্দ্রকিরণচ্ছটা বিকীরিত হয়। যেমন,—

ও নৌকা, যাও হে ত্বরা করি নূতন কাণ্ডারী,
রঙ্গে ব্রজবধূর সঙ্গে ॥
আতর লাঘব হেতু তরুণী ভরা তরণী
চালন কর মনের রঙ্গে।
আপন করহে পণ চাওহে যৌবন-ধন
হাস ভাস প্রেম তরঙ্গে ॥

আদি কবি চণ্ডীদাস হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত কত কবিই যে কৃষ্ণলীলা কত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। রামপ্রসাদ-রচিত কৃষ্ণ বা রাধার সঙ্গীতে মন ক্রমশঃই উর্ধ্বস্তরে উঠিয়া যায়,—নৌকা বিলাসের গানে রাধার স্তব যেন মূর্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—

ওহে নূতন নেয়ে! ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে
দুকূল রইল দূর ঘন ঘন হানিছে চিকুর,
কেমন কেমন করয়ে দেয়া
মাঝ যমুনায় ভাসে খেয়া,
শুন ওহে গুণনিধি নট হ'ক ছানা দধি
কিন্তু মনে করি এই খেদ—
কাণ্ডারী যাহার হরি যদি ডুবে সেই তরী
মিছে তবে হইবে যে বেদ ॥

রাধার মনের আকুলতার সঙ্গে ভক্তিরসের অপূর্ব মিশ্রণ। আবার রাধার বর্ণনায়,—

প্রথম বয়স রাই রস রঙ্গিনী
ঝলমল অম্বুরুচি স্থির সৌদামিনী।
রাইবদন চেয়ে ললিতা বলে
রাই আমার মোহন মোহিনী॥
রাই যে পথে প্রয়াণ করে, মদন পলায় ডরে
কুটিল কটাক্ষ শরে জিনিল কুসুমশরে॥

এইরূপে অপূর্ব রচনা মনকে কোথায় টানিয়া লইয়া যায় তাহা শ্রোতা ও পাঠক মাত্রেই বলিতে পারেন। কামগন্ধ লেশহীন শুদ্ধ শান্ত পরিবেশে মন চলে নিত্য নূতন রস সন্ধানে। শিবসঙ্গীত রচনাতেও সমান দক্ষতার নিদর্শন রহিয়াছে—

বম্ বম্ বম্ ভোলা।
মাগী যেমন মিন্‌সে তেমন
তেমনি দুটি চেলা॥
আরোহণ বৃষোপরে শিঙ্গে ডম্বুর করে
মুখে বলে হরে হরে রুদ্রাক্ষমালা॥
জটাতে কুলু কুলু ধ্বনি বিরাজিতা সুরধনী
মস্তকেতে মণিফণী অর্ধচন্দ্রভালী।

দেবাদিদেবের অপূর্ব বর্ণনা। শিবভক্তদের জন্য এ গীত রচনার ভাষাও একেবারে ঘরোয়া আর তাই শ্রোতা মাত্রেরই অত্যন্ত আপনার বলিয়া মনে হইবে। ইহারও পরে আছে আগমনী সঙ্গীত।

গিরি! এবার আমার উমা এলে
আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না॥
যদি আসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া
জামাই বলে মানব না॥

কন্যার প্রতি স্নেহ ও ব্যাকুলতার রসে উদ্বেল। ভাষাও তেমনি সহজ, সরল, স্বচ্ছ। শ্রবণমাত্রে এই সঙ্গীত শ্রোতাদের নিজের মনের কথার প্রতিধ্বনি বলিয়া প্রতীত হইবেই। আগমনীর আরও গীত রচনায় মন আনন্দে ভরিয়া ওঠে।

আজ শুভ নিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী মা আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে
মুখশশী দেখ আসি দূরে যাবে দুঃখরাশি।
ও চাঁদমুখের হাসি সুধারাশি ক্ষরে॥

আরও আছে অত্যন্ত সুপরিচিত ও বাংলা দেশে সুপ্রচলিত কন্যা স্নেহের গীত—

গিরিবর! আর আমি পারিনে হে—
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান নাহি করে স্তন্যপান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥

এইসব রচনা আজ প্রাচীন বলিয়া গণ্য হইলেও প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। চিরদিন, চিরকালেই উহারা নূতনের আস্বাদ বিতরণ করিবে।

আবার দেখি তত্ত্ব সঙ্গীত রচনায় রামপ্রসাদের প্রতিভার বিশিষ্ট প্রকাশ। সহজ ভাষায় কত উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা রচিত হইতে পারে তাহার নজীর রামপ্রসাদের তত্ত্বসঙ্গীতে মিলে।

ওরে মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া
লাভে মূলে হারাইলি॥

এই ধরনের তত্ত্ব সঙ্গীতের মধ্যে মানুষের শিক্ষণীয় বস্তু প্রচুর রহিয়াছে। সেইসব গান শ্রবণ করিলে সত্য ও শুদ্ধতার প্রতি মানুষের মন সহজেই আকর্ষিত হয়। তাই বাংলা দেশ আজও রামপ্রসাদ বলিতে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ায়। বাংলার মানুষের অন্তরে রামপ্রসাদ চিরদিনের জন্য স্থায়ী ও কায়েম আসন করিয়া লইয়াছেন। বাংলা দেশ রামপ্রসাদকে কোনদিনই ভুলিবে না, ভুলিতে পারে না। তাঁহার সমসাময়িক আজু গোস্বামী তাঁহারই গানের পাল্টা ও ব্যঙ্গ রচনা করিয়া প্রচুর প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আজু গোস্বামী ব্যঙ্গপটু সুরসিক কবি ছিলেন কিন্তু তাঁহার গীত রচনার মধ্যে উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথাও প্রচুর থাকিত।

ইহার পর বাংলায় কবিগান রচয়িতাই বেশী দেখা দিলেন। আসিলেন রঘুনাথ দাস। তাঁহার রচনায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানই সমধিক পাওয়া যায়। সার্থক ও সিদ্ধ গীত রচনা তাঁহার শ্রোতা ও পাঠককে অন্য এক জগতে টানিয়া লইয়া যায়।

এক যায় আর আসে। বাংলার কাব্যকাননের শাখায় শাখায় চিরদিনই বহু প্রস্ফুটিত কুসুম ঝরিয়া পড়িয়াছে কিন্তু আবার অসংখ্য নূতন পুষ্পে নবপত্র

পল্লবে সে কানন ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। ক্রমে ক্রমে আসিলেন হরুঠাকুর। বাংলার কবিগান রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার রচিত বহুগান এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল। পাঠকেরা পাঠমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন বাঙ্গলা ভাষার সেগুলি অমূল্য সম্পদ, সঙ্গীতেও তাহা অতুলনীয়।

আসিলেন নিধুবাবু, টপ্পাগানের রাজা। বাংলার জনসাধারণ অনেকেই এখনও টপ্পা গীতরচনা মাত্রেই নিধুবাবুর রচনা বলিয়া জানে—রূপে রসে, রঙ্গে উচ্ছল।

নিধুবাবুর গীতরচনার বহুলাংশ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল। নিধুবাবু বাঙ্গলার গীতকাব্য জগতে অমর হইয়া চিরদিন বিরাজ করিবেন।

তাহার পর শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা দেওয়ান ব্রজকিশোর আসিলেন। আসিলেন দেওয়ান মহাশয়। সে আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ কালী বিষয়ক গীত রচয়িতা। তাঁহার ভ্রাতা দেওয়ান নন্দকুমারেরও অনেক সৃষ্টির দানে বাংলার গীত রচনার জগৎ সমৃদ্ধ। কবিগান রচয়িতা নিত্যানন্দ বৈরাগী আসিলেন। তাহার পর দেখি রাজা রামমোহনের মত প্রতিভাযুক্ত মানুষ এমনি করিয়া একটি দুইটি হইতে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য সার্থক ও সিদ্ধ কবি বাংলার সঙ্গীত জগতের আকাশে ফুটিয়া উঠিতে লাগিলেন। আসিলেন রাম ও নৃসিংহ। এই দুই ভ্রাতা মিলিয়া কৃষ্ণ প্রেমের বহু বিখ্যাত গীত সব রচনা করিয়া গিয়াছেন।

তাহার পর নিত্যানন্দ বৈরাগী, লালু-নন্দলাল, গোঁজলা গুঁই, কেষ্টা-মুচি, বিখ্যাত কবি-গায়ক ভোলা ময়রা, নীলুঠাকুর, যজ্ঞেশ্বরী, সাতুরায় বা সাতকড়ি রায়। ভোলা ময়রার বহু-বিখ্যাত গীত, সাতুরায়ের অপূর্ব রচনায় সমৃদ্ধ। আরও দেখি পর্তুগীজ আন্টুনী সাহেব। ভোলা ময়রার কবিগানের বিখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আন্টুনী সাহেব বিখ্যাত। তাহার পর নীলমণি পাটনী, গোরক্ষনাথ, গদাধর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, ভবানী বেনে প্রভৃতি বিখ্যাত সব কবিরা প্রত্যেকেই স্মরণীয় হিসাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা দেশ, বাংলার এই সব বিখ্যাত কবিদের কোনদিনই ভুলিবেন না, ভুলিতে পারে না। ইহার পর দেখি বৈরাগী কুলোদ্ভব কবি গোবিন্দ অধিকারী, মহাজন পদাবলী কণ্ঠস্থ করিয়া সুষ্ঠু ভাবে কীর্তন গান শিক্ষা করিয়া, পরে কৃষ্ণ প্রেমের বহু গীত রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

আসিলেন বাংলার বিখ্যাত পাঁচালী রচয়িতা কবি দাশু রায় বা দাশরথি রায়। কবির ধর্ম যথারীতি পালন করিয়া প্রায় শত বৎসর আগে তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আজিও বাংলা দেশ এই বিখ্যাত পাঁচালী রচয়িতার নামে শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করে। তাঁহার সময়ে তিনি বাংলা দেশের কাব্যগগনে দীপ্ত সূর্যের মত ভাস্বর

ছিলেন। তাহার পর দেখি ঠাকুর দাসদত্ত বিখ্যাত কবি। ইহার পর আসিলেন রামপ্রসাদের মত আর একজন সাধক কবি কমলাকান্ত। সাধনার অত্যুচ্চ শিখরে না উঠিলে কেহ অত সুন্দর ভাবযুক্ত শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিতে পারে না। মায়ের নাম গান গাহিতে কন্যা স্নেহের অপূর্ব রসধারায় তাঁহার রচনা সত্যই মর্মস্পর্শী —

এত চঞ্চল হইয়াছ তারা কি কারণে
বল মা।
... ...
ক্ষ্যাপা মেয়ে হৃদয় মন্দিরে বসি
খেল গো।
... ...
না বুঝি কারণ বাসনা সম্বর কেন
তোমারি তিলেক অবসর নাই মা
বাঁধিতে কুন্তল॥

অথবা শ্যামাসঙ্গীতে বেদবেদান্তের চরম ও পরম কথা শুনাইয়াছেন তিনি।

মা আমার কখনও শ্বেত কখনও পীত
কখনও নীল, লোহিত বেশ
মা আমার কখনও পুরুষ কখনও প্রকৃতি
কখনও শূন্য রূপারে॥

কমলাকান্তের রচনাগুলি বাংলা দেশ ও ভাষার অতুল সম্পত্তি। আসিলেন সাতুবাবু বা আশুতোষ দেব। তত্ত্বসঙ্গীত ও মাতৃসঙ্গীতে তিনিও যশস্বী হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী, বৃন্দাবনধামে শিক্ষা দীক্ষা তাঁহার, তাই কৃষ্ণ বিষয়ক কীর্তন গানের রচনায় বাংলাভাবা সমৃদ্ধশালী হইয়াছে।

বাংলার কাব্যকাননের বুলবুলদের কথা কত আর বলিব। এক এক করিয়া আসিয়াছেন, কাব্য ও সঙ্গীতের ধারায় বাংলা দেশে বন্যা বহাইয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের স্মৃতি বাংলা দেশে অক্ষয় ও অমর। ইহার পর কাশীপ্রসাদ ঘোষ, একজন উচ্চশিক্ষিত সার্থক কবি। ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত বাংলার একজন শক্তিশালী লেখক ও দক্ষ কবি গীতিকার। তাঁহার রচিত দেবসঙ্গীত ও কৃষ্ণ সঙ্গীত বাংলার সম্পত্তি। রূপচাঁদ পক্ষী, প্যারীচাঁদ মিত্র, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মধুকান, শ্রীধর কথক, রসিক-চন্দ্র রায় প্রভৃতি শক্তিশালী ও বাংলা ভাষার যুগ প্রবর্তক দিক্‌পাল কবিদের শক্তির পরিচয় পাইয়া বাংলা দেশ শ্রদ্ধায় তাঁহাদের নিকট মাথা নোয়াইয়াছে এবং তাহাদের সম্মান দেখাইয়া নিজে সম্মানিত হইয়াছে।

কালী মির্জা, রাধামোহন সেন, গোপাল উড়ে প্রভৃতি শক্তিশালী রচয়িতাদের রচনা পাঠ করিলে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় চিত্ত বিগলিত হয়। তাঁহাদের আসন সুদৃঢ়।

এইবার এই খণ্ডগ্রন্থের শেষ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলার তথা ভারতের এই বিশিষ্ট প্রতিভার জন্য বাংলাদেশ গর্বিত। মাইকেলের কাব্যরচনার সঙ্গে সকলেরই পরিচয় আছে। গীত রচনাতেও তিনি যে কত শক্তিশালী ছিলেন তাহার কিছু নজীর এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল। মাইকেল ছিলেন যুগস্রষ্টা, তাই তাঁহার কাব্য প্রতিভার পরিচয় বাংলা দেশ পাইয়াছে, স্বীকার করিয়াছে, এবং তাঁহার যথানির্দিষ্ট আসন স্থাপনা করিয়া ধন্য হইয়াছে।

এই গ্রন্থে গীত রচনার সঙ্গে যে সব রাগ রাগিণী ও তালের কথা লেখা আছে তাহা প্রাচীন সব গ্রন্থেই লিখিত ছিল। স্বরলিপির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না করিয়া এই ভাবে শুধু রাগ-রাগিণীর নাম দেওয়ায় গায়ক ও পরিবেশক শিল্পীদেরও কিছু সৃষ্টির অধিকার আছে। লিখিত রাগিণী অনুযায়ী গান গাহিতে পারিলেই ভাল। প্রত্যেক কবির স্বতন্ত্র ঢং বজায় রাখিতেই হইবে।

প্রাচীন গীতিকারদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক অথচ অসাধারণ শক্তিশালী কয়েকজনের পরিচয় ও তাঁহাদের রচনাই এই সংস্করণে নিবদ্ধ করিলাম। আশা রহিল ভবিষ্যতে দ্বিতীয় গ্রন্থে আরও বহু বিখ্যাত গীতিকারের রচনা সংযোজিত করিয়া এই গ্রন্থের মতই বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায় প্রকাশ করিব। ইতি—

বিনীত

শ্রীসুকৃতি সেন

ভারতচন্দ্র

(জন্ম—১১১৯ বাংলা সাল—মৃত্যু—১১৬৭ বাংলা সাল)

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, ১১১৯ সালে হুগলী জেলার আমতার কাছে পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ওই গ্রামেরই জমিদার রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চতুর্থ বা কনিষ্ঠ পুত্র, ভারতচন্দ্র। তাঁহারা রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ, আসল উপাধি মুখোপাধ্যায়।

বিশেষ কয়েকটি কারণে ভারতচন্দ্রের বাল্যকালে, তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে বর্ধমান-রাজের বিবাদ বাধিয়া ওঠে। তাঁহাদের পত্তনী জমিদারী বর্ধমান-রাজ্যসরকার হইতে খাস দখল করিয়া লওয়া হয়। ভীত উৎপীড়িত রাজা নরেন্দ্র-নারায়ণ সপরিবারে পলায়ন করিতে বাধ্য হন এবং ভারতচন্দ্রের মাতুলালয়, মণ্ডল-ঘাট পরগনার নওয়াপাড়ায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

বাল্যকালে মাতুলালয়ে ভারতচন্দ্রের শিক্ষা শুরু হয়। মাতুলালয়ের কাছেই তাজপুর গ্রামের টোলে তিনি ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে ওই পাঠদ্দশাতেই তাজপুরের নরোত্তম আচার্যের কন্যার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের বিবাহ হয়। অনেক চেষ্টা করিয়া রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ হৃত জমিদারী ফিরিয়া পাইলেন, কিন্তু ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ বশতঃ ভারতচন্দ্র অনেকদিন পর্যন্ত পিত্রালয়ে ফিরিয়া যান নাই। এই সময়ে তিনি দেবানন্দপুরে যান এবং সেখানে ফারসী ভাষার শিক্ষক মুন্সীদের বাড়ীতে একদিন সত্যনারায়ণের কথা পাঠ করিবার ভার ভারত-চন্দ্রের উপরে অর্পিত হয়। কিন্তু অসামান্য প্রতিভাদীপ্ত জন্ম কবি ভারতচন্দ্র প্রচলিত পুঁথি দেখিয়া সত্যনারায়ণ-কথা পাঠ না করিয়া, নিজেই এক সত্য-নারায়ণের কথা পদ্যে লিখিয়া পাঠ করেন। এই কবিতা শুনিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করেন। এই ব্রত-কথা রচনার তারিখ ১১৩৪ সাল।

১১৩৯ সালে ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুর হইতে পুনরায় পেঁড়ো বসন্তপুরে পিত্রালয়ে আগমন করেন। এই সময় কিছুদিনের খাজনা বাকী পড়ায় প্রতাপশালী বর্ধমান-রাজের কর্মচারীরা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের উপর খুবই অত্যাচার আরম্ভ করে। পিতার প্রতি অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বর্ধমান-রাজকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে, ভারতচন্দ্র বর্ধমানে আসেন। কিন্তু বর্ধমান-রাজ ভারতচন্দ্রের কোনো

কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাদের ইজারা লোপ করিয়া দেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করেন। কারাধ্যক্ষের কৃপায় তিনি মুক্তিলাভ করিয়া পুরুষোত্তমে পলায়ন করেন। সুরু হয় সন্ন্যাসীর জীবন। এইভাবে সন্ন্যাসীর বেশে দিন যাপন করিবার সময় ভারতচন্দ্রের ভায়রা অর্থাৎ শ্যালিকাপতি তাঁহার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ীতে লইয়া আসেন। সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর পরে স্ত্রীর সহিত ভারতচন্দ্রের পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তখন ফরাসডাঙ্গার দেওয়ান, ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। ভারতচন্দ্র চাকুরীর প্রার্থনায় তাঁহার নিকটে প্রায়শঃই যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে সহসা একদিন নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ফরাসডাঙ্গায় আসেন। সুযোগ বুঝিয়া ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় মহারাজের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের পরিচয় করাইয়া দেন। ভারতচন্দ্রের কবিত্ব প্রতিভায় মহারাজ মুগ্ধ ও সহানুভূতিশীল হন, এবং ৪০ টাকা বেতনে নিজের সভাসদপদে নিযুক্ত করেন। ভারতচন্দ্র মহারাজের সঙ্গে কৃষ্ণনগরে আসেন, পরমরসজ্ঞ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে এই সময় ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' রচিত হয়।

ভারতচন্দ্রের সাংসারিক অবস্থা জানিতে পারিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ২৪-পরগনার মূলাজোড় গ্রামখানি, বার্ষিক ছয়শত টাকায় তাঁহাকে ইজারা প্রদান করেন। এবং ওই গ্রামেই গঙ্গাতীরে তাঁহার বসত-বাটী তৈয়ার করার জন্য তাঁহাকে একশত টাকা সাহায্যদান করেন। মূলাজোড়ে বাড়ী তৈয়ারী করিয়া ভারতচন্দ্র সস্ত্রীক বসবাস করিতে শুরু করিলেন। এই সময় ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থ রচিত হয়। ভারতচন্দ্রের পিতা বৃদ্ধ নরেন্দ্রনারায়ণ, শেষ জীবনের দিনগুলি এই মূলাজোড়ে পুত্রের গৃহে আসিয়াই কাটান। সেখানেই গঙ্গাতীরে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে। পিতার পরলোকগমনের কিছুকাল পরে ভারতচন্দ্র আর একবার কৃষ্ণনগর যান, 'পাদ-পুরাণ' এবং সমসাময়িক বহু রচনা এই সময়ে কৃষ্ণনগরেই রচিত হয়।

কিন্তু বর্ধমান রাজসরকারের শত্রুতার যেন শেষ নাই। বর্ধমানের মহারাজা তিলকচন্দ্রের জননীর সময় বর্ধমান রাজসরকার কর্তৃক কৌশলক্রমে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে বামদেব নাগের নামে মূলাজোড়ের পত্তনি লওয়া হয়। বামদেব নাগ যখন ভারতচন্দ্রের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার শুরু করে তখন সেই অত্যাচারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ভারতচন্দ্র 'নাগাষ্টক' কবিতা গ্রন্থ রচনা করেন। সেই মর্মস্পর্শী কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়া ব্যথিত অন্তঃকরণে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সেই কাব্যগ্রন্থ বর্ধমানের মহারাণীর কাছে পাঠাইয়া দেন। ফলে, ভারতচন্দ্রের প্রতি অত্যাচার বন্ধ হয়। তৎপর ১১৬৭ সালে ৪৮ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে রায়

গুণাকর ভারতচন্দ্র পরলোকগমন করেন। তাঁহার তিনপুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠের বংশধরগণ মূলাজোড়েই বাস করিতেন।

'অন্নদামঙ্গল' 'বিদ্যাসুন্দর' 'মানসিংহ', প্রভৃতি ভারতচন্দ্রের অপূর্বগ্রন্থ,—বঙ্গ সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ। তাঁহার কাব্য, তাঁহার কবিতা অবিনশ্বর, এবং অক্ষয় অমর হইয়া চিরদিনই বঙ্গভাষা মধুলোভীদের চিত্তবিমোহন করিবে, ইহা নিশ্চিত।

শিব সঙ্গীত হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন ধরনের বহু গীত রচনা এই সঙ্গে সাধ্য মত দেওয়া হইল।

অন্নদামঙ্গল

মিশ্ররামকেলী—ত্রিতাল (দ্রুত)

শিব নাম বলরে জীব বদনে।
যদি আনন্দে যাবে শিব সদনে॥
শিবনাম ল'য়ে মুখে, তরিব সকল দুখে,
দমন করিব সুখে শমনে।
শিব গুণ কি কহিব, কোথায় তুলনা দিব,
জীব শিব হয় শিব সেবনে॥
শিব শিব বলে যেই, এই দেহে শিব সেই,
শিব নিজ পদ দেই সেজনে।
কাতরে করুণা কর, পাপ তাপ সব হর,
ভারতে রাখহ হর-ভজনে॥

শ্রীরাগ—এক তালা

ভব সংসার ভিতরে ভব ভবানী বিহরে।
ভূতময় দেহ নবদ্বার গেহ,
নরনারী কলেবরে।
গুণাতীত হ'য়ে নানাগুণ ল'য়ে
দোহে নানা খেলা করে॥
উত্তম অধম স্থাবর জঙ্গম
সব জীবের অন্তরে।

চেতনা চেতনে মিলি দুই জনে,
দেহি-দেহরূপে চরে ॥
অভেদ হইয়া ভেদ প্রকাশিয়া,
একি করে চরাচরে ।
পাইয়াছে টের কি করে এ ফের,
কবি রায় গুণাকরে ॥

টোরী—আড়াঠেকা

উমা দয়া করগো ।
বিষম শমন ভয় হর গো ॥
পাপেতে জড়িত মতি, কাতর হয়েছি অতি,
পতিত পাবন নাম ধর গো ॥
মা বলিয়া ডাকি ঘন, শুনিয়া দেহ গো মন,
গুহ গজাননে বুঝি ডর গো ॥
তুমি গো তারিণী তারা, অসার সংসার সারা
নানারূপে চরাচরে চর গো
গুণাকর তব দাস, পুরাও তাহার আশ
তবে ঋণী চক্র-ঋণে তর গো ॥

মুলতান—ঠুংরী

আমার শঙ্কর করুণা কর গো ।
নিন্দা কর না ত্রিভুবনে মহেশ্বর ॥
কালকূট পিয়া বিশ্ব বাঁচাইয়া,
মৃত্যুঞ্জয় হইলা হর ।
কপালে অনল শিরে গঙ্গাজল,
অনলে জলে দোঁসর ॥
ভালে সুধাকর গলে বিষ-ভর,
সুধা বিষে বরাবর,
ভারত কহিছে মোরে না সহিছে
এ শিবে নিন্দে পামর ॥

পরজ—পোস্তা

বড় আনন্দ উদয় ।
বহুদিনে ভগবতী আইল আলয় ॥
শঙ্খঘণ্টারব মহামহোৎসব,
ত্রিভুবনে জয় জয় ।
নাচিছে নাটক গাহিছে গায়ক
রাগ তাল মান লয় ॥
যত চরাচর হরিষ অন্তর
পরম আনন্দময় ।
রায় গুণাকর কহে পুট কর,
মোরে যেন দয়া হয় ॥

খট—ত্রিতাল (দ্রুত)

মহাদেব আঁখি ঢুলু ঢুলু ।
সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধি শুদ্ধি হইল ভুল ॥
নয়নে ধরিল রঙ্গ অলসে অবশ অঙ্গ,
লট পট জটাজুট গঙ্গা স্থল থুল ॥
খসিল বাঘের ছাল, আলু থালু হাড় মাল,
ভুলিল ডমরু শিঙ্গা পিনাক ত্রিশূল ॥
হাসি হাসি উতরোল আধ আধ আধবোল
ন ম্ন নন্দি আ আ আ ন ম্ন নকুল ॥
ভারতের অনুভবে, ভাঙে কি ভুলাবে ভবে,
ভবানী ভাবেন ভব ভাবভরা কুল ॥

মালকোষ—ঝাঁপতাল

জয় দেবি জগন্ময়ি, দীন দয়াময়ি,
শৈলসুতে করুণা নিকরে ।
জয় চণ্ড-বিনাশিনি, মুণ্ড-নিপাতিনি,
দুর্গবিঘাতিনি মুখ্যতরে ॥

জয় কালি কপালিনি মস্তকমালিনি,
খর্পরধারিণি শূলধরে ॥
জয় চণ্ডি দিগম্বরি, ঈশ্বরি শঙ্করি,
কৌষিকি ভারত ভীতি হরে

জয় জয় হর রঙ্গিয়া।

কর বিলসিত নিশিত পরশু, অভয় বর কুরঙ্গিয়া ॥
লক্ লক্ ফণি জটা বিরাজ,
তক্ তক্ তক্ রজনী বাজ,
ধক্ ধক্ ধক্ দহন সাজ, বিমল চপল গঙ্গিয়া।
ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল,
হুলু হুলু হুলু যোগিনী-বোল,
কুলু কুলু কুলু ডাকিনী রোল, প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া।
ভভম্ ভবম্ ববভ্ ভাল,
ঘন বাজে শিঙ্গা ডমরু গাল,
রুদ্রতাসে তাল দেয় বেতাল,
ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গ ভাঙ্গিয়া।
সুরগণ কহে জয় মহেশ,
পুলকে পূরিল সকল দেশ,
ভারত যাচত ভকতিলেশ, সরস অবশ অঙ্গিয়া।

বেহাগ—একতালা

অন্নপূর্ণা জয় জয়, দূর কর ভব ভয়।
তুমি সর্ব্বময় তোমা হইতে হয়,
সৃজন পালন লয়।
কত মায়া কর কত কায়া ধর।
বেদের গোচর নয় ॥
বিধি হরি হর আদি চরাচর
কটাক্ষেতে কত হয়।

ছাড় ছায়া মায়া দেহ পদ ছায়া
ভারত বিনয়ে কয় ॥

কি এ নিরুপম শোভা মনোরম
হর গৌরী এক শরীরে।
শ্বেত পীতকায়, রাঙ্গা দুটী পায়,
নিছনি লইয়া মরিরে ॥
আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে,
আধ পট্টাম্বর সুন্দর সাজে
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে
আধ ফণিফণা ধরিরে ॥
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা,
আধ মণিময় হার উজালা,
আধ গলে শোভে গরল কালা
আধই সুধা মাধুরীরে ॥
এক হাতে শোভে ফণিভূষণ,
এক হাতে শোভে মণিকাঙ্কন,
আধমুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ
আধই তাম্বুল পূরিরে ॥
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু একলোচন
কাজলে উজল এক নয়ন,
আধভালে হরিতাল সুশোভন
আধই সিন্দূর পূরিরে ॥
কপাল লোচন আধই আধে
মিলন হইল বড়ই সাধে
দুই ভাগ অগ্নি এক অবাধে,
হইল প্রণয় করিরে ॥
দোঁহার আধ আধ আধশশী
শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি',
আধ জটাজুট গঙ্গা সরসী
আধই চারু কবরীরে ॥

এক কানে শোভে মণিকুণ্ডল,
এক কানে শোভে ফণিমণ্ডল,
আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল,
আধই গন্ধ কস্তুরীরে ।।
ভারত কবি গুণাকর রায়
কৃষ্ণচন্দ্র-প্রেম ভকতি চায়
হরগৌরী বিয়া হইল সায়
সবে বল হরি হরিরে ।।

গৌড়সারঙ্গ---ত্রিতাল (দ্রুত)

বিধি মোরে লাগিল কে বাদে ।
বিধি যার বিবাদী, কি সাধ তার সাধে ।।
এ বড় বিষম ধন্দ যত করি ছন্দ বন্ধ
ভাল ভাবি হয় মন্দ, পড়িনু প্রমাদে ।
ধর্ম্মে জানি সুখ হয় তবু মন নাহি লয়
অধর্ম্মে বিবিধ ভয়, তবু তাই স্বাদে
মিছা দারাসুত লয়ে, মিছা সুখে সুখী হ'য়ে,
যে রহে আপনা ক'য়ে, সে মজে বিষাদে,
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের, আর সব মিছা ফের
ভারত পেয়েছে টের, গুরুর প্রসাদে ।।

লুম ঝিঁঝিট—একতালা

কেবা এমন ঘরে থাকিবে (জয়া)
এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে ।।
আপনি মাখেন ছাই, আমারে কহেন তাই,
কেবা বালাই ছাই মাখিবে ।
দামাল ছাওয়াল দুটী, অন্ন চাহে ভূমে লুটি,
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে ।।
বিষপানে নাহি ভয়, কথা কইতে ভয় হয়,
উচিত কহিলে দ্বন্দ্ব বাড়িবে ।
মা বাপ পাষাণ হিয়া হেন ঘরে দিল বিয়া,
ভারত এ দুখে ঘর ছাড়িবে ।।

বিভাস—ত্রিতাল (দ্রুত)

কি কর, নরহরি ভজরে ।
ছাড়িয়া হরিনাম কেন মজরে ॥
তরিবারে পরিণাম হর জপে হরিনাম,
হরি ভজি পূর্ণকাম, কমলজরে ।
ভব ঘোর, পারাবার, হরিনাম তরী তা'র,
হরিনাম ল'য়ে পার হইল গজরে ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম, এ চারি বর্গের ধাম,
বেদে বলে হরিনাম সুখে মজরে ।
গুরুবাক্য শিরে ধরি, রহিয়াছি সার করি,
ভারতের ভূষা হরি-পদরজরে ॥

রামপ্রসাদ

(জন্ম বাংলা ১১২৫/৩০ সালের মধ্যে, জীবিতকাল ৫৪ বৎসর)

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন (বাংলা ১১২৫ হইতে ৩০ সালের, মধ্যে) ২৪ পরগনার হালিসহরের অন্তর্গত কুমারহট্টরা কুমারহাটা গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাম রাম সেনের চতুর্থ সন্তান রামপ্রসাদ, বয়স যখন খুবই অল্প, তখন হইতেই রামপ্রসাদ, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী ও পারসী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি কৌলিক চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই, তাই চিকিৎসা-ব্যবসাও করেন নাই। সুতরাং পিতৃ-বিয়োগের পর অনুমান ১৭।১৮ বৎসর বয়সের সময় তিনি কলিকাতার এক ধনী ভদ্রলোকের গৃহে মুহুরীর চাকুরী গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই কবিতা ও গীত রচনায় তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। মুহুরীগিরির চাকুরী করিতেছেন, প্রচুর লেখার কাজ হিসাবের কাজ, ইহারই মধ্যে প্রায়শঃই তিনি গীত রচনায় বিভোর হইয়া বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইতেন। তাঁহার উর্ধ্বতন এক কর্মচারী একদিন জমাখরচের খাতা তদারক করিতে গিয়া দেখিতে পান যে রামপ্রসাদ সেই হিসাবের খাতার মধ্যে গান লিখিয়া রাখিয়াছেন। খাতার প্রথমেই গীতের রচনাটি লেখা ছিল। কর্মচারীটি জমাখরচের খাতায় রামপ্রসাদের গীত রচনার কথা প্রভুর নিকট নিবেদন করিয়া তাঁহার গোচরে আনেন।

"আমায় দে মা তবিলদারী" গানটি জমাখরচের গোড়াতেই লেখা। প্রভু নিবিষ্ট মনে গানটি পাঠ করিয়া এতই মুগ্ধ হইলেন যে তৎক্ষণাৎ রামপ্রসাদকে ডাকিয়া উচ্চ প্রশংসার সঙ্গে উৎসাহ দিয়া তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই ঘটনা হইতেই রামপ্রসাদের অন্তরে ভাব সমুদ্র উথলিয়া ওঠে। এমনি ছোট-খাট বহু ঘটনা পৃথিবীতে বহু মনীষীর জীবনেই ঘটিয়াছে যাহার ফলে বহু দীপ্ত সূর্যের দর্শন আমরা পাইয়াছি আর তাই ওই ঘটনাগুলিকে শুভ প্রভাতের সূচনা বলিয়া চিরদিনই পৃথিবীর মানুষ প্রণাম জানাইবে। গীত রচনার সঙ্গে সঙ্গেই ইষ্ট দেবীর সাধনায় তাঁহার মন আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট হইতে থাকে। ইহার কিছুদিন পর রামপ্রসাদ চাকুরী পরিত্যাগ করিলেন, এবং পরিপূর্ণভাবে তান্ত্রিকমতে মা

কালীর সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। রামপ্রসাদ সাধনার সময় "কালী, কালী" বলিয়া তন্ময় হইয়া মাকে আহ্বান করিতেন। তাঁহার সেই প্রাণস্পর্শী আহ্বান আজিও জগতে মর্মস্পর্শী সঙ্গীতরূপে বিরাজ করিতেছে এবং সাধারণ মানুষকে ভক্তিভাবের সাধনায় নিযুক্ত হইতে উদ্বুদ্ধ করিতেছে।

যে সময় রামপ্রসাদ আসিয়া কুমারহট্টে বসবাস করিতেছেন ঠিক তখন বাংলার অদ্বিতীয় রসজ্ঞ বিদ্যোৎসাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপের রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করিয়া আছেন। মহাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তখন মহারাজের সভাসদরূপে বিরাজমান। রামপ্রসাদের কাব্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মহারাজ তাঁহাকেও আপন সভাসদ মধ্যে পাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু রামপ্রসাদ তখন সাধনার উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত। পার্থিব বিষয় সম্পত্তি ধন-দৌলতের প্রতি তাঁহার সমস্ত আসক্তি বিলীন হইয়া গিয়াছে সুতরাং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্তাব তিনি বিনয়সহকারে প্রত্যাখান করিলেন। তথাপি মহারাজ কাব্যপ্রতিভার সম্মান প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হইলেন না। সাধক রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি আর একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিলেন। এই সময়েই কবি রামপ্রসাদের "বিদ্যাসুন্দর" রচিত হয়।

রামপ্রসাদ রচিত কবিতা ও গীত প্রভৃতি কতকাংশে এখন দুষ্প্রাপ্য। কতকগুলি গীত আর "বিদ্যাসুন্দর" কাব্যগ্রন্থ ব্যতীত তাঁহার আর কোন গ্রন্থই এখন সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। অথচ তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের 'অষ্টমঙ্গলা' প্রভৃতি পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তিনি অন্যান্য বহু কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। গীত রচনা সম্বন্ধে রামপ্রসাদের একনিষ্ঠতার এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, তিনি প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে পাঁচটি গীত রচনা করিতেনই। অনেকেই অনুমান করেন যে, রামপ্রসাদ ৫৪ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। যদি এই কিংবদন্তী ও অনুমানের কিয়দংশও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় তবে রামপ্রসাদের কত অমূল্য রচনা ও গীতরত্ন যে কালের কবলে হারাইয়া গিয়াছে এবং বিনষ্ট হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার একটি বিশেষ গানের ভণিতা দেখিয়া অনেকেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, রামপ্রসাদ লক্ষ গীত রচনা করিয়াছিলেন। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই মহামূল্যবান রচনার অধিকাংশেরই এখন আর সন্ধান পাওয়া যায় না। অধিকন্তু অন্যান্য বহু রচয়িতার গান রামপ্রসাদের সুনামের ভারে দিব্যি কাটিয়া যাইতেছে। ইহা ছাড়াও আর একটি মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটিতেছে যাহাতে রামপ্রসাদের অনেক গানের কলি, নানান লোকের নানান ধরনে গাহিবার ফলে বদলাইয়া যাইতেছে। এই সঙ্গে রামপ্রসাদের কয়েকটি গানের

যে পাঠান্তর সন্নিবেশ করা হইল তাহা হইতেই এই সিদ্ধান্তের সার্থকতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে।

মা কালীর সাধনাতে রামপ্রসাদ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাই কালীকীর্তনই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ইহা ছাড়া কৃষ্ণকীর্তন, শিবসঙ্গীত প্রভৃতি তাঁহার কয়েকখানি কাব্যের কয়েকটি মাত্র পদাবলীর এক্ষণে সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলির পূর্ণ রচনা এক্ষণে খুঁজিয়া পাওয়ার আশা প্রায় সুদূর-পরাহত। কোথাও কোন উপলক্ষ বিশেষে গিয়া, তাঁহার গীতরচনার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতার মহারাজ নবকৃষ্ণের রাজপ্রাসাদে গিয়া দোল এবং যাত্রা সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিয়া সকলের প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিলেন। ৺কাশীধামে গিয়া দেবী অন্নপূর্ণার মন্দিরে প্রাণমন ঢালিয়া দেবী অন্নপূর্ণার উদ্দেশে গান গাহিয়াছিলেন। একবার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ যাইবার পথে গঙ্গাবক্ষে নৌকার উপরে বসিয়া মহারাজের অনুরোধে রামপ্রসাদ গান গাহিয়া মহারাজকে শুনাইতেছিলেন, তখন দূর হইতে সেই গান শুনিয়া নবাব সিরাজদৌল্লা গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। পরে সেই উপলক্ষে রামপ্রসাদ নবাবের আমন্ত্রণে গিয়া কয়েকখানি নূতন রচিত সঙ্গীত নবাবকে শুনাইয়াছিলেন।

আজু গোঁসাই (অযোধ্যানাথ, ভিন্নমতে অচ্যুতাচারণ) এবং রামপ্রসাদ দুই-জনেই সমসাময়িক; দুইজনেরই নিবাস একই গ্রামে, এবং সর্বোপরি দুইজনেই ভাবুক এবং কবি। রামপ্রসাদ শক্তি-উপাসক, আজু গোঁসাই বৈষ্ণব। পরমরসজ্ঞ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই দুইজন কবির মধ্যে সঙ্গীত রচনায় দ্বন্দ্ব বাধাইয়া দিয়া রস উপলব্ধি করিতেন, এ কারণেও রামপ্রসাদের বহু রচনার জন্ম হইয়াছিল।

রামপ্রসাদের সাধনা সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত। সত্যাসত্যের বিচার বড় কথা নয়, সাধকের জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটিতে পারে, ঘটা সম্ভব। কথা হইতেছে যে যাঁহার সম্বন্ধে লোকে এই ধরনের কিংবদন্তী রচনা করে তাঁহার আসন সে যুগের মানুষের অন্তরের কত গভীরে কত শ্রদ্ধাসনে ছিল তাহাই ভাবিবার কথা। কাশীধামে মা অন্নপূর্ণা স্বপ্নে দেখা দিয়া রামপ্রসাদকে গীত রচনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, এবং সেই আদেশবশতঃই রামপ্রসাদ অন্নপূর্ণার মন্দিরে দেবীকে গান শুনাইয়াছিলেন। বহু ইতিবৃত্তের মধ্যে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া বিবরণ শেষ করিব।

নিজ বাড়ীতে বেড়া বাঁধিবার প্রয়োজন হওয়ায় একদা রামপ্রসাদ নিজেই বেড়া বাঁধিতে বসিলেন। নিজে একপাশে কিন্তু ওপাশ হইতে বাঁধন ফিরাইয়া দিবার

কেহ নাই। গুনগুন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধিতেছেন। কিন্তু কোনো অসুবিধাই তাঁহার হইতেছে না, কারণ কে একজন যেন ওপাশ হইতে বাঁধন ফিরাইয়া দিতেছে। পাশ হইতে কে দড়ি যোগাইতেছে এই কথা খেয়াল হওয়ায় সহসা রামপ্রসাদ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পান যে কন্যারূপে স্বয়ং দেবী আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন। সাধক রামপ্রসাদ মৃত্যুর পূর্বরাত্রে কালীপূজা করিয়া আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবকে আপন মৃত্যুর সংবাদ কহিয়াছিলেন। মৃত্যুর দিনে এই সদানন্দময় মহাপুরুষ গান গাহিতে গাহিতেই প্রাণত্যাগ করেন। দুই পুত্র এবং দুই কন্যা রাখিয়া পুণ্যময় সাধকশ্রেষ্ঠ দেহরক্ষা করেন।

রামপ্রসাদের গীত ও রচনা ইত্যাদিতে তাঁহার কাব্যরসজ্ঞান, ভাবুকতা এবং তত্ত্বজ্ঞানের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা নিতান্ত সত্য যে রামপ্রসাদ বাংলা সঙ্গীত-সৌধের ভিত্তিরূপে চিরকালের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত। যতদিন বাংলা ভাষা থাকিবে, বাঙ্গালীর অস্তিত্ব থাকিবে, এই ভাবুক সাধক ভক্ত কবির স্মৃতি প্রতিটি হৃদয়ে জাজ্জ্বল্যমান রহিবে।

রামপ্রসাদী সঙ্গীত

(১)

শ্রীগুরু বন্দনা।

সুরট খয়ারা-কাওয়ালী

বন্দে শ্রীগুরুদেবা'ক চরণং।
অন্ধ পট খোলে ধন্ধ সবহরণং
জ্ঞানাঞ্জন দোই অন্ধকি নবনং।
বল্লভ নাথ গুনারত করণং॥
কেবল করুণাময় গুরু ভবসিন্ধুতারণং।
তপন-তনয়-ভয়-বারণ কারণং।
খচারু চরণদ্বয় হৃদে করি ধারণং।
প্রসাদ কহিছে হয় মরণের মরণং॥

(২)

কালীকীর্তন

রামপ্রসাদী সুর একতালা

আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নিমক হারাম নই শঙ্করী॥
পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে,
ইহা আমি সইতে নারি?
ভাঁড়ার জিম্মা যা'র কাছে মা,
সে যে ভোলা ত্রিপুরারি॥
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা,
তবু জিম্মা রাখ তা'রি
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির
তবু শিবের মাইনে ভারি॥
আমি বিনা মাইনের চাকর
কেবল চরণ ধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর,
তবে বটে আমি হারি॥
যদি আমার বাপের ধারা ধর
তবে তোমা পেতে পারি।
প্রসাদ বলে এমন পদের
বালাই লয়ে আমি ম'রি।
ও পদের মত পদ পাই তো।
সে পদ লয়ে বিপদ তরি॥

(৩)

ডুব দে মন কালী ব'লে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন
দু'চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামলে এক ডুবে খাও।
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে॥
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝারে মন।
শক্তি রূপ মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে।
শিব যুক্তি মতন চাইলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে।
আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলদী গায়ে মেখে যাও
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।।
রতন মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই
জলে।
রামপ্রসাদ বলে, ঝম্প দিলে,
মিলবে রতন ফলে ফলে॥

মা আমায় ঘুরাবি কত ?
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত ॥
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা,
পাক দিতেছ অবিরত,
তুমি কি দোষে করিলে আমায়
ছটা কলুর অনুগত ॥
একবার খুলে দেখা চোখের ঠুলি।
দেখি শ্রীপদ মনের মতো ॥

পাঠান্তর :

মা আমায় ঘুরাবি কত।
যেন নাক ফোঁড়া বলদের মত ॥
আশি লক্ষ যোনি ভ্রমি. পশুপক্ষী আদি
যত।
তবু গর্ভ ধারণ নয় নিবারণ,
যাতনাতে হলেম হত ॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা কখন নয়।
রামপ্রসাদ কুপুত্র তোমার তাড়ায়ে দাও
জনমের মতো।

পাঠান্তরের :

দেখি দুটী অভয় পদ।"
কুপুত্র অনেক হয় মা,
কুমাতা নয় কখনতো।
রামপ্রসাদের এই আশা অন্তে থাকি
পদানত ॥

ঝংলা—একতালা

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে প'ড়ে আছে
গয়া গঙ্গা বারাণসী ॥
হৃৎকমলে ধ্যানকালে আনন্দ
সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ কোকনদ,
তীর্থ রাশিরাশি ॥
ওরে অনলে দাহন যথা, হয়রে
তুলা রাশি রাশি ॥
গয়ায় ক'রে পিণ্ডদান, বলে
পিতৃঋণে পাব ত্রাণ
ওরে যে করে কালীর ধ্যান,
তার গলা শুনে হাসি।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়
চিনি খেতে ভালবাসি ॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির
বলে।'
ওরে চতুর্বর্গ করতলে, ভাবিলে
রে এলোকেশী।

(৬)

মনরে কৃষি কাজ জান না
এমন মানব-জমি রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা ॥
কালী নামে দাও রে বেড়া,
ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর (মনরে আমার)
শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁষে না ॥
অদ্য অব্দ-শতান্তে বাজাপ্ত হবে জান
না।
আছে একারে মন এই বেলা তুই
চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা ॥
গুরু রোপণ করেছেন বীজ
ভক্তিবারি তার সেঁচনা
ওরে একা যদি না পারিস মন (মনরে
আমার)
রামপ্রসাদকে ডেকে নেনা ॥

(৭)

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা ॥
মার সোহাগে রূপের আদর
এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে
এমন বাপের ভরসা কোথা
কাশীতে গেলেই মুক্তি,
এ বটে শিবের উক্তি।
ওরে সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার
দাসী ॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল,
জলেতে মিশায়ে জল।
যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে
দূরে যাবে মনের ব্যথা।
প্রসাদ বলে এই কথা বেদাগমে
আছে গাঁথা
ওমা যে জন তোমার নাম করে
তার হাড়মালা আর ঝুলি কাঁথা ॥

পাঠান্তর :

"বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
তুমি না করিলে কৃপা
যাব কি বিমাতা যথা ?
ভোলানাথের ভুল ধরেছি
বলব এবার যারে তা'রে,
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ,
হৃদে ধরে কোন বিচারে ?
পিতা পুত্র এক ক্ষেত্রে
দেখা মাত্র বলব তারে।
ভোলা, মায়ের চরণ ক'রে হরণ
মিছে মরণ দেখায় কা'রে ॥
মায়ের ধন সন্তানে পায়।
সে ধন নিলে কোন বিচারে ?
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে
চরণ ছেড়ে দিক আমারে ॥
শিবের দোষ বলি যদি,
বাজে আপন গার উপরে।
রামপ্রসাদ বলে ভয় করিনে,
মার অভয় চরণের জোরে।

(৮)

ললিত বিভাস—একতালা

কেবল আমার আশা, ভবে আসা
আসা মাত্র হলো—

যেমন চিত্রের পদ্মেতে প'ড়ে ভ্রমর
ভুলে র'লো ॥
মা নিম খাওয়ালে চিনি ব'লে
কথায় করে ছলো।
ওমা মিঠার লোভে
তিত মুখে সারা দিনটা গেলো ॥
মা খেলাবি বলে ফাঁকি দিয়ে
নাবালে ভূতলো।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো।
আশা না পুরিলো ॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়,
যা হবার তাই হ'লো
এখন সন্ধ্যা বেলায় কোলের ছেলে
ঘরে নিয়ে চলো ॥

(৯)

ভাবনা কালী, ভাবনা কিবা।
ওরে মোহময়ী রাত্রি গতা।
সম্প্রতি প্রকাশে দিবা।
অরুণ উদয় কালে ঘুচিল তিমির জাল।
ওরে কমল ভাল প্রকাশ করিছে শিবা ॥
বেদে দিলে চক্ষে ধূলা
ষড়্ দর্শনের সেই অন্ধগুলা,
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠা মূলা
খেলা ধূলাকে ভাঙ্গিবা ॥
সেখানে আনন্দ হাট
গুরু শিষ্য নাস্তি পাঠ,
ওরে যার নেটো তার নাট্য
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা ॥
নমস্তৎকর্ম্মভ্যো ব'লে চলে যাব
যথা তথা।
আমি সাধুসঙ্গে নানা রঙ্গে
দূর করিব মনের ব্যথা ॥
তুমি গো পাষাণের সুতা,
আমার যেমন পিতা তেমনি মাতা
রামপ্রসাদ বলে, হৃদিস্থলে গুরুতত্ত্ব রাখ
গাঁথা।"

(১০)

ললিতবিভাস—একতালা।
গেল দিন মিছে রঙ্গে-রসে।
আমি কাজ হারালেম কালের বশে ।।
যখন ধন উপার্জ্জন, করেছিলাম দেশ-বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত,
সবাই ছিল আমার বশে ।।
এখন ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত,
নির্ধন বলে সবাই রোষে ॥
যমদূত আসি শিয়রেতে বসি,
ধরবে যখন অগ্রকেশে।

তখন সাজায়ে মাচা, কলসী কাচা,
বিদায় দিবে দণ্ডি বেশে ॥
হরি হরি বলি, শ্মশানে ফেলি,
যে যায় যাবে আপন বাসে,
রামপ্রসাদ মলো, কান্না গেল,
অন্ন খাবে অনায়াসে ॥

(১১)

বেহাগ—আড়খেমটা ।

আমার কপাল গো তারা
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা,
ভাল নয় মা কোন কালে ॥
শিশুকালে পিতা মলো, মাগো রাজ্য নিল পরে।
আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সায়রের জলে ।।
স্রোতের শেওলার মত মাগো ফিরিতেছি ভেসে
সবে বল ধর ধর, কেউ নাবে না অগাধ জলে
বনের পুষ্প বেলের পাতা,
মাগো আর দিব আমার মাথা,
রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণতলে ।।
শ্রীরামপ্রসাদের বাণী, শোন গো মা নারায়ণী
তনু অন্তকালে আমায় টেনে ফেল গঙ্গাজলে ।।

(১২)

সোহিনী-বাহার—আড়খেমটা

ওমা ! হরগো তারা, মনের দুঃখ ।
আর তো দুঃখ সহে না ।।
যে দুঃখ গর্ভযাতনে, মাগো,
জন্মিলে থাকে না মনে ।
মায়া মোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে 'ওনা ওনা' ।।
জন্ম-মৃত্যু যে যন্ত্রণা, মা-গো,
যে জন্মে নাই সে জানে না ।

তুই কি জানিবি সে যন্ত্রণা,
জন্মিলে না – মরিলে না,
রামপ্রসাদে এই ভণে দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে
তবু রব মার চরণে, আর ত ভবে জন্মিব না ॥

(১৩)

অভয় পদ সব লুটালে,
কিছু রাখলি না মা তনয় বলে।
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা,
শিখেছিলে মায়ের স্থলে

পাঠান্তরে—"শিখেছিলে মা, বাপের কুলে।"
তোমার পিতা মাতা যেম্নি দাতা,
তেম্নি দাতা আমার হলে ॥
ভাঁড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা,
সে জন তোমার পদতলে।
ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত

পাঠান্তরে—"সদা ভাং খেয়ে সে মত্ত ভোলা।"
কেবল তুষ্ট বিল্বদলে ॥
জন্ম জন্মান্তরেতে মা,

পাঠান্তরে—"যা হয় মা জন্মে জন্মে।"
কত দুঃখ আমায় দিলে
প্রসাদ বলে এবার মোলে,
ডাকব সর্ব্বনাশী বলে ॥

(১৪)

মোহিনী বাহার—আড়খেম্টা।
মন কেন মার চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি পাবে মুক্তি
বাঁধ দিয়া ভক্তি-দড়া ॥
থাকতে নয়ন, দেখলে না মন

কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে তনয় রূপেতে,
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া ॥
মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু-শেষে।
মোলে দণ্ড দু'চার কান্নাকাটি,
শেষে দিবে গোবর-ছড়া ॥
ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া,
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী।
কড়ি দিবে অষ্ট কড়া ॥
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ,
দোসর বস্ত্র গায় দিবে
চার-কোনা মাঝখানে ফাড়া ॥
যেই ধ্যানে একমনে, সেই পাবে কালিকাতারা
বের হয়ে দেখ কন্যারূপে,
রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া ॥

(১৫)

এবার কালী তোমায় খা'ব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার ॥
গণ্ডযোগে জন্ম হ'লে
সে হয় যে মা খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দু'টার একটা করে যা'ব ॥
ডাকিনী যোগিনী দুটা তরকারী বানায়ে খা'ব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে,
অম্বলে সম্ভার চড়াব।
হাতে কালী মুখে কালী, সর্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে সমন বাঁধবে ক'সে,
সেই কালী তার মুখে দেব ॥
খাব খা'ব বলি মাগো উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে মনমানসে পূজিব ॥

যদি বলি কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যা'ব।
(আমার) ভয় কি তা'তে কালী ব'লে
কালেরে কলা দেখাব।
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ,
ভালমতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন,
যা' হবার তাই ঘটাইব ।।

(১৬)

আমি এত দোষী কিসে।
ঐ যে প্রতিদিন হয়, দিন যাওয়া ভার,
সারা দন মা কাঁদি বসে ।।
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকব না আর এমন দেশে।।
তাই কুলালচক্র ভ্রমাইল,
চিন্তারাম চাপরাশী এসে ।।
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি ব'সে।
কিন্তু এমন কল করেছে কালী,—
বেঁধে রেখে মায়া-পাশে ।।
কালীর পদে মনের খেদে,
দীন রামপ্রসাদে ভাষে।
আমার সেই যে কালী, মনের কালী
হলেম কালী তার বিষয় বসে।

(১৭)

পিলু বাহার—যৎ

ভবের আসা, খেলব পাশা,
বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আসা ভাঙ্গদশা, প্রথমে পাঁজুরিপলো।
প বাব আঠার ষোল যুগে যুগে এলেম ভালো।
শেষে কচ্চে বার পেয়ে মাগো
পাঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলো ।।

ছ'দুই আট, ছু'চার দশ,
কেহ নয় মা আমার বশ।
আমার খেলাতে না হ'ল যশ,
এবার বাজি ভোর হোলো॥

(১৮)

এবার বাজি ভোর হলো
মন কি খেলা খেলবে বল ॥
শতরঞ্চ প্রধানপঞ্চ, পঞ্চ আমায় দাগা দিল
এবার বোড়ের ঘর করে ভর,
যন্ত্রটি বিপাকে মলো।
ছ'টা অশ্ব ছটা গজ, ঘরে ব'সে কাল কাটালো
তারা চলতে পারে সকল ঘরে
তবে কেন অচল হলো ॥
দুখান তরী, নিমক ভারি, বাদাম তুলি না' চলিল
ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে
ঘাটের তরী ঘাটে র'লো ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মোর কপালে একি ছিল?
ওরে অতঃপরে কোনোর ঘরে
পীলের কিস্তে যাত হইল

(১৯)

বিভাস—ঝাঁপতাল।

তাই বলি মন জেগে থাক,
পাছে আছেরে কাল চোর।
কালী নামের অসি ধর, তারা নামের ঢাল,
ওরে সাধ্য কি শমনে তোর করতে পারে জোর।
কালী নামের নহবৎ বাজে, করি মহা সোর।
ওরে শ্রীদুর্গা বলিয়া রে রজনী কর ভোর ॥
কালী যদি না তরাবে, কালী মহা ঘোর।
কত মহাপাপী তরে গেল
রামপ্রসাদ কি চোর?

(২০)

মন কর না সুখের আশা।
যদি অভয়-পদে ল'বে বাসা ॥
হোয়ে ধর্ম্ম-তনয় ত্যজে আলয়,
বনে গমন হেরে পাশা।
হোয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক,
তেঁই তো শিবের দৈন্য দশা।
সে-যে দু:খী দাসে দয়া বাসে,
মন সুখের আশে বড় কসা।
হরিষে বিষাদ আছে মন
কর না একথার গোঁসা ॥
ওরে সুখেই দুখ দুখেই সুখ,
ডাকের কথা আছে ভাষা।
মন ভেবেছ কপট ভক্তি, করে পুরাইবে আশা
কবে কড়ার কড়া তস্য কড়া,
এড়াবে রতি মাসা ॥
প্রসাদের মন হও যদি মন,
কর্ম্মে কেন হওরে চাষা।
ওরে মনের মতন কর যতন
তরণ পাবে অতি খাসা ॥

(২১)

বিভাস— ঝাঁপতাল

কে জানে গো কালী কেমন
ষড়্দর্শনে না পায় দরশন ॥
কালী পদ্মবনে, হংস সনে,
হংসী রূপে করে রমণ।
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে,
সদা যোগী করে মনন ॥
আত্মারামের আত্মা কালী,
প্রমাণ প্রণবের মতন।

তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন,
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ।।
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড,
প্রকাণ্ড তা জান কেমন ।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম
অন্য কেবা জানে তেমন ।।
প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বোঝে না,
ধরবে শশী হয়ে বামন ।।

(২২)

মাগো তারা ও শঙ্করী,
কোন অবিচারে আমার পরে,
করলে দুঃখের ডিক্রি-জারি ।।
এক আসামী ছয়টা প্যায়দা,
বল মা কিসে সামাই করি ।
আমার ইচ্ছা হয় মা ঐ ছটারে,
বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি ।।
প্যায়দার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র,
তার নামেতে নিলাম জারি ।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি,
তারে দিলে জমিদারী ।।
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি ।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে,
বসে আছ রাজকুমারী ।
হুজুরে উকীল যে জনা,
ডিস্‌মিসে তার আশায় ভারি ।

(২৩)

করে আসল সন্ধি গাওয়াল বন্দি,
যে রূপে মা আমি হারি ।।
পালাইতে স্থান নাই মা বল কিবা উপায় করি ।

ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ,
তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি ॥

(২৪)

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই।
আগে পাছে দুখ চলে মা,
যদি কোনখানেতে যাই ॥
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে,
দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা,
বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো,
বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি,
বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখে সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে,
আমি করি দুঃখের বড়াই ॥

(২৫)

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বলনা।
ওরে রাণী আছেন ব্রহ্মময়ী,
সু সাধ সেই লহনা ॥
ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সপ্রকাশ,
(মনরে ওরে) শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী,
নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা ॥
কানে যদি ঢোকে জল,
বার করে যে জানে কল,
(মনরে ওরে) সে জলে মিশায়ে জল,
ঐহিকের এরূপ ভাবনা ॥

(২৬)

বিভাস—ঝাঁপতাল

ঘরে আছে মহারত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাঁচে যত্ন
(মনরে ওরে) শ্রীনাথদত্ত, কর তত্ত্ব,
কলের কপাট খোলনা ।।
অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদি ঘাতি,
(মনরে ওরে) জনম মরণ শৌচ,
সন্ধ্যা পূজা বিড়ম্বনা ।।
প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে ;
(মনরে ওরে) সিন্দূর বিধবার ভালে,
মরি কিবা বিবেচনা ॥

(২৭)

গারা ভৈরবী—ঠুংরী

অপার সংসার, নাহি পারাবার ।
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ
বিপদে তারিণী করগো নিস্তার ।।
যে দোখ তরঙ্গ অগাধ ভারি,
ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে মা মরি ।
তার কৃপা করি কিঙ্কর তোমারি,
দিয়ে চরণ তরী রাখ এইবার ।।
বহিছে তুফান, নাহিক বিরাম,
থর থর অঙ্গ, কাঁপে অবিরাম ।
পুরাও মনস্কাম, জপি তারা নাম,
তারা তব নাম সংসারের সার ।।
কাল গেল কালী হ'ল না সাধন,
প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন ।
এ ভব বন্ধন কর বিমোচন,
মা বিনে তারিণি কা'রে দিব ভার ।।

(২৮)

গারা ভৈরবী—ঠুংরী

নিতি তোরে বুঝাবে কেটা
বুঝে বুঝলি নারে ঠেঁটা ।।
কোথা রবে দালান বাড়ি তোর,
কোথা রবে দালান কোঠা ।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে মন,
(ও মন ! ' কোথা রবে বাপ-খুড়া জ্যেঠা ।।
মরণ সময় দিবে তোমায়,
ভাঙ্গা কলসী ছেঁড়া চেঠা ।
ওরে সেখানেতে তোর নামেতে,
আছেরে যে জাবদা আঁটা ।।
যত ধন জন সব অকারণ,
সঙ্গেতে না যাবে কেটা ।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে,
ছাড়রে সংসারের লেঠা ॥

(২৯)

কাজ কিরে মন যেয়ে কাশী
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি ।।
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটি তীর্থ, মায়ের চরণ-বাসী ।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান,
কাজ কি হ'য়ে কাশীবাসী ।
হৃদকমলে ভাব বসে, চতুর্ভূজা মুক্তকেশী ।।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি
পাবে কাশী দিবানিশি ।।

(৩০)

জংলা—একতালা

রসনে কালী নাম রটরে ।
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জঠরে ।।

কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে ;
এ কেবল বাদার্থ মাত্র, খুঁজতেছে ঘটপট রে ॥
রসনারে কর বশ, শ্যামা-নামামাতৃ রস ।
তুমি গান কর পান কর,
সে পাত্রের পাত্র বটরে
সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্য ধাম ।
করে জপনা কালীর নাম, কি তব উৎকটরে ॥
শক্তি রাখ সত্ত্বগুণে, দ্বি-অক্ষর কর মনে ।
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া
কালী বলে কাল কাট রে ॥

৩১

মন ভুল না কথার ছলে ।
লোকে বলে বলুক মাতাল বলে ॥
সুরাপান করিনেরে সুধা খাই যে কুতূহলে ।
আমার মন মাতালে যেতেছ আজ
মদ মাতালে মাতাল বলে ॥
অহর্নিশি থাকি বসি, হরমহিষীর চরণ তলে ।
নৈলে ধরবে নিশা, ঘুচবে দিশা,
বিষম বিষয় মদ খাইলে ॥
মন্ত্র ভরা মন্ত্র সোঁড়া, আশু ভাসে যেই জলে,
সে যে অকুল তারণ, কুলের কারণ,
কুল ছেড়ো না পরের বোলে ।
ত্রিগুণে তিনের জন্ম, যাদক বলে মোহের ফলে ।
সত্বে ধর্ম্ম তমে মর্ম্ম কর্ম্ম হয় মনরজ মিশালে ॥
মাতাল হলে বোতল পাবে,
বৈতালী করিবে কোলে ।
রামপ্রসাদ বলে নিদান কালে,
পতিত হবে কুল ছাড়িলে ॥

৩২

জংলা—একতালা

মন রে আমার এই মিনতি
তুমি পড়া পাখী হও, করি স্তুতি।
যা পড়াই তাই পড় মন,
পড়লে শুনলে দুধি ভাতি।
ও রে জান না কি ডাকের কথা,
না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি॥
কালী কালী কালী পড় মন,
কালী পদে রাখ প্রীতি।
ও রে পড় বাবা আত্মারাম,
আত্মজনের কর গতি॥
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে
বেরিয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে গাছের ফলে কদিন চলে,
করবে চার ফলের স্থিতি॥
প্রসাদ বলে ফলা গাছে,
ফল পাবি মন শুন যুকতি।
ও রে বসে মূলে, কালী বলে,
গাছ নাড়া দাও নিতি নিতি॥

৩৩

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা॥
তুমি পাষাণ মেয়ে বিষম মায়া
কত কাচ কাচাও মা কাচ॥
উপাসনা ভেদে তুমি, প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে এক করে ভাবে,
তার হাতে মা কোথা বাঁচ॥
বুঝে ভার দেয় না যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে,

সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ ॥
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মাতা হোয়ে,
মনময়ি হয়ে নাচ ॥

(৩৪)

মুলতান—একতালা

মন কালী কালী বল।
বিপদনাশিনী কালীর নাম জপনা,
ওরে ও মন, কেন ভুল ॥
কিঞ্চিত করো না ভয়, দেখ অগাধ সলিল।
ওরে অনায়াসে ভবনদীর কালী কুলাইবেন কুল ॥
যা হবার তা হলো ভাল, কাল গেল মনকালী বল
এবার কালের চক্ষে দিয়ে ধুল, ভবপারাবারে চল
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কেন মন ভুল।
ওরে, কালী নাম অন্তরে জপ,
বেলা অবসান হইল ॥

(৩৫)

মুলতান—একতালা

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অম্বরে
নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে,
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধরাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িৎ শোভা করে ॥
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ-চাতকের তৃষ্ণা-ভয় ঘুচিল সত্বরে ॥
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে, আর জন্ম হবে না উঠেরে ॥

(৩৬)

এবার আমি ভাল ভেবেছি,
এক ভাবির কাছে ভাব শিখেছি।
কালীপদ মকরত আলানে,

মন-কুঞ্জরে রে বাঁধ এঁটে।
ওরে কালী নাম তীক্ষ খড়্গে
কর্ম্মপাশ ফেল কেটে ।।
নিতান্ত বিষয়াসক্ত মাথায় কর বেসার বেটে।
ওরে একে পঞ্চ ভূতের ভার,
আবার ভূতের মর খেটে।
সতত ত্রিতাপের তাপে, হৃদি-ভূমি গেল ফেটে।
নব কাদম্বিনীর বিডম্বনা, পরমায়ু যায় খেটে ।।
নানা তীর্থ পর্য্যটনে, শ্রম মাত্র পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে বসি চারি ফল, বুঝনারে দুঃখ চেটে ।।
রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয়,
মিছে মোলেম শাস্ত্র ঘেঁটে।
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম করে,
ব্রহ্মরন্ধ্র যাক ফেটে।

(৩৭)

এবার কালী কুলাইব।
কালী কোসে কালী বুঝে লব ।।
সে নৃত্য-কালী 'ক অস্থিরা,
কেমন করে তার রাখিব।
আমার মনযন্ত্রে বাদ্য করে,
হৃদি-পদ্মে নাচাইব ।।
কালী পদের পদ্ধতি যা,
মন তোরে তা জানাইব।
আছে আর যে ছটা বড ঠ্যাটা,
সে কটাকে কেটে দিব ।।
কালী ভেবে কালী হোয়ে,
কালী বলে কাল কাটাইব
আমি কালাকালে কালের মুখে,
কালী দিয়ে চলে যাব ।।
প্রসাদ বলে আর কেন মা,

আর কত গো প্রকাশিব।
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু,
কালী কালী না ছাড়িব ॥

(৩৮)

জংলা—একতালা

একবার ডাকরে কালী তারা বলে,
জোর করে রসনে! ও তোর ভয় কিরে শমনে,
কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কাশী,
যার হৃদে জাগে এলোকেশী।
তার কাজ কি ধর্ম্ম কর্ম্ম, ও তার মর্ম্ম যেবা জানে
ভজনের ছিল আশা, সুক্ষ্ম মোক্ষ পূর্ণ আশা।
রামপ্রসাদের এই দশা দ্বি-ভাব ভেবে মনে ॥

(৩৯)

সোহিনী—একতালা

আয় দেখি মন চুরি করি,
তোমায় আমায় একত্তরে।
শিবের সর্ব্বস্ব ধন, মায়ের চরণ,
যদি আনতে পারি হরে
জাগা ঘরে চুরি করা, ইতে যদি পড়ি ধরা,
তবে মান দেহের দফা সারা,
বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে।
গুরুবাক্য দৃঢ় করে, যদি যাইতে পারি ঘরে,
ভক্তিবাণ হুরেক মেরে, শিবত্ব-পদ লব কেড়ে ॥

(৪০)

তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না ॥
কিছু দিলে না, পেলে, দিবে না, পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কি মোর! হোক দিলে দিলে বাজী,
তাতেও আছি রাজি, এবার এ বাজী ভোর গো ॥

এমা—দিতিস—দিতাম, নিতাম খেতাম,
মজুরি করিয়ে তোর।
এবার মজুরি হল না, মজুরা চাব কি,
কি জোরে করিব জোর গো॥
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা,
মিছামিছি করি শোর।
শুধু শোর করা সারা, তোর যে কুধারা,
মোর যে বিপদ ঘোর গো॥
এমা ঘোর মহানিশা, মন যোগে জাগে,
কি কাজ তোর কঠোর।
আমার এ কুল ও কুল, দুকুল গেল
সুধা না পেলে চকোর গো॥
এমা, আমি টানি কূলে, মন প্রতিকূলে,
দারুণ করম জোর।
রামপ্রসাদ কহিছে, পড়ে দু'টানায়,
মরে মন ভূঁড়া চোর গো॥

(৪১)

সোহিনী বাহার—একতালা

মন খেলাওরে, দাণ্ডাগুলি।
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি॥
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, চম্পাকলি ধূলাধূলি।
আমি কালীর নামে মারবো বাড়ি
ভাঙবো যমের মাথার খুলি॥
ছয় জনের মন্ত্রণা নিলি,
তাইতে পাগল ভুলে গেলি,
রামপ্রসাদের খেলা ভাড়িলি,
গলে দিলি কাঁথা ঝুলি॥

(৪২)

রসনায় কালী কালী বলে।
আমি শঙ্কা মেরে যাব চলে॥

সুরা পান করিনেরে, সুধা খাইরে কুতূহলে।
আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ,
মদ মাতালে মাতাল বলে।
খালি মদ খেলেই কি হয়,
লোকে কেবল মাতাল বলে
যা আছে কর্ম্ম কে জানে মর্ম্ম,
জানে কেবল সেই পাগলে ॥
দেখা দেখি সাধয়ে যোগ,
সিজে কায়া বাড়য়ে রোগ।
ওরে মিছে মিছি কর্ম্মভোগ,
গুরু বিনে প্রসাদ বলে ॥

(৪৩)

বিপুল বাহার—যৎ

ওরে সুরাপান করিনে আমি,
সুধা খাই জয় কালী বলে,
মন মাতালে মাতাল করে,
মদ মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি-মসলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞান শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটী,
পান করে মোর মন-মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা মা,
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্ব্বর্গ ফল মেলে ॥

(৪৪)

বসন্ত বাহার—একতালা

কালী কালী বল রসনা।
কর পদ ধ্যান, নামামৃত পান,
যদি হতে ত্রাণ থাকে বাসনা ॥
ভাই বন্ধু সুত, দারা পরিজন,
সঙ্গের দোসর নহে কোন জন।

দুরন্ত শমন, বাঁধবে যখন,
বিনে ঐ চরণ, কেহ কার না ।।
দুর্গা নাম মুখে বল একবার,
সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম আমার ।
অনিত্য সংসার নাহি পারাবার,
সকলি অসার ভেবে দেখনা ।।
গেল গেল কাল, বিফলে গেল,
দেখনা কালান্ত নিকটে এলো ।
প্রসাদ বলে ভাল, কালী কালী বল,
দূর হবে কাল-যম যন্ত্রণা ।।

(৪৫)

এই সংসার ধোঁকার টাটী ।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি ।।
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু শুন্যে-পাঁচে পরিপাটী-
প্রথমে প্রকৃতিস্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি ।
যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া,
অভাবেতে স্বভাব যেটী ।।
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলেম মাটী
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী
মায়ার বেড়ি কিসে কাটি ।।
বচ সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী ।
রমণী আগে ইচ্ছা সুখে পান করে,
বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি ।।
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে,
আদি পুরুষের আদি মেয়েটি ।
ওমা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর মা
তুমি গো পাষাণের বেটী ।।

(৪৬)

বসন্ত বাহার—একতালা

মা হওয়া কি মুখের কথা
(কেবল প্রসব করে হয় না মাতা)
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা ॥
দশ মাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা।
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না,
এল পুত্র গেল কোথা ॥
সন্তানে কুকর্ম্ম করে, বলে সারে পিতামাতা
দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড,
তাতে তোমার হয় না ব্যথা ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে মা, এ চরিত্র শিখ্‌লে কোথা
যদি ধর আপন পিতৃধারা,
নাম ধরো না জগন্মাতা ॥

(৪৭)

আমি ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা।
ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা ॥
চেননা আমারে শমন,
চিন্‌লে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি,
অভয় পদের বইরে বোঝা,
ক্ষেপার খাসে আছি বসে,
নাই মহালে শুকা হাজা।
দেখ বালি চাপা সিকস্তু নদী,
তাতেও মহাল আছে তাজা ॥
প্রসাদ বলে শমন তুমি,
বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা,
ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছে,
জাননা সে পদের মজা ॥

(৪৮)

বসন্তবাহার—একতালা

যারে শমন যারে ফিরি।
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি ।।
পাপপুণ্যের বিচারকারী
তোর যম হয় কালেক্টারী
আমার পুণ্যের দফা সর্ব্বে শূন্য,
পাপ নিয়ে যা, নিলাম করি ।।
শমন-দমন-শ্রীনাথ-চরণ সর্ব্বদাই হৃদে ধরি।
আমার কিসের শঙ্কা, মেরে ডঙ্কা,
চলে যাব কৈলাস-পুরী ।
রামপ্রসাদের মা শঙ্করী, দেখনা চেয়ে ভয়ঙ্করী,
আমার পিতা বটেন শুলপাণি,
ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী ।।

(৪৯)

দূর হয়ে যা যমের ভটা।
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা ।।
বল্‌গে যা তোর যম-রাজারে,
আমার মতন নিছে কটা।
আমি যমের যম হইতে পারি,
ভাবলে ব্রহ্মময়ির ছটা।
প্রসাদ বলে কালের ভটা,
মুখ সামলায়ে বলিস বেটা।
কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে
সাজা দিলে রাখবে কেটা ।।

(৫০)

বসন্তবাহার—একতালা

আমি নই আটাশে ছেলে।
ভয়ে ভুলব নাকো চোখ রাঙালে ।।

সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ,
শিব ধরেন যা হৃদকমলে।
(ওমা) আমার বিষয় চাইতে গেলে,
বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥
শিবের দলিল সৈ মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে
এবার করব নালিশ নাথের আগে,
ডিক্রী লব এক সওয়ালে ॥
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ,
গুজরাইব মিছিল কালে ॥
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা,
ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায়
শান্ত করে লবে কোলে ॥

কোথাও এই রূপে পাঠান্তর দৃষ্ট হয় :—

মা, আমি কি আঠাশে ছেলে ?
আমি ভয় করি না চোখ রাঙ্গালে ॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গা পদ, শিব ধরে মা হৃদকমলে
আমার বিষয় চাহিতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে ।
আমি শিবের দলিল সৈ' মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে
এবার করব নালিশ বাপের আগে,
ডিক্রী লব এক সওয়ালে ॥
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে
তখন শান্ত হব ক্ষান্ত করে
আমায় যখন করবি কোলে ॥

(৫১)

জংলা—একতালা

মা আমি পাপের আসামী।
এই লোকসানি মহাল লয়ে বেড়াই আমি

পতিতের মধ্যে লেখা যায় এই জমী।
তাই বারে বারে নালিশ করি, দিতে হবে কমী ॥
আমি মোলে এ মহলে, আর নাই হামি।
মাগো এখন ভাল না রাখগে, থাকুক রাম রামি ॥
গঙ্গা যদি গর্ভে টানে, লইল এই ভূমি ॥
কেবল কথা রবে, কোথা রব কোথা রবে তুমি ॥

(৫২)

পতিত পাবনী তারা,
ওমা কেবল তোমার নামটী সারা ॥
ঐ যে তরাসে আকাশে বাস,
বুঝেছি মা কাজের ধারা ॥
বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল
তদবধি হইয়াছ ফণী যেন মণি হারা ॥
ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই,
কার্য্য কারণ তোমার নাই।
ভয়ার সয় তয় রয় সেইরূপে বর্ণপারা ॥
দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠি একের বোঝা
লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা ॥
পাগল বেটার কথায় মজে এতকাল মলাম ভজে
দিয়াছি গোলামী খৎ, এখন কি আর আছে চারা
আমি দিলাম নাক খৎ, তুমি দাও মা ফারখৎ।
কলায় কলায় দাওয়া ঝুটা,
সাক্ষী তোমার ব্যাটা যারা ॥
বসতি ষোড়শ দলে, ব্যক্ত আছে ভূমণ্ডলে।
প্রসাদ বলে কুতূহলে তারায় লুকায় তারা ॥

(৫৩)

জংলা—একতালা।

মোরে তারা বলে কেন না ডাকিলাম।
আমার এ তনুতরণী ভবসাগরে ডুবাইলাম।

এ ভব-তরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম।
তাতে ত্যজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পুরাইলাম॥
বিষম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম।
মন ডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম।
প্রসাদে বলে মাগো আমি কি কাজ করিলাম
আমার তুফানে ডুবিল তরী আপনি মজিলাম॥

(৫৪)

সোহিনী—একতালা।

দেখি মা কেমন ক'রে আমারে ছাড়ায়ে যাবা।
ছেলের হাতের কলা নয় মা,
ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা॥
এমন ছাপান ছাপাইব,
মাগো খোঁজে খোঁজে নাহি পাবা।
বৎস পাছে গাভী যেন,
তেমনি পাছে পাছে ধাবা।
প্রসাদ বলে ফাঁকি ঝুঁকি,
মাগো দিতে পার পেলে হাবা।
আমায় যদি না তরাও মা,
শিব হবে তোমার বাবা॥

(৫৫)

সোহিনী— একতালা।

মন করো না দ্বেষা দ্বেষি,—
যদি হবেরে বৈকুণ্ঠবাসী॥
আমি বেদাগম পুরাণে,
করিলাম কত খোঁজ তালাসি।
ঐ যে কালী. কৃষ্ণ, শিব, রাম,
সকল আমার এলোকেশী॥
শিবরূপে ধর সিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি॥

দিগম্বরী দিগম্বর, পিতার চরণ বিলাসী।
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা-গোকুল নিবাসী ॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী।
যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম-নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে, পদে গঙ্গা গয়া-কাশী ॥

(৫৬)

আমার সনদ দেখে যারে।
আমি কালীর সুত যমের দূত,
বলগে যা তোর যম রাজারে ॥
সনদ দিলেন গণপতি, পার্ব্বতী অনুমতি
আমার হাজির জামিন ষড়ানন,
সাক্ষী আছে নন্দী বরে ॥
সনদ আমার উরস পাটে,
যেম্নি সনদ তেম্নি টাটে।
তাতে স্ব-অক্ষরে দস্তখৎ,
করেছেন দিগম্বরে ॥

(৫৭)

ওরে মন চড়কি চরক কর, এ-ঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাহারে ॥
যুগল স্বয়ম্ভু শম্ভু যুবতীর উপরে।
মনরে ওরে, কর পঞ্চ বিল্বদলে পূজিছে তাঁহারে ॥
ঘরেতে যুবতীর বাক্, গাজনে বাজিছে ঢাক।
মনরে ওরে, বৃন্দাবলী খ্যামটা,
ঢালী বাজায় বারে বারে ॥
কাম উচ্চ ভারায় চড়ে,
ভাংল পাঁজর পাটে পড়ে।
মনরে ওরে এমন যাতনা,
করেছ তুচ্ছ ধন্তরে তোমারে ॥

দীর্ঘ আশা চড়কগাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ।
মনরে ওরে, মায়া-ডোরে,
বঁরশী গাঁথা, স্নেহ বল যারে ॥
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিছে সার।
মনরে ওরে শিঙ্গে ফুঁকে
শিঙ্গে পাবি ডাক কেলে মারে ॥

(৫৯)

ললিত—আড় খেমটা।

কালীর নাম বড় মিঠা।।
সদা গান কর পান কর এটা—
ওরে ধিক্‌রে রসনা, তবু ইচ্ছা করে পায়স পিঠা ॥
নিরাকার সাকার, ককার সবাকার ভিটা।
ওরে ভোগ-মোক্ষ-ধাম নাম,
ইহার পর আর আছে কিটা ॥
কালী যার হৃদে জাগে, হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা
সে যে কাল হলে মহাকাল হয়,
কালে দিয়ে হাত-তালিটা ॥
জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জেলে, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ঘিটা।
তুমি মন কর বিল্বদল, শ্রুব কর যত্ন যেটা ॥
প্রসাদ বলে হৃদি-ভূমির, বিরোধ মেনে গেল মিঠা
আমার এ তনু দক্ষিণ কালীর,
দেবত্রয়ের দাগা চিঠা ॥

(৬০)

ইথে কি আর আপদ আছে।
(এই যে তারার জমী আমার দেহ)
যাতে দেবের দেব সু-কৃষাণ হয়ে,
মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে ॥
ধৈর্য্য-খোঁটা, ধর্ম্ম-বেড়া,
এ দেহের চৌদিক ঘেরেছে।
এখন কাল চোরে কি কর্ত্তে পারে,

মহাকাল রক্ষক রয়েছে ॥
দেখে শুনে ছয়টা বলদ,
ঘর হতে বাহির হয়েছে।
কালী নাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধারে,
পাপ তৃণ সব কেটেছে ॥
প্রেম ভক্তি সুবৃষ্টি তায়,
অহর্নিশি বর্ষিতেছে।
কালী কল্প তরুবরে রে ভাই, —
চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে ॥

(৬১)

ললিত—আড়-খেমটা।

কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গায়িব।
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন,
পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণ-তলে কত শত,
গয়া-গঙ্গা দেখতে পাব ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কালীর পদে শরণ লব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে,
বিমাতাকে মা বলিব।

(৬২)

তুই যারে কি করবি শমন,
শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
মনবেড়ি তার পায়ে, হৃদ-গারদে বসায়েছি
হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে
আমি আমার প্রাণ সঁপেছি ॥
এমনি করেছি কায়দা, পালাইলে নাইকো ফায়দা।
হামেশ রুজু ভক্তি প্যায়দা দুনয়ন দ্বারমান দিয়েছি
মহাজ্বর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক করেছি।

তাই সর্ব্বজ্বর-হর-লৌহ, গুরুতত্ত্ব পান করেছি
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি।
মুখে কালী কালী কালী বলে
যাত্রা করে বসে আছি।

(৬৩)

ললিত—আড় খেমটা

কালী সব ঘুচালে লেটা।
আগম নিগম শিবের বচন,
মান্‌বি কিনা মান্‌বি সেটা॥
শ্মশান পেলে ভাল বাস মা,
তুচ্ছ কর মণিকোটা।
মাগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন,
ঘুচলে না আর সিদ্ধি-ঘোটা॥
যেমন তোমার ভক্ত হয় মা
ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপিন মেলে না,
গায় ছালি আর মাথায় জটা॥
ভূতলে আনিয়ে মাগো
করলে আমায় লোহাপিটা।
আমি তবু কালী বলে ডাকি,
সাবাস আমার বুকের পাটা॥
চাকলা জুড়ে নাম রটেছে
শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা।
এ যে মায়ে পোয়ে এমন ব্যবহার,
ইহার মর্ম্ম বুঝবে কেটা॥

(৬৪)

গৌরী গান্ধার—একতালা

মা মা বলে আর ডাকব না।
ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,

আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী,
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না ॥
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,
মা কি রয়েছে চক্ষু কর্ণ খেয়ে ।
মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে,
মা মলে কি আর ছেলে বাঁচে না ॥
ভণে রামপ্রসাদ, মায়ের কি এক পুত্র—
মা হয়ে হলি মা সন্তানের শত্রু
দিবা নিশি ভাবি, আর কি করিবি,
দিবি দিবি পুন কঠোর যন্ত্রণা ॥

(৬৫)

কোথাও এইরূপে পাঠান্তর দৃষ্ট হয় :—

গৌরী গান্ধার—একতালা ।

মা মা বলে আর ডাকিব না ।
তারা দিয়াছ দিতেছ কত যন্ত্রণা ॥
বারে বারে ডাকি মা মা বলিয়ে,
মা বুঝি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
মাতা বর্ত্তমানে, এ দুঃখ সন্তানে,
মা বেঁচে তার কি ফল বলনা ॥
ছিলেম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী ।
না হয় ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মাগি খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না ॥
রামপ্রসাদ মায়ের পুত্র, মা হয়ে হলি মা ছেলের শত্রু
দিবা নিশি ভাবি, আর কি করিবি
দিবি দিবি পুন জঠর যন্ত্রণা ॥

(৬৬)

পিলু বাহার—যৎ।

ওরে মন বলি, ভজ কালী,
ইচ্ছা হয় যে আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর দিবানিশি জপ-করে
শয়নে প্রণামজ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
ওরে নগর ফির মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামামায়ে
যত শোন কর্ণপুটে, সকলি মায়ে মন্ত্র বটে।
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে—ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে—
ওরে, আহার কর মনে কর,
আহুতি দেই শ্যামা মাকে॥

(৬৭)

পিলুবাহার—যৎ।

সামাল সামাল ডুবলো তরী।
আমার মনরে ভোলা, গেল বেলা,
ভজলে না হরসুন্দরী॥
প্রবঞ্চনার বিকিকিনি, করে ভরা কৈলে ভারি।
সারাদিন কাটালে ঘাটে বসে
সন্ধ্যাবেলা ধরলে পাড়ি॥
একে তোর জীর্ণ তরী, কলুষেতে হলো ভারি।
যদি পার হবি মন ভবার্ণবে,
শ্রীনাথে কর কাণ্ডারী॥
তরঙ্গ দেখিয়া ভারি, পলাইল ছয়টা দাঁড়ী।
এখন গুরু ব্রহ্ম, সার কর মন,
যিনি হন ভব কাণ্ডারী॥

(৬৮)

পিলু বাহার—যৎ।

জানিলাম বিষম বড়, শ্যামা মায়েরি দরবার রে।
সদা ফুকারে ফরিয়াদী বাদী, না হয় সঞ্চার রে॥

আরজ বেগী যার শিবে, সে দরবারের ভাগ্য কিরে,
দেয়ান যে দেওয়ানা নিজে, আস্থা কি কথার রে।
লাখ উকীল করেছি খাড়া,
সাধ্য কি মা ইহার বাড়া।
তোমায় তারা ডাকে আমি ডাকি,
কান নাই বুঝি মার রে॥
গালাগালি দিয়ে বলি, কান খেয়ে হয়েছ কালী।
রামপ্রসাদ বলে, প্রাণ কালী,
করিল আমার রে॥

(৬৯

জংলা—একতালা।

মন কেনরে পেয়েছে এত ভয়।
ও তুমি কেনরে পেয়েছ এত ভয়॥
তুফান দেখে ডরো না রে ও তুফান নয়।
দুর্গা নাম তরণী করে বেয়ে গেলে হয়॥
পথে যদি চোকীদারে, তোরে কিছু কয়;
তখন ডেকে বলো, আমি শ্যামা মায়েরি তনয়॥
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন, তুই কারে করিস ভয়।
আমার এ তনু দক্ষিণার পদে করেছি বিক্রয়॥

(৭০)

বড়াই কর কিসে গো মা।
জানি তোমার আদি মূল, বড়াই কর কিসে॥
আপনি ক্ষেপা, পতি ক্ষেপা, ক্ষেপা সহবাসে।
তোমার আদিমূল সকলি জানি,
দাতা কোন পুরুষে
মাগী মিন্সে ঝগড়া করে রৈতে নার বাসে।
মাগো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে,
ফিরে দেশে দেশে॥
প্রসাদ বলে, মন্দ বলি, তোমার বাপের দোষে।
মাগো আমার বাপের নাম লইলে,
বিরাজ কৈলাসে॥

(৭১)

ওরে শমন, কি ভয় দেখাও মিছে।
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ,
সে মোরে অভয় দিয়াছে॥
ইজারার পাট্টা পেয়ে, এত কি গৌরব বেড়েছে।
(ওরে), স্বয়ং থাকতে কুশের পুতুল,
কে কোথা দাহন করেছে॥
হিসাব বাকী থাকে যদি,
দিব না রে তোদের কাছে।
(ওরে) রাজ থাকতে কোটালের দোহাই,
কোন দেশেতে কে দিয়াছে॥
শিব-রাজ্যে বসতি করি,
শিব আমায় পাট্টা দিয়াছে।
রামপ্রসাদ বলে, সেই পাট্টাতে
ব্রহ্মময়ী সাক্ষী আছে॥

(৭২)

জংলা—একতালা।

জয় কালী জয়-কালী, বলে জেগে থাকরে মন।
তুমি ঘুম যেয়ো না রে (ভোলা মন),
ঘুমেতে হারাবে ধন॥
নবদ্বার-ঘরে, সুখে শয্যা করে,
হইবে যখন অচেতন।
তখন আসবে নিন্দ, চোরে দিবে সিঁদ,
হরে লবে সব রতন॥

(৭৩)

লগ্নী—আড়খেমটা।

মন বসন পর।
বসন পর বসন পর, মাগো বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো॥
কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী।

বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো ॥
পাতালেতে ছিলে মাগো, হয়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো ॥
কার বাড়ী গিয়েছিলে, মাগো কে করেছে সেবা।
শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্ত জবা গো ॥
ডান হস্তে বরাভয়, মাগো বাম হস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড করেছ গো রাশি রাশি ॥
অসিতে রুধির ধারা, মাগো গলে মুণ্ডমালা।
হেঁটমুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো ॥
মাথায় সোনার মুকুট, মাগো ঠেকেছে গগনে।
মা হয়ে বালকের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো ॥
আপনি পাগল, পতি পাগল,
মাগো আরও পাগল আছে।
ওমা রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল,
চরণ পাবার আশে গো ॥

(৭৪)

লগ্নী—আড়খেমটা

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি
কালী নাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি ॥
আমি এ দেহ বেচে ভবের হাটে,
দুর্গা নাম কিনে এনেছি।
দেহের মধ্যে সুজন যে জন,
তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে,
দেখাব ভেবে রেখেছি।
সারাৎসার তারা নাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে,
যাত্রা করে বসে আছি ॥

(৭৫)

সিন্ধু ঠুংরী।

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে,
তারা বয়ে পড়বে ধারা॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়বে লুটে, তারা বলে হবে সারা।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ, দেখ মাকে,
তিমিরে তিমির হারা॥

(৭৬)

সিন্ধু ঠুংরী

তারা-তরী লেগেছে ঘাটে,
যদি পারে যাবি মন আয় ছুটে॥
তারা নামে পাল খাটায়ে, ত্বরায় তরী চল বেয়ে;
যদি পারে যাবি, দুখ মিটাবি,
মনের গিরা দেরে কেটে॥
বাজারে বাজার কর মন,
মিছে কেন বেড়াও ছুটে,
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হল,
কি করবে আর ভবের হাটে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, বাঁধবে বুক এঁটে সেটে।
ওরে এবার আমি ছুটিয়াছি,
ভবের মায়া বেড়ী কেটে॥

(৭৭)

এবার আমি করবো কৃষি।
ওগো এ-ভব সংসারে আসি।

তুমি কৃপাবিন্দু পাত করিয়ে, বসে দেখ রাজমহিষী।
দেহ জমীন জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চাষী।
(মাগো) যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হইলে,
আনন্দে সাগরে ভাসি॥
হৃদয় মধ্যেতে আছে, পাপরূপী তৃণরাশি।
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারিতে মুক্ত কর গো মা মুক্তকেশী॥
কাম আদি ছয়টা বলদ, বহিতে পারে অহর্নিশি।
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে,
শস্য পাব রাশি রাশি॥
প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষী।
আমার মনের বাসনা তোমার
ও রাঙ্গা চরণে মিশি॥

(৭৮)

সিন্ধু ঠুংরী

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুতলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিতে সঙ্গে লবি
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠপুত্র,
তত্ত্বকথা তায় সুধাবি॥
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে
তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর,
পিতা মাতায় তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয়,
ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা,
তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ,
তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি॥

প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে, দূরে রইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হলে,
কালের কাছে জবাব দিবি
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর
মনের মত মন হবি॥

(৭৯)

সিন্ধু ঠুংরী

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না।
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি,
জেনেও কি তাই জান না—
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে কোন লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা
ওরে কোন লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয়,
আলো চাল আর বুট ভিজানা॥
জগৎকে পালিয়েছেন যে মা,
সাদরে তাই কি জাননা।
ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি,
মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা॥

(৮০)

মনরে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ॥
পরিহর ধনমদ, ভজ পদ কোকনদ।
কালেরে নৈরাশ কর, কথা শুন কথা রাখ॥
কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম।
অষ্ট যামের অর্দ্ধ যায়, আনন্দতে সুখে থাক॥
রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় কর জয়।
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই করে হাঁক॥

(৮১)

সিন্ধু ঠুংরী

ছি ছি মন তুই বিষম* ভোলা।
কিছু জান না, মান না, শুন না কথা।।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থোবা।
ওরে জ্ঞান খড়্গে বলিদান,
করিলে কৈবল্য পাবা।
কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার ব্যাটার মত লবা।
ওরে মায়া সূত্র, ভেদ সূত্রে,
তারে দূরে হাঁকায়ে দেবা।।
আত্মারামের অন্নভোগ, দুটা সেই মাকে দিবা।
রামপ্রসাদ দাসে কয় শেষে
ব্রহ্মরসে মিশাইবা।।

(৮২)

আর ভুলালে ভুলব না গো।
আমি অভয়-পদ সার করেছি,
ভয়ে হেল্‌ব দুল্‌ব না গো।।
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উলবো না গো।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান,
মনের আগুন তুল্‌বো না গো।।
ধন-লোভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুল্‌বো না গো।
আশা-বায়ুগ্রস্ত হয়ে, মনের কথা খুল্‌ব না গো।
মায়া পাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুলবো না গো।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি,
ঘোলে মিশে ঘুল্‌ব না গো।।

*কোথায়ও বিষম স্থলে 'বিষয়' দৃষ্ট হয়।

(৮৩)

সিন্ধু ঠুংরী

আছি তেই তরু তলে বসি।
মনের আনন্দে আর হরষে ॥
আগে ভাঙ্গব গাছের পাতা,
ভাটি ফল ধরব শেষে।
রাগ দ্বেষ লোভ আদি, পাঠাব সব বনবাসে।
রব রসাভাবে হা প্রত্যাশে, ফলিতার্থ সেই রসে ॥
ফলে ফলে সুফল লয়ে, যাইব আপন নিবাসে।
আমার বিফলকে ফল দিয়ে,
ফলাফল ভাসাও নৈরাশে ॥
মন কর কি, লওরে সুধা, তুজনাতে মিলেমিশে।
খাবে একই নিশ্বাসে যেন
সূর্য্য তেজে সকল শোষে ॥
রামপ্রসাদ বলে, আমার কোষ্ঠী, শুদ্ধ তারা রেশে
মাগী জানে না যে মন কপাটে,
খিল দিয়েছি বড় কষে ॥

(৮৪)

মাগো আমার কপাল দুষী।
দুষী বটে গো আনন্দময়ী ॥
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে,
যেতে নারিলাম বারাণসী।
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে,
মোর ভাগ্যেতে একাদশী ॥
অন্নত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি,
আমার কৃষি সকল নিল জলে,
কেবলমাত্র লাঙ্গল চাসি ॥
না করিলাম ধর্ম্ম কর্ম্ম, পাপ করেছি রাশিরাশি
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে,
পথ ভুলে রয়েছি বসি ॥

জনমি ভারতভূমে, মা ! কি কর্ম্ম করিলাম আসি ।
আমার একুল ওকুল দুকুল গেল,
অকুল পাথারে ভাসি ।।
শ্রীরামপ্রসাদে বলে ভাবতে নারি দিবা নিশি ।
ওমা যখন শমন জোর করিবে,
দুর্গা নামে দিব ফাঁসি ।।

(৮৫)

পিলুবাহার— যৎ

কালী নাম যপ কর, যাবে কালীর কাছে ।
কালী ভক্ত, জীবন্মুক্ত, যে ভাবে যে আছে ।।
শ্রীনাথ করুণা সিন্ধু, অকিঞ্চন দীনবন্ধু
দেখালেন কালী পাদ-পদ্ম-কল্প-গাছে ।
গ্রহে মুক্তি মূর্ত্তিমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী,
শিব শিবা রাত্রি দিবা, রক্ষা হেতু আছে ।
যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহীর বাসনা ভোগ,
মার ইচ্ছা যোগ ভোগ, ভক্তজনে আছে ।
আনন্দে প্রসাদ কয় কালী কিঙ্করের জয়,
অণিমাদি আজ্ঞাকারী, পড়ে থাক পাছে ।

(৮৬)

টোরী জৌনপুরী - একতালা

সময় তো থাকবে না গো মা, কেবল কথা রবে ।
কথা রবে কথা রবে, মাগো জগতে কলঙ্ক রবে ।
ভাল কিবা মন্দ বাণী অবশ্য একটা দাঁড়াইবে
সাগরে যার বিছানা মা শিশিরে তার কি করিবে
দুঃখে দুঃখে জর জর আর কেন মা দুঃখ দিবে
কেবল ঐ দুর্গানামে শ্যামা নামে কলঙ্ক রটিবে ।

(৮৭)

টোরী—জৌনপুরী

আমায় ছুঁয়োনা যে শমন আমার জাত গিয়াছে ।
যেদিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে ।।

শোন্‌রে শমন বলি, আমার জাত কিসে গিয়াছে,
(ও শমন রে !) আমি ছিলেম গৃহবাসী,
কেলে সর্ব্বনাশী আমায় সন্ন্যাসী করেছে।
মন রসনা এই দু'জনা,
কালীর নামে দল বেঁধেছে (ওরে শমন রে) ।
ইহা করে শ্রবণ, রিপু ছয়জন, ডিঙ্গা ছাড়িয়াছে ॥

(৮৮)

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে।
কালী-পাদ-পদ্ম-সুধা ত্যজি,
কূপে পড়ে আপন খাবে ॥
ভবজরা পাপ-রোগ, নীলাচলে নানা ভোগ,
ওরে জরে কাশী সর্ব্বনাশী,
ত্রিবেণী স্নানে রোগ বাড়াবে ॥
কালী-নাম মহৌষধি ভক্তিভাবে পানবিধি।
(ওরে) পান কর পান কর,
আত্মারামের আত্মা হবে।
মৃত্যুঞ্জয়ে উপযুক্ত সেবায় হবে আশু মুক্ত।
ওরে সকলি সম্ভবে তাঁতে পরমাত্মা মিশাইবে
প্রসাদ বলে মন ভায়া, ছাড়ি কল্পতরু ছায়া,
ওরে কাঁটা-বৃক্ষের তলে গিয়ে,
মৃত্যু-ভয়টা কি এড়াবে ॥

(৮৯)

পিলু বাহার—যৎ

এ শরীরে কাজ কি রে ভাই
দক্ষিণে প্রেমে না গেল।
এ রসনায় ধিক্ ধিক্ কালী-নাম নাহি বলে ॥
কালী-রূপে যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে।
ওরে সেই সে দুরন্ত মন, না ডুবে চরণ তলে ॥
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ।
ওরে সুধাময় নাম শুনে, চক্ষু না ভাসালে জলে ॥

যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে
ওরে না পূরে অঞ্জলি চন্দন জবা আর বিল্বদলে ॥
সে চরণে কাজ কিবা, মিছা শ্রম রাত্রি দিবা।
ওরে কালী-মূর্ত্তি যথা তথা ইচ্ছা সুখে নাহি চলে
ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার।
রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে
অম্র কি কখন ফলে ॥

(৯০)

আয় দেখি মন তুমি আমি
দু'জনে বিরলেতে বাসরে।
যুক্তি করি মন পানে, পিঞ্জর গড়ব গুরু-চরণে,
পদে লুকাইব সুধা খাব,
যমের বাপের কি ধার ধারিরে ॥
মন বলে করিবে চুরি, ইহার সন্ধান বুঝিনে রে।
গুরু দিয়াছেন যে ধন
অভয়চরণ কেমনে খরচ করিবে ॥
শ্রীরামপ্রসাদে আশা,
কাঁটা কেটে খোলসা করিবে ॥
মধুপুরী যাব মধু খাব,
শ্রীগুরুর নাম হৃদে ধরে ॥

(৯১)

সোহিনী বাহার—একতালা

ছি ছি মন-ভ্রমরা দিলি বাজী।
কালী-পাদ-পদ্ম-সুধা ত্যজে
বিষয়-বিষে হলি রাজি ॥
দেশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ,
লোকে তোমায় কয় রাজাজি।
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি, রাজা বট রিতি পাজি,
অহঙ্কার মদে মত্ত, বেড়াও যেন কাজীর তাজী।

তুমি ঠেক্‌বে যখন, শিখবে তখন,
করবে কালে পাপোস বাজী ।।
বাল্য যুবা বৃদ্ধ দশা, ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি ।।
পড়ে চোরের কোটায়, মন টুটায়,
যে ভজে সে মত্ত গাঁজি ।।
কুতুহলে প্রসাদ বলে, জরা এলো আসবে হাজি
যখন দণ্ডপাণি লবে টানি কি করিবে ও বাবাজী

(৯২)

ভাব কি ! ভেবে পরান গেল ।
যার নামে হয়ে কাল, পদে মহাকাল.
তার কেন কাল রূপ হল ।।
কাল বড় অনেক আছে
এ বড় আশ্চর্য্য কালো ।
যারে হৃদয় মাঝে রাখলে,
হৃদয় পদ্ম করে আলো ।।
রূপে কালী নামে কালী,
কাল হইতে অধিক কালো ।।
ওরূপ যে দেখেছে সেই মজেছে,
অন্যরূপ লাগে না ভালো ।।
প্রসাদ বলে কুতুহলে,
এমন মেয়ে কোথায় ছিল ।
না দেখে নাম শুনে কানে,
মন গিয়া তায় লিপ্ত হলো

(৯৩)

ইমন—একতালা

কাজ কি আমার কাশী ।
যাঁর কৃত কাশী, তত্বরসি বিগলিত কেশী ।।
যেই জগদম্বার কুণ্ডল পড়েছিল খসি ।
সেই হতে মণিকাণ বলে তারে ঘোষি ।।

অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী।
মায়ের করুণা বরুণা ধারা, অসিধারা অসি ॥
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্ব মসি।
ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশ মহিষী ॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল ত না বাসি
ঐ যে গলাতে বেঁধেছে আমার
কালী নামের ফাঁসি ॥

(৯৪)

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুঁড়ি।
(ভব সংসার বাজারের মাঝে)
ঐযে, মন ঘুঁড়ি, আশা বায়ু,
বাঁধা তাহে মায়া দড়ি ॥
কাক গণ্ডী মাণ্ড গাঁথা তাতে পঞ্জরাদি নাড়ি।
ঘুঁড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি
বিষয়ে মেজেছে মাজা, কর্কশা হয়েছে দড়ি
ঘুঁড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে,
হেসে দাও মা হাত চাপড়ি ॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে, ঘুঁড়ি যাবে উড়ি
ভব সংসার-সমুদ্র পারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি।

(৯৫)

সেকি শুধু শিবের সতী।
যাবে কালের কাল করে প্রণতি ॥
ষটচক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি।
সে যে সর্ব্বদলের দলপতি,
সহস্র দলে করে স্থিতি ॥
নেংটাবেশে শত্রুনাশে, মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি ॥
ওরে বল দেখি মন; সে বা কেমন,
নাথের বুকে মারে লাথি।
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা,

সকলি জানি ডাকাতি ॥
ওরে সাবধানে মন কর যতন,
হবে তোমার শুদ্ধ মতি ॥

(৯৬)

ইমন—একতালা

এই দেখ সব মাগীর খেলা
মাগীর আপ্তভাবে গুপ্ত লীলা।
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ,
ডেলা দিয়া ভাঙ্গে ডেলা।
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি
নারাজ হয় সে কাজের বেলা ॥
প্রসাদ বলে থাক বসে, ভবার্ণবে ভাসায় ভে
যখন জোয়ার আসবে, উজায়ে যাবে,
ভাটিয়া যাবে ভাটার বেলা ॥

(৯৭)

জংলা—একতালা।

জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে।
ভবে আমার কি হবে গো মা ॥
অগম্য জলেতে মিনের শ্রয়,
জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময়।
ও সে যখন যারে মনে করে,
তখন তারে ধরে কেশে ॥
পালাবার পথ নাই কো জালে,
পালাবি কি মন ঘেরেছে কালে।
রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক,
শমন দমন করবে এসে ॥

(৯৮)

জংলা—একতালা

মন জান নাকি ঘটবে লেটা।
যখন ঊর্দ্ধ-বায়ু রুদ্ধ করে,

পথে তোমার দিবে কাঁটা ॥
আমি দিন থাকতে উপায় বলি,
দিনের সুদিন যেটা।
ওরে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে,
মনে মনে হওরে আঁটা ॥
পিঞ্জরে পুষেছ পাখী, আটক করবে কেটা।
ওরে জান না যে তার ভিতরে,
তুয়ার রয়েছে নটা ॥
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী, ধিঙ্গি ধিঙ্গি ছটা।
তারা যা বলিছে, তাই করিছ,
এমনি বুকের পাটা ॥
প্রসাদ বলে মন জান তো, মনে মনে যেটা।
আমি চাত্তরে কি ভেঙ্গে হাড়ী, বুঝাইব সেটা ॥

(৯৯)

জংলা—একতালা

আমি ঐ খেদে খেদ করি।
ঐ যে তুমি মা থাকতে আমার,
জাগা ঘরে হয় চুরি ॥
মনে করি তোমার নাম করি,
আবার সময়ে পাশরি।
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয়,
জেনেছি তোমার চাতুরি ॥
কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না, খেলে না,
সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে,
দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি ॥
যশঃ অপযশঃ সুরস কুরস সকল রস তোমারি।
ওগো রসে থেকে রস ভঙ্গ, কেন কর রাসেশ্বরী ॥

প্রসাদ বলে মন দিয়াছ, মনেরি আখঠারি ।
ওমা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া
মিষ্টি বলে ঘুরে মলি ॥

(১০০)

ঝংলা একতালা

মনরে ভাল বাস তাঁরে ।
যে ভবসিন্ধু পারে তারে
এই কর ধার্য্য কিবা কার্য্য অসার পসারে ॥
ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্ব্ব কথা,
তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা, যাবে কোথাকারে ।
সংসারে কেবল কাজ, হুকুমে নাচায় নাচ,
মায়াবিনী কোলে আছ পড়ে কারাগারে ॥
অহঙ্কার দ্বেষরাগ, অনুকূলে অনুরাগ,
দেহরাজ্যে দিলে ভাগ, বল কি বিচারে ॥
যা করেছ চারা কিবা, প্রায় অবসান দিবা ।
মণি দ্বীপে ভাব শিবা, সদা শিবাগারে ॥
প্রসাদ বলে দুর্গানাম, সুধাময় মোক্ষধাম,
জপ কর অবিরাম, সুধাও রসনারে ॥

(১০১)

শমন আসার পথ ঘুচেছে ।
আমার মনের সন্ধ দূরে গেছে ॥
ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে,
চারি শিব চৌকি রয়েছে ॥
এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে,
তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে ॥
সহস্রদল কমলে শ্রীনাথ,
অভয় দিয়ে বসে আছে ॥
দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা,
চৌকিদারী ভার লয়েছে ।
সে শক্তির জোরে চেতন করে

তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে।
মূলাধারে সাধিষ্ঠানে, কর্ণমূলে ভুরুমাঝে।
এ চারিস্থানে চারি শিব, নবদ্বারে চৌকি আছে
রামপ্রসাদ বলে এই ঘরে,
চন্দ্র সূর্য্য উদয় আছে।
ওরে তমোনাশ করি তারা
হৃদ মন্দিরে বিরাজিছে॥

(১০২)

জংলা একতালা

আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে।
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদ-পদ্ম,
বাঁধা আছে হরের কাছে॥
ও চরণ উদ্ধারের মা,
আর কি কোন উপায় আছে॥
এখন প্রাণপণে খালাস কর,
ঠাটে বা ডুবায় পাছে।
যদি বল অমূল্যপদ, মূল্য আবার কি তার আছে
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব বাঁধা রাখিয়াছে॥
বাপের ধনে বেটার স্বত্ব,
কাহার বা কোথা ঘুচেছে।
রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র বলে,
আমায় নিরংশী করেছে॥

(১০৩)

ললিত—বিভাগ—আড়খেমটা।

কালীর নামের গণ্ডী দিয়ে আছি দাঁড়াইয়া।
শোনরে শমন তোরে কই, আমি ত আটাশে নই,
তোর কথা কেন রব সয়ে।
ছেলের হাতের মোওয়া নয় যে,
খাবে ছলকো দিয়ে॥

কটু বলবি, সাজাই পাবি, মাকে দিব কয়ে।
সে যে কৃতান্ত দলনী শ্যামা, বড় ক্ষ্যাপা মেয়ে॥
শ্রীরামপ্রসাদে যেন, কয় শ্যামাগুণ গেয়ে।
আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাব, চক্ষে ধূলা দিয়ে॥

(১০৪)

জংলা একতালা

আমার অন্তরে আনন্দময়ী
সদা করিতেছেন কেলি॥
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি,
নামটী কভু নাহি ভুলি।
আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি,
অন্তরেতে মুণ্ডমালী॥
বিষয়-বুদ্ধি হইল হত,
আমার পাগল বোল বলে সকলি।
আমায় যা বলে তা বলুক তারা,
অন্তে যেন পাই পাগলী॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মা বিরাজে শতদলে,
আমি শরণ নিলাম চরণ তলে,
অন্তে না ফেলিও ঠেলি॥

(১০৫)

কাজ কি মা সামান্য ধনে।
ও কে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে॥
সামান্য ধন দিলে তারা,
পড়ে রবে ঘরের কোনে।
যদি দাও মা আমায় অভয় চরণ।
রাখি হৃদি পদ্মাসনে॥
গুরু আমায় কৃপা করে মা,
যে ধন দিলে কানে কানে।

এমন গুরু আরাধিত মন্ত্র,
তাও হারালেম সাধন বিনে ॥
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা,
হবে তোমা নিজ গুণে ॥
আমি অন্তিম কালে জয় দুর্গা বলে,
স্থান পাই যেন ঐ চরণে

(১০৬)

জংলা—একতালা

মায়ের এমনি বিচার বটে।
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে,
তারি কপালে বিপদ ঘটে ॥
হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা,
দাঁড়ায়ে আছি করপুটে।
কবে আদালত শুনানি হবে মা,
নিস্তার পাব এ সঙ্কটে ॥
সওয়াল জবাব করব কি মা,
বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ওমা ভরসা কেবল শিব বাক্য,
ঐক্য বেদাগমে রটে ॥
প্রসাদ বলে শমন ভয় মা,
ইচ্ছে হয় যে পালাই ছুটে।
যেন অন্তিম কালে দুর্গা বলে,
প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে।

(১০৭)

দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে।
বড় নিশ্চিন্ত রয়েছ,
তোমার পতিত তনয় ডুবল ভবে ॥
এ ঘাটে তরণী নাইকো,
কিসে পার হব মা ভবে,

মা তোর দুর্গা নামে কলঙ্ক রবে মা,
নইলে খালাস কর তবে ॥
ডাকি পুনঃ পুনঃ শুনিয়া না শুন,
পিতৃ ধর্ম্ম রাখলে ভবে।
অতি প্রাতঃকালে জয়দুর্গা বলে,
স্মরণ নিবার কাজ কি তবে।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা,
মোহক্ষতি কিছু না হবে।
মা তোর কাশী মোক্ষ ধাম অন্নপূর্ণা নাম,
জগজ্জনে নাম নাহি লবে ॥

(১০৮)

জংলা একতালা

আমি নই পলাতক আসামী।
ওমা কি ভয় আমায় দেখাও তুমি।
বাজে জমা পাওনি যে মা,
ছাটে জমি আছে কমি।
আমি মহামন্ত্র মোহর করা
কবচ রাখি শালতমামি ॥
আমি মায়ের খাসে আছি বসে,
আসল বসে সারে জমি।
প্রসাদ বলে খাজনা বাকী,
নাইকো রাখি কড়া কমি।
যদি ডুবাও দুঃখ সিন্ধু মাঝে,
ডুবেও পদে হব আমি ॥

(১০৯)

এ-সংসারে ডরি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর, খাস-তালুকে বসত করি
নাইকো জরিপ জমাবন্দি,
তালুক হয় না লাটে বন্দি মা।
শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী।

নাইকো কিছু অন্য লেঠা,
দিতে হয় না মাথট বাটা মা,
জয়দুর্গার নামে জমা আঁটা,
এটা করি মলগুজারি।
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ মা,
আমি ভক্তির জোরে কিন্‌তে পারি
ব্রহ্মময়ীর জমিদারী ॥

(১১০)

খাম্বাজ আদ্ধা।

কালী তারার নাম জপ মুখেরে।
যে নামে শমন ভয় যাবে দূরেরে ॥
যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী, হইল শ্মশানবাসী।
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে, নাহি পায় ভাবিয়া রে ॥
ডুবু ডুবু হইল ভরা লোকে বলে ডুবেরে!
তবু ভুলাইতে পার যদি, ভোলানাথের মনরে।
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
দ্বিজ* রামপ্রসাদের নাতি,
চরণ তলে রেখরে ॥

(১১১)

মুক্ত কর মা মুক্ত কেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবা-নিশি ॥
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা,
ভুলেছ কি রাজমহিষী,
তারা কতদিন কাটবে আমার,
এ দুরন্ত কালের ফাঁসি ॥
প্রসাদ বলে কি ফল হবে,
হই যদি গো কাশীবাসী।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধরে,
পিতা হলেন শ্মশানবাসী ॥

* রামপ্রসাদের কোন কোন গানে 'দ্বিজ' ভণিতা দেখিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন, ঐ সকল গান অপর কোনও ব্রাহ্মণ রামপ্রসাদের রচিত। কিন্তু

(১১২)

খাম্বাজ আড়া—

মন তোরে তাই বলি বলি।
এবার ভাল খেল খেলায়ে গেলি ॥
প্রাণ বলে প্রাণের ভাই,
মন যে তুই আমার ছিলি।
ওরে ভাই হয়ে ভুলায়ে ভাইয়ে,
শমনেরে সঁপে দিলি ॥
গুরুদত্ত মহাসুধা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি
ওরে খাওয়াইলি কেবলমাত্র,
কতকগুলো গালাগালি ॥
যেম্নি গেলি তেম্নি গেলাম,
করে দিলি মিজাজ আলি।
এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে,
আমি নই বাগানের মালী ॥
প্রসাদ বলে মন ভেবেছ,
দেবে আমায় জলাঞ্জলি।
ওরে জান না কি হৃদে গেঁথে
রেখেছি দক্ষিণা কালী ॥

(১১৩)

তাই কালরূপ ভালবাসি।
জগন্মোহিনী মা এলোকেশী ॥
কালোর গুণ ভাল জানে, শুক শম্ভু দেবঋষি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব,
কালরূপ তাঁর হৃদয়বাসী ॥
কাল বরণ ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী,
বাঁশী ত্যজে করে অসি ॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সকল একবয়সী

বৈদ্যগণও 'দ্বিজ' অথ্যায় আপনাদিগকে অভিহিত করিয়া থাকেন, এ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

ঐ যে তার মধ্যে কেশে মা মোর,
বিরাজে পূর্ণিমায় শশী ॥
প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে, কালরূপে মেশামেশি।
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক,
মন কোরোনা দ্বেষা-দ্বেষী ॥

(১১৪)

খাম্বাজ আদ্ধা

এবার ভাল ভাব পেয়েছি।
কালীর অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি।
ভবের কাছে পেয়ে ভাব,
ভাবীকে ভাল ভুলায়েছি।
তাই রাগ দ্বেষ লোভ ত্যজে
সত্ত্বগুণে মন দিয়েছি
তারা নাম সারাৎসার আত্মশিক্ষায় বাঁধিয়াছি
সদা দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে,
দুর্গা নামের কাজ ক'রেছি ॥
প্রসাদ বলে যেতে হবে, এ কথা নিশ্চিত জেনেছি
লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল,
যাত্রা করে বসে আছি ॥

(১১৫)

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ তবে কাল বিছানা ॥
এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না।
তোমার কোলেতে কামনা কান্ত,
তারে ছেড়ে পাশ ফের না ॥
আশার চাদর দিয়াছ গায়,
মুখ ঢেকে তাই মুখ খোল না।
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে,
রজক ঘরে তায় কাচাও না ॥
খেয়েছ বিষয়-মদ সে মদের কি ঘোর ঘোচে না
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে,

ভ্রমেও কালী বল না ॥
অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই, ঘুমায়ে আশা পুরে না।
তোর ঘুমে মহা ঘুম আসিবে,
ডাকিলে আর চেতন পাবে না ॥

(১১৬)

খাম্বাজ আদ্ধা

শমন হে আছি দাঁড়ায়ে।
আমি কালী নামের গণ্ডী দিয়ে ॥
কালোপরে কালীপদ, সে পদ হৃদে ভাবিয়ে
কালোপর মায়ের অভয়চরণ, যে করে স্মরণ,
কি করে তার মরণ ভরে ॥

(১১৭)

মা বিরাজে ঘরে ঘরে
এ কথা ভাঙ্গিব কি হাঁড়ি চাতরে ॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে কুমারীরে
যেমন অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে
জানকী তার সমিভ্যারে ॥
জননী, তনয়া, জায়া, সহোদরা কি অপরে,
রামপ্রসাদ বলে, বলব কি আর
বুঝে লও গো ঠারেঠোরে ॥

(১১৮)

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

তিলেক ছাড়া ওরে শমন,
বদন ভরে মাকে ডাকিরে।
আমার বিপদ কালে ব্রহ্মময়ী,
আসেন কিনা আসেন দেখিরে ॥
লয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার এত ভাবনা কিরে।
তবে তারা-নামের কবচ মালা,
বৃথা আমি গলায় রাখিরে
মহেশ্বরী আমার রাজা,

আমি খাস তালুকের প্রজা
আমি কখন নাতান, কখন সাতান,
কখন বাকীর দায়ে না ঠেকিরে ॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা,
অন্যে কি জানিতে পারে।
যার ত্রিলোচন না পেল তত্ত্ব,
আমি অন্ত পাব কিরে।

(১১৯)

মিশ্র খাম্বাজ—একতাল৷

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা,
যেম্নি নাচাও তেম্নি নাচে ॥
তুমি কর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম মর্ম্মকথা বুঝা গেছে।
ওমা, তুমি ক্ষিতি তুমি জল,
ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে ॥
তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি,
তুমিই মুক্তি, শিব বলেছে।
ওমা, তুমি দুঃখ তুমিই সুখ,
চণ্ডীতে তা লেখা আছে ॥
প্রসাদ বলে, কর্ম্ম সূত্র,
সে সুতায় কাটনা কেটেছে।
ওমা, মায়াসূত্রে বেঁধে জীব,
ক্ষেপা ক্ষেপি, খেল খেলিছে ॥

(১২০)

মা আমার খেলান হলো।
খেলা হোলো গো আনন্দময়ী
ভবে এলাম কত্তে খেলা, করিলাম ধুলা খেলা
এখন কালো পেয়ে পাষাণের বালা,
কাল যে নিকটে এলো ॥
বাল্যকালে কত খেলা,
মিছে খেলায় দিন গোঁয়ালো।

পরে আমার সঙ্গে লীলা খেলায়,
অজপা ফুরায়ে গেল ।।
প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে, অশক্তি কি করি বল ।
ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়া,
মুক্তি জল টেনে ফেল ।।

(১২১)

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

আর তোমায় ডাকব না কালী ।
তুই মেয়ে হয়ে অসি ধরে,
লেংটা হয়ে রণ করিলি ।।
দিয়াছিলে একটা বৃত্তি,
তাও তো দিয়ে হরে নিলি ।
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে,
মা হয়ে তার মাথা খেলি ।।
দীন রামপ্রসাদ বলে মা,
এবার কালী কি করিলি ।
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা,
লাভে মূলে ডুবাইলি ।।

(১২২)

সামাল ভবে ডুবে তরী ।
তরী ডুবে যায় জনমের মত ॥
জীর্ণ-তরী তুফান ভারি, বাইতে নারি ভয়ে মরি
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু,
এবার এরাই কচ্ছে দাগাদারি ॥
এনেছিলে, বসে খেলে মন,
মহাজনের মূল খোয়ালি ।
যখন হিসাব করে দিতে হবে মন,
তখন তহবিল হবে তারি
দীন রামপ্রসাদ বলে মন, নীরে বুঝি ডুবায় তরী
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর,
আপন ঘরে যায় যে চুরি ।।

(১২৩)

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

ওমা তোর মায়া কে বুঝতে পারে।
তুমি ক্ষেপা মেয়ে, মায়া দিয়ে,
রেখেছ সব পাগল করে।
মায়া-ভরে এ সংসারে, কেহ কারে চিন্তে নারে
ঐ যে এমনি কালীর কোপ আছে যে,
যেম্নি দেখে তেম্নি করে॥
পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা,
কে তার ঠিক ঠিকানা করে।
রামপ্রসাদ বলে, যায় গো জ্বালা,
যদি অনুগ্রহ করে॥

(১২৪)

জংলা—খয়রা

আমি কি এমতি রব (মা তারা)।
আমার কি হবে গো দীন দয়াময়ী॥
আমি ক্রিয়াহীন, ভজন বিহীন,
দীন হীন অসম্ভব।
আমার অসম্ভব আশা পুরাবে কি তুমি!
আমি কি ও পদ পাব (মা তারা)।
সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই, চরণে বিদিত সব।
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে,
এ কথা কাহারে কব? (মা তারা)।
প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া,
নাম কি আছে যে আর তা লব।
তুমি তারাইতে পার তেই সে তারিণী,
নামটী রেখেছেন ভব (মা তারা)॥

(১২৫)

ঝিঁঝিট—একতালা

দিবানিশি ভাবরে মন, অন্তরে করাল বদনা।
নীল কাদম্বিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগ্বসনা॥

মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে মন জান না।
সদা পদ্মবনে, হংসীরূপে, আনন্দ রসে মগনা॥
আনন্দে আনন্দময়ী, হৃদয়ে কর স্থাপনা॥
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন, ব্রহ্মময়ী রূপ দেখ না॥
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা
পুরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হ'বে, নির্ব্বাণে কি গুণ বল না॥

(১২৬)

মন যদি মোর ঔষধ খাবা।
আছে শ্রীনাথ দত্ত, পটল সত্ত,
মধ্যে মধ্যে ঐটি চাবা॥
সৌভাগ্য করবে দূরে, মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা।
রামপ্রসাদ বলে তবেই সে মন,
ভব রোগে মুক্ত হবা॥

(১২৭)

জংলা—একতালা

সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে।
যার নাম জপিয়া মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে, কটাক্ষে হেরিয়ে,
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে, উদরে পুরিয়ে॥
যে চরণে শরণ লয়ে, দেবতা বাঁচে দায়ে,
দেবের দেব মহাদেব যাঁহার চরণে লুটায়ে
প্রসাদ বলে, রণে চলে, রণময়ী হয়ে।
শুম্ভ নিশুম্ভকে ব'ধে হুঙ্কার ছাড়িয়ে॥

(১২৮)

জংলা—একতালা

মন হারালি কাজের গোড়া।
তুমি দিবা নিশি ভাবছ বসি',
কোথায় পাব টাকার তোড়া॥
চৌকি কেবল ফাঁকি মাত্র,
শ্যামা মা মোর মোহর ঘড়া।

তুই কাঁচমূল্যে কাঞ্চন বিকালি,
ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া ॥
কর্ম্ম সূত্রে যা আছে মন,
কেবা পারে তার বাড়া।
মিছে এ-দেশ সে দেশ করে বেড়াও,
বিধির লিপি কপাল জোড়া ॥
কাল করিছে হৃদয়ে বাস,
বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া।
ওরে সেই কালের কর বিনাশ,
ন্যাস ধরবে মন্ত্র সোঁটা ॥
প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন,
পাঁচ সওয়ারীর তুমি ঘোড়া।
সেই পাঁচের কাছে পাঁচা পাঁচি,
তোমায় করবে তোলা-পাড়া ॥

(১২৯)

গারা ভৈরবী—যৎ।

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়,
মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে,
কর্ত্তা বলে সবাই বলে ॥
আবার সে কর্ত্তারে দিবে ফেলে
কালা কালের কর্ত্তা এলে।
যার জন্য মর ভেবে, সে কি সঙ্গে যা'বে চ'লে।
সেই প্রেয়সী দিবে গোবর ছড়া,
অমঙ্গল হ'বে বলে।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, শমন যখন ধরবে চুলে।
তখন ডাকবি কালী কালী বলে,
কি করিতে পারবে কালে ॥

(১৩০)

গারা ভৈরবী—যৎ।

কালি গো কেন লেংটা ফির।

ছি ছি কিছু লজ্জা নাই তোমার ॥
বসন ভূষণ নাই তোমার মা,
রাজার মেয়ে গৌরব কর।
মাগো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম,
পতির উপর চরণ ধর ॥
আপনি লেংটা, পতি লেংটা
শ্মশানে মশানে চর।
মাগো আমরা সবে মরি লাজে,
এবার মেয়ে বসন পর ॥

(১৩১)

সিন্ধুকাফী—একতালা।

আপন মন মগ্ন হলে মা,
পরের কথায় কি হয় তারে ॥
পরের কথায় গাছে চড়ে,
আপন দোষে পড়ে মরে।
পরের জামিন হলে পরে,
সে না দিলে আপনে ভরে ॥
যখন দিনে নিরাই করে,
শিকারী সব রয় না ঘরে ॥
জাঠা বর্শা লয়ে করে, নাওনা পেলে চলে তরে
চাষা লোকে কৃষি করে, পঙ্ক জলে পচে মরে।
যদি সে নিরাইতে পারে, অঝরে কাঞ্চন ঝরে ॥

(১৩২)

খাম্বাজ—একতালা

যদি ডুবল না ডুবায়ে বা ওরে মন নেয়ে।
মন হালি ছেড় না ভরসা-বাঁধ পারবি যেতে বেয়ে
মন চক্ষু দাঁড়ি, বিষম হাড়ি, মজায় মজে চেয়ে।
ভাল ফাঁদ পেতেছ শ্যামা, বাজিকরের মেয়ে
মন শ্রদ্ধা বায়ে ভক্তি-বাদাম দেওরে উড়াইয়ে।
রামপ্রসাদ বলে, কালী নামের
যাওরে সারি গেয়ে

(১৩৩)*

মূলতান—একতালা।

মন আমার যেতে চায় গো আনন্দ কাননে।
বট মনোময়ী সান্ত্বনা কেন, করনা এই মনে
শিবকৃত বারাণসী, সেই শিব পদবাসী,
তবু মন ধায় কাশী, রব কেমনে।
অন্নপূর্ণা রূপ ধর, পঞ্চক্রোশী পদে কর,
নখজলে গঙ্গা, মণিকর্ণিকার সনে॥
দ্বিপদে অলক্ত-আভা, অসি বরুণার শোভা
হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে।
প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শান্ত কর। উপযুক্ত,
কিবা কাজ অভিযুক্ত পরী গমনে॥

(১৩৪)

মূলতান—একতালা

জননী পদ পঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে,
কৃপা বলো কনে তারিণী
তপন তনয় ভয়চয়-বারিণী
প্রণব রূপিণী সারা, কৃপানাথ দারা তারা,
ভব পারাবার-তরণী।
সগুণা নির্গুণা স্থূলা, সূক্ষ্ম মূলা, হীন মূলা,
মূলাধার অমলক মল বাসিনী।
আগম নিগমাতীতা, খিল মাতা, খিল পিতা,
পুরুষ প্রকৃতি রূপিণী।
হংসরূপে সর্ব্বভূতে, বিহরসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি-প্রলয়-স্থিতি, ত্রিধাকারিণী
সুধাময় দুর্গানাম, কেবল কৈবল্যধাম,
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী।

*মনে হয় রামপ্রসাদের নামে অন্য কোন কবির এই গান প্রচলিত

তাপ জ্বরে সদা জ্বলে, হলাহল দুঃখে মলে,
ভণে রামপ্রসাদ, তার বিষফল জানি ॥

(১৭৫)

মূলতানী—ধানেশ্রী—একতালা।

করুণাময়ি কে বলে তোরে দয়াময়ী,
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা (গো তারা,)
আমার এমি দশা, শাকে অন্ন মেলে কই।
কারে দিলে ধনজন মা, হস্তী অশ্ব রথচয়,
ওগো, তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেহ নই ॥
কেহ থাকে অট্টালিকায়,
মনে করি তেমনি হই।
মাগো আমি কি তোর পাকা ক্ষেতে দিয়েছিলেম মই ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
আমার কপাল বুঝি অমিতেই।
ওমা, আমার দশা দেখে বুঝি
শ্যামা হলে পাষাণময়ী ॥

(১৭৬)

হয়েছি মা জেব ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা ॥
ঐ যে মন করেছি জমিনদারী
নেচে উঠে ছটা বাদী ॥
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হই তো,
পুর হতে দূর করে দি ॥
বিমাতা মরেন শোকে, ছয়টার যদি আমল না দি
সুখে নিত্যানন্দ পুরে থাকি,
পার হয়ে যাই ভবনদী ॥
হুজুরে ভজবিজ কর মা, হাজির ফরিয়াদী বাদী।
এই স্বোপার্জ্জিত ভজনের ধন,
সাধারণ নয় যে তা দি ॥

মাতা আদ্যা, মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
ওমা, তোমার পুতে সঙ্গীন সুতে,
জোর করে কার কাছে কাঁদি॥
প্রসাদ ভণে, ভরসা মনে,
বাপ তো নহেন মিথ্যাবাদী।
ঠেকি বারে বারে খুব চেতেছি,
আর কি এবার ফাঁদে পা দি॥

রঘুনাথ দাস

বাংলার সর্বপ্রধান কবি-গীত রচয়িতা প্রসিদ্ধ হরুঠাকুরের ওস্তাদ রঘুনাথদাস। ওস্তাদ রঘুনাথ দাসের সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য এবং তাহার বংশপরিচয় এখন অতি অল্পই জানিতে পারা যায়। এই স্বভাবকবি জাতিতে কর্মকার ছিলেন। সম্ভবতঃ কলিকাতা বা কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন উপশহরে তাঁহার নিবাস ছিল। হরুঠাকুরের প্রথম দিককার রচিত গীতগুলি রঘুনাথ সংশোধন করিয়া দিতেন। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ হরুঠাকুরও সেই সকল গানের ভণিতায় ওস্তাদ রঘুনাথেরই নাম প্রচার করিয়া শিষ্যের উপযুক্ত কার্য্যই করিয়া গিয়াছেন। "দাড়া কবি" বাংলার একটি বিশিষ্ট গীতি পর্য্যায়। অনেকের মতে রঘুনাথ দাস দাড়া কবির" সৃষ্টিকর্তা। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায় না, তবে হরুঠাকুরের পূর্বে তাঁহার জন্ম এবং সেই সময়ই ধরিয়া লইতে হইবে। তাঁহার রচিত কতকগুলি গীত এই সঙ্গে সন্নিবেশিত হইল।

এমন পিরীতি প্রাণ, জানিলে কি করে।
সুখ-আশে ভাসে সদা, দুখের সাগরে॥
সতত চাতুরী করি, জ্বালাবে আমারে।
তবে কি যতনে প্রাণ সঁপি হে তোমারে॥
বিরহ জ্বালায় মন করি ত্যজিবারে।
ছাড়িলে না ছাড়া যায়, কি হল আমারে॥

ভৈরব—জলদ তেতালা।

নয়ন কাতর কেন, তাহারে না হেরিলে॥
চতুর্ভুজ হই বুঝি, সে মুখ হেরিলে॥
নয়ন আপন মতে মনেরে আনিলে,
বিনা দরশনে দুঃখ যায় কি করিলে॥

কেমন নয়ন মোর না ভুলে ভুলালে।
কহে আর সুখ কিবা, সে নিধি নহিলে।

ভৈরবী জলদ—তেতালা

কেন পিরীতি করিলাম, মজিলাম হায়।
পিরীতি করিয়া সখী, একি হলো দায়,
কহিতে সে সব দুখ, প্রাণ বাহিরায়।
মনে করি না ভুলিব তাহার কথায়।
দেখিলে তাহার মুখ দুঃখে হাসি পায়।

ভৈরবী—কাওয়ালী

নয়ন ঘরে দেখরে প্রবল বিরহানল
জলে হুতাশন জলয়ে দ্বিগুণ না হয় শীতল।
ইহার উপায় বিধি, কিবা সেই প্রাণনিধি,
বোধেয়ে হইল।
বাসনা পুরিবে, দুঃখ দূরে যাবে,
নিভিবে অনল।

ভৈরবী জলদ—তেতালা

এই কি করিতে উচিত, অবলা সরলা-সনে (প্রাণ)
দরশন সুখে দুখ করহ কি নিদর্শনে।
এমন করিবে যদি জান মনে মনে।
কপট বিনয়ছলে ভুলাইলে কেনে।
এই হলো যায় প্রাণ, ক্ষতি কি হের নয়নে।

ভৈরবী—কাওয়ালী

মনেতে উদয় যাহা না পারি কহিতে।
হৃদয় নিবাসী তুমি, হয় হে বুঝিতে।
আমার মনের মত, করিতে হয় উচিত,
অধিক কথনো আর, না যায় লাজেতে।

ভৈরবী জলদ—তেতালা

সুজন সহিত প্রেম কি পরমাধিক সুখ,
যে করেছে সে জানে।
চকোরের প্রীত, চাঁদের সহিত,
শশিও তেমতি তারে তোষে সুধা দানে।

শীতল হইবে বলে, পতঙ্গ অনলে জ্বলে,
তাহারে জীবনে।
যার যেবা ভাব, সেইরূপ লাভ,
শঠের স্বভাব ভাল না হয় কখনে॥

ভৈরবী—কাওয়ালী

আমার এ যাতনা কে কবে তারে
না থাকিলে কুলভয়, তবে কি সাধি কারে
তারে পেলে যত সুখী, জানে মোর মন আঁখি
লাজ প্রতিবাদী হয়ে মজালে মোরে॥

রামনিধি গুপ্ত

(নিধুবাবু)

নিধুবাবু বাংলাদেশের টপ্পাসঙ্গীতের প্রবর্তক হিসেবে খ্যাত। বর্গির হাঙ্গামার সময়ে ত্রিবেণীর নিকট চাঁপ্তা গ্রামে মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৪৭ খ্রীঃ পিতা হরিনারায়ণ কবিরাজের সহিত কলিকাতার কুমারটুলি পৈত্রিক নিবাসে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। এইখানেই লেখাপড়ার আরম্ভ। এই সময়ে জনৈক পাদ্রীর নিকটে তিনি ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন।

নিধুবাবু কোম্পানীর চাকুরী লইয়া ছিরণ ছাপরায় যান। (১৭৭৬ খ্রীঃ) সেখানে এক মুসলমান গায়কের নিকট হিন্দুস্থানী টপ্পা শিক্ষা করেন। ১৭৯৪ খ্রীঃ কলিকাতায় ফিরিয়া বাংলা রচনায় এবং সঙ্গীত শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হন। আখড়াই গান সংশোধন করিয়া তিনি নূতন পদ্ধতিতে সঙ্গীত শিখাইতেন।

বাংলা কাব্য ও সঙ্গীতের ইতিহাসে নিধুবাবুর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি এদেশের প্রথম ইংরেজী জানা কবি। তিনিই প্রথম স্বাদেশিক সঙ্গীতের রচয়িতা। তাঁহার রচিত টপ্পাতেই লৌকিক প্রণয়ের সুর প্রথম ধ্বনিত হইয়াছে। 'গীতিরত্ন' নামক সংকলন গ্রন্থটি নিধুবাবুর জীবদ্দশায় ১২৪৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত কয়েকটি গীত নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

ভৈরবী জলদ—তেতালা

মনে বুঝি প্রাণ পড়েছে মোরে।
তেঁই সে এসেছ নাথ, এতদিন পরে॥
পিরীতি করিয়ে প্রাণ, কে কোথা এসে পুন,
ভুলিয়ে এসেছ বুঝি, মন রাখিবারে॥

কালাংড়া—আড়া।

সরস বদন তব কমল নয়ন।
মন ষট্‌পদ মম অচঙ্গ চরণ ।।
রতন যতন কর, মম ধন অতঃপর
অপদ অবল হয় অযতন ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা

ও কেরে, লুকায়ে মোরে,
যাইছে দ্রুতগমনে।
মন নয়ন প্রহরী, তুমি তার কাছে চুরি,
করিবে বল কেমনে ॥
আশা সহ মোর মন, রক্ষক তব কারণ,
অন্য ভাব কেনে।
যেখানে থাক যখন, আমি সেখানে তখন,
বুঝে দেখ মনে মনে ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

চল যাইলো সখী যেখানে মন হরণ।
চিত না ধৈরয ধরে নয়ন রোদন করে,
কাতর অতি পরান ॥
লোকের গঞ্জনা ভয়, করিলে কি প্রাণ রয়,
বুঝনা এখন।
অতএব ত্বরান্বিত, হইতে হয় উচিত,
বিলম্বের নাহি গুণ ॥

কালাংড়া—আড়া।

অনেক যতনে তোমারে পেয়েছি
বিরহ অনলে আমি সদা জ্বলেছি ॥
জনরব বিষধর, খাইয়াছি নিরন্তর,
মিলন অমিয় পানে, এবে বেঁচে আছি ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

সেই সে পীড়িতপ্রাণ, পারে লো রাখিতে।

দুখে সুখ অনুভব, যাহার মনেতে ॥
প্রেম করা নাহি দায়, রাখিতে কঠিন হয়,
মান-অপমান-ভয়, নাহি যার চিতে ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

অলাভ জানিলে কেহ, কারে সঁপে প্রাণ।
অতি সুখ হবে বোধ তাহার তখন ॥
কত জন গঞ্জন, করে দেখ রাত্রি দিন।
সে কথা শ্রবণে, না শুনে কখন ॥
সুজনে সুজনে সুখ, কুজনে কুজনে দুখ,*
মন মত বিনাচিত, সদা জ্বালাতন ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

গুণের সাগর হে তুমি গুণনিধি
তোমার যতেক গুণ, কহিতে আমি নির্গুণ,
জানে কি বিধি ॥
কি কব তোমার গুণ, যে গুণে মোহিত-মন,
মোর নিরবধি।
তব গুণে যত সুখ, কুলের কপালে ধিক্,
করেছে বিধি ॥

পরজ—কালাংড়া ঢিমে-তেতালা।

এলে প্রাণ এলে এলে,
হে মম গৃহে অনুগ্রহ করিয়ে।
শীতল হইলাম আমি, বিরহে জ্বলিয়ে ॥
কত সুখ উপজিল তোমারে হেরিয়ে ॥
বুঝাতে না পারি তাহা, কথায় কহিয়ে ॥

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ-আড়ঠেকা।

মদন বিহীন রতি, নিশি-হীন নিশাপতি,
রবি কুমুদিনী, শশী কমলিনী, কি সুখ ইহাতে।

পাঠান্তরে "সুজনে কুজনে দুঃখ"

যে আমার মনবাসী, মন মোর তার হাতেতে।
যেমন দর্পণ, হাতেতে আপন,
দেখিলে আপনি তাতে ॥

কালাংড়া—আড়া

তিমির কি থাকে ওলো, শশীর কিরণে।
উৎপত্তি যা অদর্শনে, নাশ দরশনে ॥
মুদিত কমল যদি, হেরলো অরুণে।
প্রফুল্ল হয় তখনি, বুঝলো মননে ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা

মৃদু মৃদু হাসি প্রাণ, মনের তিমির নাশে।
এরূপ দেখিয়ে হৃদি, কমল প্রকাশে ॥
পাছে তব রোষ হয়, সদা মোর এই ভয়,
প্রাণ কি কখন সুখী, তোমার বিরসে ॥

পরজ কালাংড়া জলদ তেতালা

কহিতে তাহার কথা, উপজে সুখ অপার।
তখন অন্য-ভাবনা, থাকে না আমার ॥
কহিবারে তার গুণ, এক মন হয় মন,
রসনা অবশ নহে, কহি যত বার ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়া ঠেকা

ভাবিতে ছিলাম যারে, সেই আসি প্রকাশিল।
দুখানল হতে মন, সুখেতে ডুবিল ॥
বিচ্ছেদ-বিষ-জ্বালায়, অস্থির ছিলাম তায়,
হেরিয়ে তাহার মুখ, সে যাতনা গেল ॥

বিভাষ—তৈতালা

মান অপমান জ্ঞান, নাহি করি কদাচন,
করিলে দেখনা, আপন যাতনা,
তবে কি পারি বাঁচিতে ॥

সুখ দুখ সমভাব, না করিয়ে না করিব,
হইয়ে অধীন, করিল অধীন,
নিধি উভয় মনেতে ॥

কালাংড়া—খাম্বাজ-ঢিমে তেতালা

কিছু তারে বলো না, বলে কি হবে বল।
বিরহ-অনলে মোরে, জ্বলিতে হইল ॥
সে যদি বুঝেছে ইহা, ভাল সে হতে ভাল,
হইবে অনেক সুখ, এই বোধ ছিল ॥
তা না হয়ে দুখ মুখ, দেখ দেখিতে হ ॥

সর্‌ফর্‌দা-কালাংড়া—জলদ তেতালা

অধরে না ধরে ধরে না কহিবারে তব গুণ।
যে গুণে বদ্ধ হইল, এমন চঞ্চল মন।
এক মুখে কি কহিব, হ'লে শতানন।
তথাপি নাহি পারিব, কহিতে আমি কখন ॥

সর্‌ফর্‌দা—আড়া

হে প্রাণনাথ নয়ন-অন্তরে তুমি যাইও না।
প্রবল বিরহানলে জ্বালাইও না ॥
এস হে নয়নে রাখি, পলক মুদিয়ে থাকি,
না দেখ না দেখি কারে, এই বাসনা ॥

সর্‌ফর্‌দা—জলদ তেতালা

কেমনে বল তারে ভুলিতে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে, অতি যতনেতে ॥
ইথে যদি দুখ হয়, হইবে সহিতে।
দিয়ে ফিরে লওয়া এবে, হয় কি মতেতে ॥

সর্‌ফর্‌দা—কালাংড়া-জলদ তেতালা।

আর কি দিব তোমারে, সঁপিয়াছি মন।
মনের অধিক আর, আছে কি রতন ॥

ইহার অধিক আর, থাকে যদি জান।
তাহা দিতে নহি আমি, কাতর কখন ॥

কালাংড়া—তেতালা

অন্তর অন্তরে অন্তর হবে কেন।
ঊর্দ্ধে দিনমণি সলিলে নলিনী ?
মনে মনে একই মন ॥
চক্রবাক চক্রবাকী, নিশিতে বিচ্ছেদ দেখি,
অন্তরে অন্তর দেখ, পীরিতের এইগুণ।

ভৈরবী-জলদ—তেতালা

এত কিরে জানি, হরিয়ে লইবে মন,
হাসিতে হাসিতে (প্রাণ)।
কিছুই নাহিক দোষ, কি বল সে বিধুমুখ,
দেখ দেখিতে দেখিতে ॥
কিবা দিবা বিভাবরী, পাসরিতে নাহি পারি
আঁখি অনিমেষ, পথ হেরিতে হেরিতে ॥

আশা ভৈরবী—জলদ তেতালা

উভয় মিলন সুখ পীরিতি রতন।
একের যতনে দুখ, না যায় কখন ॥
মন মনেতে মিলন, হলে সুখী হয় প্রাণ,
ইহাতে অন্যথা হলে ভাবহ কেমন ॥

আশা ভৈরবী—জলদ তেতালা

যতনে রতন লাভ শুন মনোমোহিনী
অযতনে প্রেমধন কোথা হয় ধনি ॥
যে ভাবে ভুলায়ে মন, হরিয়ে লইলে প্রাণ,
সে ভাবে অভাব লাভ ভাব বিনোদিনী ॥

খট্ জলদ—তেতালা

বিষম হইল সখি, কি করি ইহাতে।
না দেখিলে ঝুরে আঁখি, না হেরে মানেতে ॥

প্রবল মন অনল, নয়ন সাদা সজল,
দ্বিগুণ দহিছে প্রাণ, দোহার রীতিতে ॥

বিভাষ—তেতালা

তুমি মোর প্রাণ ধন মন সকল ওলো,
এই সে কারণে আমি হইলাম রাজেন্দ্র।
নির্ভয় শরীর মোর, উল্লসিত অন্তর,
হৃদয়ে উদয় সদা, প্রেম পূর্ণ-চন্দ্র ।।
জ্বলিয়ে বিরহানলে, এবে মিলন সলিলে,
হয়েছি অস্থির।
রিপুগণ নিজজন, দুই এবে প্রিয়জন,
এমন সময়ে মম, দেখনা কি সুন্দর ॥

বিভাষ কল্যাণ—জলদ তেতালা

মঙ্গলাচরণ কর সখিগণ, আইল মনোরঞ্জন,
গাও ইমন্ কল্যাণ।
নয়ন কমল মোর, আনন্দ-সলিলপুর,
ভুরু আম্র-শাখা তাহে বাখান ।।
কেহ কর অধিবাস, কেহ শঙ্খে স্বরশ্বাস,
হয়ত বিধান।
কেহ বা বরণ কর, কেহ শুভ ধ্বনি কর,
যৌতুক স্বরূপ মোরে দেহ দান ।।

ললিত বিভাষ—জলদ তেতালা

এমন সুখের নিশি কেন পোহাইল।
কহিতে না পারি আমি, কত খেদ উপজিল ।।
নিশির তিমির গুণ, তাহে মন সুখী ছিল।
তমোহন্তি দিবাকর, হেরি মন কালি হলো ।।

শ্যাম-জলদ—তেতালা

মানে কারো সমাদর থাকে কি কখন।
ইথে মনোভার—বল না তোমার হইল কেন।

জলিলে মান আগুন, কেমন করয়ে প্রাণ,
বোধ নাহি থাকে তখন।
তুমি যত সাধ, উপজয়ে ক্রোধ, বোঝ বচন ॥

শ্যাম জলদ—তেতালা

একেবারে কি ভুলিলে প্রাণ, অধীনী জনে।
দেখ দেখি অহর্নিশি, তুমি মোর মনবাসী,
নহিতব মনে ॥
চাক্ষুষ বিহনে দুখ, কহিতে বিদরে বুক,
এই নিবেদন মোর মন হইতে অন্তর,
হয়ো না বেনে ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা

হেরিলে হরিষ চিত, না হেরিলে মরি।
কেমনে এমন জনে রহিব পাসরি ॥
মন তার মনে মিলে, প্রাণ লয়ে সমর্পিলে,
নয়ন তৃষিত সদা দিবা বিভাবরী ॥

কালাংড়া-জলদ—তেতালা

বদন শরদ শশী পাষাণ হৃদয়,
অমিয় সমান ভাষি, মৃদু হাসি তায় ॥
লইয়ে যে কুন্তল ফাঁসি, আঁখি চোর
আছে বসি,
মনের গলেতে দিয়ে প্রাণ হরে লয় ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

মিলনে যতেক সুখ, মননে তা হয় না।
প্রতিনিধি পেয়ে সই, নিধি ত্যজা যায় না ॥
চাতকীর ধারা জল, যাহাতে হয় শীতল,
সেই বারি বিনা আর অন্য বার চায় না ॥

কালাংড়া জলদ—তেতালা

মুকুরে আপন মুখ সতত দেখো না ধনি।

আপনার রূপ, দেখি অপরূপ
অধীনে ভুল কি জানি ॥
দেখ আপনার ধন, সতত দেখে যে জন,
করিতে যে ব্যয়, তার হয় দায়,
সকলের মুখে শুনি ॥

কালাংড়া জলদ—তেতলা ।

মুকুরে আপন মুখ হেরিলে যে হই সুখী ।
নয়নে আমার, বাস হে তোমার,
এই সে কারণ দেখি ॥
আদর্শে দর্শন মুখ, সৌন্দর্য্য হয় অধিক,
রূপের যতন, তোমার কারণ,
জানে হে তোমার আঁখ ॥

কালাংড়া জলদ—তেতালা

মনে মনে মান, করিলে হে প্রাণ, প্রকাশ বদনে ।
হুতাশন আচ্ছাদন হয় কি বসনে ॥
যে যার অন্তরে থাকে, অন্তঃ অন্তরে দেখে
মান কি কখন প্রাণ থাকয়ে গোপনে ॥

কালাংড়া জলদ—তেতালা

হেসে হেসে প্রাণ, করিলে পয়ান,
হানিয়া নয়ানে ।
সেই অবধি মোর মন, গেল কোন খানে ।
আশার ভরসা করি, শূন্য দেহ আছি ধরি,
সচেতন হবে তবে, পুনঃ দরশনে ॥

সরফরদা জলদ—তেতালা

তব অবিশ্বাসে, ঘন ঘন শ্বাসে, দহে সদা মন ।
বিষম হইল মোরে, কিসে বুঝাব তোমারে ।
তুমি মোর প্রাণ ॥
নিঃসন্দেহ করিতে হয়, সন্দেহ তাহে উদয় ।

বারে বারে কতবার, জানাব আমি তোমার,

তুমি মোর প্রাণ ॥

সর্‌ফর্‌দা—জলদ তেতালা

বলনা আমারে সই, বাঁচিব কেমনে

প্রাণ সঁপিলাম যারে, না হেরি নয়নে ।।

এমন হইবে আগে, নাহি জানিতাম,

জানিলে এমন প্রেম, নাহি করিতাম,

পীরিতে এইত সুখ, সংশয় জীবনে ।।

সর্‌ফর্‌দা—জলদ তেতালা

মিলন অমিয় পান, করিতে বাসনা মনে ।

এ হেতু বিচ্ছেদ বিষে হয় জ্বালাতনে ।।

নহে সুখী নহে দুখী, প্রেম নাহি জানে ।

সুখী দুখী সেই সখি, এ রস যে জানে ।।

সর্‌ফর্‌দা—জলদ তেতালা

বিচ্ছেদেতে যায় প্রাণ, না পারি রাখিতে ।

কাতর নয়ন মনে, লাগিল কহিতে ।।

শুনি মন করে ধ্যান, প্রাণেরে বাঁচাতে ।

চাক্ষুষ বিহীনে নাহি উপায় ইহাতে ।।

সর্‌ফর্‌দা—জলদ তেতালা

অলিরাজ, যেথানে বিরাজ, ভুল না কমলে

দিবা বিভাবরী, তব ধ্যান করি,

ভাসি হে সলিলে ।।

এ রীতি তোমার আমি ঘুচাইতে পারি,

তুমি ভাসিবে নয়ন জলে ।

ইহাতে অধিক আমার যে দুঃখ

কি হবে কহিলে ।।

শ্যাম—জলদ তেতালা

শুন শুন শুনলো প্রাণ, কেন তুমি হও কাতর ।

মন প্রাণ আঁখি, যারে দেখে সুখী.
তাহারে রোষ কি, হয় আমার ।।
আসা আশা করি, কেবল তোমারি,
বুঝলো বিচারি, কারে হেরি ।।
লয়ে তব মন, মন পুরে মন,
করে রস পান, আশা আমার ।।

ভৈরবী—কাওয়ালী

নিশি পোহাইয়ে প্রাণ প্রভাতে আইলে ।
আমার আশার সুখ, কারে বিলাইলে ।।
যেরূপে যামিনী গত, সে দুঃখ কহিব কত,
জানিলাম প্রাণনাথ, কি হবে কহিলে ।
কামিনী সহিত তুমি, রতি পতি সহ আমি,
ইহা বুঝি অনুমানি, মনে না করিলে ।।

আলাইয়া – জলদ তেতালা ।

তুমি যারে চাহ, সে তোমার জান ।
ইহাতে অন্যথা কভু, ভেবো না লো প্রাণ ।।
না বুঝিয়া খেদ কর, উপায় কিবা ইহার ।
সন্দেহ আপন জনে, কর না কখন ।
আমি যারে চাহি, সে না রাখে মান,
এমন পীরিতে বল, কিবা প্রয়োজন ।।
অতএব এই হয়, দেখ কেহ কার নয়,
আপন বলিব তাঁরে, বাঁচায় যে প্রাণ ।।

ঝিঁঝিট – আড় ঠেকা

কেমনে রহিব প্রাণ, না দেখিয়ে তোমারে ।
চকোরী কি হয় সুখী, না হেরে শশীরে ।
প্রাণ বিনা শূন্য দেহ, থাকে কি প্রকারে ।
শশী বিনা নিশি কোথা, বল শোভা করে ।।

যোগিয়া গান্ধার—জলদ তেতালা

প্রত্যয় না হয় তারে যে সঁপিল পরাণ ।

প্রাণ লয়ে অবিশ্বাস, এ আর কেমন ॥
দিবানিশি যার ধ্যান যার গায় গুণ।
সে ভাবয়ে অবিশ্বাস, বিচার এমন ॥

ভাটিয়ারী—জলদ তেতাল।

আমি হে তোমার প্রাণ, অতি সোহাগিনী
যখন দেখহ মোরে, পাও কত মণি ॥
যদি থাকহ অন্তর, তোমার বিরহ শর,
বলে মোর কানে-কানে, সুখে থাক ধনি।
তোমার প্রিয় বচন, শুনিলে সুখী শ্রবণ,
তব আদরে শরীর হরষিত জানি ॥

ঝিঁঝিট আড়া—ঠেকা।

আইস আইস, আইস হে প্রাণ,
বইস, আমি বশ তোমার।
করিয়ে যতন, সঁপিলে যে প্রাণ,
তার পর কেন, রোষ তোমার ॥
অন্তরে অন্তর, দহে নিরন্তর,
নয়নে নীর নাহি মোর।
আসা আশা হাতে, নাহি দেয় যাতে,
আর কোন পথে, আশা তোমার ॥

সর্‌ফর্‌দা—জলদ তেতালা।

যেখানে থাকহ প্রাণ ভুল না অধীনী জনে।
অস্থি মোর জরজর, লোকের গঞ্জনে ॥
তোমা বিনে কেহ যদি অন্য নাহি জানে।
ক্ষতি কি তোমার হবে, তাহারে দেখনে ॥

ভাটিয়ারী—জলদ তেতালা

আমার মনোমোহিনী তুমি, আমি জানি,
হরিয়ে লইয়ে মন, হলে সোহাগিনী।
মনের অধিক ধন, আর কোথা আছে জান,

সে ধন তোমার কাছে, আছে বিনোদিনি।
করিলে অতি যতন, তবে ত থাকে রতন,
অযতনে ধন কোথা থাকে ওলো ধনি ॥

ঝিঁঝিঠ—আড়াঠেকা

হিম-শিশিরান্তে বসন্তে ব্যাকুল বিরহিণী ॥
সনে প্রাণকান্ত, তথা রতিকান্ত,
দহে দিবস রজনী।
রবির সমান সম, কুসুম কৃষাণু-সম,
চন্দনেরে ঐ গুণে বাখানি ॥
মলয়া সমীর কোকিলের স্বর,
হলাহলাধিক শুনি ॥

মাল কোষ—জলদ তেতালা।

পলকে পলকে মান, সহিব কেমনে।
সদা প্রফুল্লিত হেরি, বাসনা মনে ॥
মলিন মুখ কমল, হেরিলে হৃদি কমল,
বুঝে দেখ বিকসিত হইবে কেমনে ॥

মালকোষ—জলদ তেতালা।

হাসিতে হাসিতে মান সহনে না যায়।
করিয়ে অমিয় পান, বিষ কোথা খায় ॥
বিধুমুখে মৃদু হাসি, সদা আমি ভালবাসি,
ইহাতে বিরস হ'লে, প্রাণ বাহিরায় ॥

আলাইয়া—জলদ তেতালা।

দ্রুত গমনে কি এত প্রয়োজন,
একি প্রয়োজন নহে।
অন্তরে অন্তর, কিসে হব স্থির,
রহ রহ রহ, করি দরশন হে ॥
প্রাণ বাহির সময়, কেবা কাতর না হয়,
অনায়াসে যায়, নাহি দেখ তায়,
দুখ অতিশয়, বরং কখন সহে ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

মনে করি ভুলে তোরে, থাকিব সুখেতে।
না দেখিলে দহে প্রাণ, মরি হে দুঃখেতে॥
কি জানি কেমন আঁখি, না দেখিলে সদাদুখী,
প্রাণ কহে বল দেখি, করি কি ইহাতে।
নিদয় হইয়ে কেন, চাতুরী করহে প্রাণ,
আপন হইলে তারে, হয় কি ত্যজিতে।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

প্রেম অন্তর কি হয়,
প্রিয়জন প্রতি নয়ন অন্তরে।
নয়নের মত, দেখিতে সতত,
বল বল বল, এমতে কে পাবে কারে॥
অন্তরেতে ভাবান্তর, হলে যে হয় কাতর,
ভাবের ভাবনা, ভাবিয়ে দেখনা,
সেথায় যন্ত্রণা, কে কোথায় দেয় কারে॥

মালকোষ—আড়াঠেকা।

নয়ন মন ডুবিল প্রাণ নয়নে তোমার
ত্রিবেণী নয়ন, বেগ অতি ঘন,
বহে তিনধার॥
পলক পবন বয়, যমুনা প্রবল হয়,
প্রলয় যেমন, তরঙ্গ তেমন,
অপার পাথার॥

টোরী—জলদ তেতালা।

এমন চুরি চন্দ্রাননি, শিখিলে কোথায়
হানিয়ে নয়ন বাণ, হরিয়ে লইলে প্রাণ,
কথায় কথায়॥
মনেরে বান্ধিলে কেশ, তুমি মৃদু মৃদু হাস
ইথে কি উপায়।

চোরের নাহিক ভয়, সাধুজন ভীত হয়,
বিচার হে তায় ॥

মালকোষ—আড়াঠেকা।

একি তোমার, মানের সময়
সমুখে বসন্ত।
দেখ কুসুম কাননে, বিহরয়ে অলিগণে,
হরিষ নিতান্ত।
মন্দ মন্দ সমীরণ বহে অতি ঘন ঘন,
মদন দুরন্ত।
মনেতে বুঝিয়ে দেখ, বাহেতে উদয় দেখ,
যামিনীর কান্ত ॥

দরবারী টোড়ী—আড়াঠেকা

মনের বাসনা সই সে কি জানে না।
জানিয়ে দেখনা মোরে, সঁপিয়াছে দুঃখনীরে,
সহিতে বিরহ যাতনা ॥
মিলনে অসাধ কার, তার ত আছে অপার,
তথাপি সে ত বুঝে না।
হ'লে নয়ন অন্তর, অন্তরে সে নিরন্তর.
কি জানি কেমন মন্ত্রণা।

দরবারী টোড়ী—আড়া

যবে তারে দেখি, অনিমিষ আঁখি,
হয় লো তখনি।
সুখে অচেতন, হয় মোর মন,
শুন লো সজনি ॥
তৃষিত চাতকী যেন, নিরখিয়ে নবঘন,
বিনা বারিপানে, কত সুখী মনে,
কি জানে না জানি।

মাল কোষ—আড়াঠেকা

নয়ন জালে ঘিরিলে সকল, ও মৃগনয়নি।

মনকারী মোর, পালাবার পথ তার,
নাহি হেরি বিনোদিনী ॥
হেতু নিজ প্রয়োজন, যদি করিলে এমন
সদাহাস্য বদনে, তোষ অমিয় বচনে,
উচিত হয় লো ধনি ॥

টোরী—জলদ তেতালা।

কেমনে রহিব ঘরে মন মানে না।
হেরি মোর দুঃখানল, লাজভয় পলাইল,
কলঙ্ক বারণ করে না ॥
লোকের কথায় আর কেমনে হইব স্থির,
ঘুচিবে অন্তর যাতনা।
বিনা তার দরশন অশেষ মত যতন,
উপায় করিতে পারে না ॥

দরবারী টোড়ী—তেতালা

নয়নে না দেখ কারে, বিনে তারে যারে,
প্রাণ সঁপিলাম।
প্রবোধ না মানে, করয়ে রোদনে,
এতেক বুঝিলাম ॥
মন নয়নের বশ, প্রাণ আছে তার পাশ,
ইহাতে সদয়, যদি সেই হয়,
উপায় দেখিলাম।

বসন্ত বাহার—আড়াঠেকা

বসন্ত ঋতু আইল, হইল সুখ প্রবল,
সব প্রফুল্ল ফুল-কানন।
মন্দ মন্দ মলয় পবন বহে তায়,
পিক করে কুহু কুহু, মধুকর আনন্দিত,
সদা গুঞ্জরে হরিষান্বিত আনন।
কি কব সমরঙ্গ, অনঙ্গ বিশেষে সাঙ্গ
শরাসনে করেছে সন্ধান।

বিরহিণী কাতর এমন হেরি,
যেমন শশী দেখি রাহু, অতিশয় উল্লসিত;
যত সংযোগী সহাস্য বদন ॥

বাগেশ্বরী টোরী—জলদ তেতালা।

বিনাদরে, অনাদরে, কে কার বশ।
করিলে আদর হয় হৃদয়-কমল প্রকাশ ॥
রাখিতে একের মন, করে যদি একমন,
হইয়া উল্লাস।
দুই মন দুই মন এক কি হয় কোন ভাষ ॥

গৌরী জলদ—তেতালা।

যেমন আমারে ভাসালে নয়ন জলেতে।
তেমতি নয়ন বারি বরষণ, হইবে প্রাণ,
তোমারে ভাসিতে।
কত সুখ আশা করি, তোমার হাতেতে ধরি,
প্রাণ দিলাম হাসিতে হাসিতে ॥
মোর বশ মন, নহে ত এখন কাতর নয়ন,
কাঁদিতে কাঁদিতে ॥

গৌরী জলদ—তেতালা।

আসিতে এখানে কে বারণ করিলে।
অবলা বধের ভয় সে নাহি ভাবিলে ॥
ষট্‌পদ মধুকর, নিরন্তর অন্যান্তর,
দ্বিপদ কি ষট্‌পদ, স্বভাব পাইলে ॥
নিশি না পোহাইতে কি চঞ্চল হইলে।
আমার কি নাহি লাজ, লোকেতে দেখিলে
শশীর কিরণ দেখি, চকোর কুমুদ সুখী,
অরুণ উদয়—ভাব, ইথে কি ভাবিলে ॥

হিন্দল—আড়াঠেকা।

মিছে অনুযোগ সই লো করিছ কি কারণে।
কি করিতে পারে মন, মত্ত বারণে বারণে ॥

আমার বশ এখন, নহে সে দুরন্ত মন,
বুঝালে যে নাহি বুঝে, তারে পারিবে কেমনে ॥
মিলেছে সুখে থাকুক, না শুনে সেথা মরুক,
দুখবোধ হলে কেহ, কোথা থাকয়ে কখনে ॥

ললিত—জলদ তেতালা

পীরিতি পরম সুখ সেই সে জানে ।
বিরহে না বহে নীর যাহার নয়নে ॥
থাকিতে বাসনা যার, চন্দন বনে ।
ভুজঙ্গের ভয় সেই, করে কি কখনে ॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা

নয়ন সজল, হৃদয়ে উদয় অনল ।
যে বা করে প্রাণ, বিনে সেই জন,
কে করে শীতল ॥
কহিতে দুঃখ-সাগর অধিক প্রবল,
হইলে নীরব, কেমনে বাঁচিব,
বিষম হইল ॥

ললিত—জলদ তেতালা

যতন করি হে যাহারে, থাকে না সে অন্তরে ।
যাহারে না চাহি আমি ত্যজে না আমারে ॥
বিচ্ছেদেরে সতত করি হে অনাদর,
সে জন সদয় মোরে হয় নিরন্তর,
মিলনের প্রাণ ভাবি, চাতুরী সে করে ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা

আর কারে ভয় আমার প্রাণ,
ভয় হে তোমারে ।
লোকলাজ ভয়, সে ভয় কি হয়,
বুঝেছি বিচারে ॥
তব দুঃখে আমি দুখী, তব সুখে হই সুখী,

তব মতে মত, জে'ন প্রাণনাথ,

অধীনী জনেরে ।।

হিন্দল বেহাগ—আড়া ঠেকা

সুরস রুচির কুসুমে কণ্টক কে করিল ।
জগ আরাধিত মণি, কেন ফণিরে সঁপিল ॥
যেরূপ খেদ ইহাতে, কিরূপে পারি বুঝাতে,
পুর আলো করে শশী, তাহে কলঙ্ক রচিল ॥
অতএব হয় মনে, মিলিব তাহার সনে,
দুঃখ নাহি সুখ যথা, বহিতে হইল ॥

আড়ানা—জলদ তেতালা

চাতকীর তৃষা ঘন ঘন ঘন ।
উচিত যে হয়, হইয়ে সদয়, কর বরিষণ ॥
আছয়ে কত জীবন, তাহাতে মম জীবন,
তোমার জীবন, বিহনে জীবন,
সুখী-কি কখন ॥

ললিত—জলদ তেতালা

বিচ্ছেদে যে ক্ষতি তার অধিক মিলনে ।
আঁখির কি আশা পুরে ক্ষণে দরশনে ॥
প্রবল অনল দেখ কিঞ্চিৎ জীবনে ।
নির্ব্বাণ হইতে কেহ দেখেছ কখনে ॥

সিন্ধুখাম্বাজ—আড়াঠেকা

হেরিলে চমকে চিত্ত বিচ্ছেদের ভয়েতে ।
না দেখিলে ঝুরে আঁখি, মরি আমি বিরহেতে ॥
বিষম হইল মোরে, এ কথা কহিব কারে,
ইহার উপায় বিধিকে বুঝাইব বিধিমতে ॥

ললিত—আড়াঠেকা

নয়ন শীতল হয় দেখিলে যাহারে ।
দেখ দেখি কত সাধ, দেখিতে তাহারে ॥

চক্রবাক্ চক্রবাকী, দিবসে একত্র দেখি,
তাহার অধিক সুখী, বুঝি লো বিচারে ॥

আড়ানা—জলদ তেতালা

নলিনী হাসিয়ে কহিছে ভ্রমরে ।
আমার যে ধন প্রাণ সঁপেছি তোমারে ॥
পলক যদি না দেখি, বিরহে ঝুরয়ে আঁখি,
দুখেতে উপজে মান,—নহে সে অন্তরে ॥

আড়ানা—জলদ তেতালা

হে নাথ, মনের কথা তুমি জান ।
যে হয় উচিত, করিবে তেমত,
তোমারে বিদিত, আছয়ে কারণ ॥
মন সুখে থাকে যাতে, রাখ তারে সেই মতে,
এই নিবেদন ।
গুণাগুণ মোর, করিলে বিচার,
তবে তো তোমার, হব মতাধীন ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী

পীরিতি বিচ্ছেদ দুখ কিসে নিবারিব ।
ইহাতে উপায় সখি বল কি করিব ॥
সুখ-আশে ধন প্রাণ, করে তারে সমর্পণ,
এখন পাসরি তারে, কেমনে রহিব ।

ভৈরবী—জলদ তেতালা

মেঘান্তে শশধর, মানান্তে তোমার বদন ।
মেঘাচ্ছন্ন নিশাকর, হেরিলে চকোর,
কাতর যেমন সে, তব বিরসে মম মন ॥
তব অমিয় বচন, শুনিলে সুখী শ্রবণ,
পুলকিত প্রাণ ।
মানেতে মৌনা তুমি থাক লো যখন,
যেরূপ জলয়ে প্রাণ, জানে প্রাণ সেই প্রাণ ॥

আড়ানা—জলদ তেতালা

প্রয়োজন তোমা ভিন্ন আর প্রিয়জন কোন ।
যাবত জীবন মোর, মন তাবত তোমার,
ধ্যান জ্ঞান যতন সাধন ।
অধিক কহিব কত, আমি দেহ তুমি প্রাণ ।
তোমার সুখেতে সুখী প্রাণ,
তোমার দুখেতে জ্বালাতন, সজল নয়ন ॥

গৌরী—জলদ তেতালা

অনেক সাধের তুমি প্রাণনাথ ।
এই সে কারণ, রক্ষক নয়ন,
করিয়াছি জান, মন সহিত ॥
অন্তর হইতে প্রাণ, পারিবে না কদাচন,
তুমি মোর মনোমত ।
অমূল্য-রতন, পেলে কোন জন,
ত্যজয়ে কখন, নহে ত এমত ॥

সোহিনী—জলদ তেতালা

সখি দেখলো আমারে কি হ'ল !
শশীমুখী হাসি-হাসি বলিছে মোরে ।
শুন প্রাণনাথ, ধন প্রাণ চিত্ত,
আমার হে যত, সঁপেছি তোমারে ॥
ইহাতে অন্যথা কেহ ভেব না অন্তরে ।
দেওনে বিস্ময় কিবা বুঝনা বিচারে ॥
যাচকের মান, রাখিতে বাজন্,
ক্ষতি কি কখন, মনেতে করে ॥

সোহিনী—জলদ তেতালা

কি হ'ল আমার সই বল কি করি ।
নয়ন লাগিল যাহে কেমনে পাসরি ॥
হেরিলে হরিষচিত, না হেরিলে মরি ।

তৃষিত চাতকী যেন থাকে আশা করি।
ঘনমুখ হেরি সুখী, দুখী বিনে বারি॥

মোহিনী—কানড়া তেতালা

পীরিতের রীত যে, থাকিলে অন্তরে,
দোঁহে দোঁহার অন্তরে।
চক্রবাক্ চক্রবাকী, তার সাক্ষী দেখ সখি,
বুঝাব কি তোমারে॥
বিচ্ছেদ দুঃখেতে দুখী হয় দুই জন,
মিলনে দেখ অধিক হৃদয়ে দোঁহে পুলকে
ভাসে সুখ সাগরে

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী

মন চঞ্চল হলে, সাধিলে কি হবে।
দিনে ছায়াবাজি কেন, দেখিতে পাইবে॥
মন আপনার, তারে বশ কর,
মন বশ না হইলে, বশ কে হইবে॥

ছায়ানট—জলদ তেতালা।

সতত বাসনা যারে হরিষ হেরিতে।
তাহার বদন, বিরস কখন, না পারি দেখিতে॥
জীবন-বিহীন মীন, কোথা হুতাশনে,
শীতল হইতে কেহ, দেখেছ কখনে,
সুধাহারীজন, কভু বিষপান, পারে কি করিতে॥

শ্যাম পুরবী—আড়াঠেকা

ঐখানে রহিও হে নিদয় প্রাণনাথ
এত শঠতা কেন।
লাজ গেল, ভয় গেল, কুল গেল, শীল গেল,
এখন কি ভয় বল, ত্যজিতে জীবন॥
তুমি এমন রতন, দুঃখিনীর হবে কেন।
না বুঝে করে যতন, ফল পেলাম তেমন,
কি মনে করি এখন, করেছ আগমন॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা

কমলবদনি লো চঞ্চল মৃগবৎ এত অধৈর্য্য কেন ;
এই বোধ হয় মোর, হতেছ যে অস্থির,
সাদৃশের গুণ বুঝি, তব মৃগনয়ন ॥
রাত্রিদিন যারে ভাব, সে জন নিতান্ত তব,
বৃথায় সন্দেহ করি, কাতর হও সুন্দরী,
তোমার এরূপ হেরি দুখিত মম মন ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াঠেকা

তারে আর সাধিব না সই, সাধিলে আদর বাড়ে
বটে অনাদরের নয়,
অধিক আদর পেলে কে ছাড়ে ॥
এতেক যতন করি, মতে চলিতে পারি,
অতি নিম্ন হলে পর,
অতি দুখ দিবে মনেতে পড়ে ॥

বাগেশ্রী—জলদ তেতালা

তুমি বুঝি জান না হে প্রাণ,
বেঁধেছি প্রেমের ডোরে।
কেমনে জুড়াবে তুমি,
আশা আশা ধরে আপন জোরে।
হৃদয় মন্দিরে রাখি, রক্ষক করেছি আঁখি।
সেথানে প্রবেশ করো,
তোমা বিনা আর রাখিব কারে ॥

বাগেশ্রী—কানেড়া জলদ তেতালা

রতন পাইয়ে কেবা, যতন না করে।
হেরিতে যাহারে, হরিষ অন্তরে,
মনের তিমির হরে ॥
তিলেক অদর্শন, হলে কাতর প্রাণ,
ভুজঙ্গ যেমন, মণির কারণ,
আমিও তাহার তরে ॥

বাগেশ্রী—মূলতানী হরি।

আইল বসন্ত হে নাথ কি সুখ দেখনা।
পুরাইতে মনজের মনের বাসনা ॥
বিকস কুসুমবন, মধুকর মধুপান,
ভ্রমরী সহিতে সুখে, করিছে যাপনা।
কোকিলের কুহুধ্বনি, হৃদয় পুলক শুনি,
বিরহী এ রবে বড়, পেতেছে যাতনা ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী

পীরিতি কি রীতি প্রাণ, যে করেছে সে জানে।
অরসিকে রসবোধ, করিবে কি গুণে ?
পরম সুখের নিধি, পীরিতি সৃজিল বিধি,
জানিয়ে সুজনে।
এ রসে বিরস জনে, বুঝিবে কেমন ॥

ইমন—জলদ তেতালা

জগতে জানিল আমারে, তোমার কারণে।
ত্যজিয়ে কুল ব্যাকুল, ভাসি অকূল জীবনে ॥
তুমি কূল নাহি দিলে, কূল কোথা পাব,
অকূল পাথার হতে, কেমনে তরিব
উচিত সদয় হতে, অবলা সরলা জনে ॥

আড়ানা—হরি

আগে কি জানি প্রাণ বিরহে যাবে।
জানিলে এমন পীরিতি করি কি তবে ॥
সুখের লাগিয়ে কুল, মজিল কলঙ্ক হল,
সে সব দূরেতে গেল, এ দুখে ডুবে।
তাহার লাগিয়ে মরি, মিছে আপনার করি,
না হেরে নয়নে, হেরি মনেতে এবে ॥
পীরিতি সুখের নিধি, করিয়ে এখন কাঁদি,
অবলা করেছে বিধি, সহিতে হবে ॥

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ কাওয়ালী

কত না বিনিত করে, আমারে·ভুলালে।
এবে অপরূপ দেখ, দেখা না দেয় সাধিলে॥
এমন হইবে আগে, কেমনে জানিব
জানিলে আপন মন, কেন বা সঁপিব।
না জেনে এই সে হলো,
ভাসি হে দুখ-সলিলে॥

আড়ানা—হরি

তোমা বিনে কারে আর, কহিব আপন দুখ।
শুন শুন শুন প্রাণ, হেরিলে তব বদন,
প্রফুল্ল হয় তখন, মোর মুখ।
তুমি হে যেমন ভাব, আমি হে নিতান্ত তব,
কি কব মনে বুঝে দেখ।
মোর চিত কদাচিত, কোথায় কি হয় রত,
তোমারে পাইলে যত হয় সুখ॥

বাগেশ্রী—জলদ তেতালা

বিরহ-যাতনা, সখিরে,
অতি বিষম হইল, আইল বসন্ত।
কুসুম-সৌরভ, কোকিলের রব,
সহে না ও রব নিতান্ত।
সুধাকর দিবাকরসম মম মনে,
জ্বালায় জীবন মন্দ, মলয়া পবনে।
উপায় ইহাতে, না পাই দেখিতে,
উপায় সেই প্রাণ কান্ত॥

খাম্বাজ—মধ্যমান

বিরহ-যন্ত্রণা প্রাণ তুমি, জানিবে কেমনে।
জানিলে আমি কি সদা, থাকিহে রোদনে॥
নানাস্থানী যেই জন, তার মন কি কখন,·

মজে কোনখানে ?
তারে যেবা দেয় মন, সুখী কি কখনে ॥

আড়ানা—আড়াঠেকা

আমি কি তারে ত্যজিতে পারি ।
দিবানিশি সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান সেই ধন,
মন প্রাণ, প্রাণ প্রাণ করি ॥
রোমাঞ্চিত কদাচিত, যদি তারে হেরি ।
লোকের গঞ্জন-ভয়, সে কি ভয় অতিশয়,
তারে ভয়ে ভয়ে ভয়ে-ভয়ে মরি ॥

ভাটিয়ারী—জলদ তেতালা

বল দেখি কি তার ক্ষতি ইথে হবে,
অধীনে সদয় হলে ।
এক দিবা সহস্র, সহস্র এক রাতি,
বিরহ গণনা ছলে ॥
সসর্পেচ গৃহে বাস, বিরহ দেহে তাদৃশ,
বিনা মিলন অমিয়, জীবনের সংশয়,
যায় সখী কি করিলে ॥

আমি কি জানি প্রাণ, অন্তরে অন্তরে ।
কি আর নাহিক জানি, তোমার অন্তরে,
দিবানিশি আছ তুমি, আমার অন্তরে ।
অন্তর অন্তর হলে, জানিতে অন্তরে ॥

ইমন—জলদ তেতালা

না দেখে হয় প্রাণ কত কি মনেতে ।
অনেক জনের আশা, আছয়ে তোমাতে ॥
তিলেকে তোমার রোষে মরি হে ভয়েতে ।
কি জানি নিদয় হও, না পাই দেখিতে ॥

ইমন—জলদ তেতালা

ছাড় মোর হাত নাথ, লোকে দেখে পাছে ।
আমার কি আছে লাজ, তোমার কাছে ॥

সময়ে ধরিলে পায়, তাহা প্রাণ শোভা পায়।
অসময়ে হাতে ধরা, কি সুখ আছে ॥

ইমন কল্যাণ—তেতালা

আর আমারে এত সাধিতেছ কেন (প্রাণ)
ত্যজিয়ে আমারে, সঁপিলে যাহারে,
আপন পরাণ, সেথা করহ গমন ॥
আমি হে তোমার মত, না হইলাম কদাচিত,
করিয়ে অনেক সাধন ॥
এবে কি মনে বুঝিয়ে, নিদয়ে সদয় হয়ে,
আইলে এখন বুঝি, দেখিতে রোদন ॥

ইমন্ কল্যাণ—তেতালা

তুমি কি জানিবে আমার মন,
মন আপনারে আপনি জানে না।
জানহ যেমন, করহ যতন,
ইহাতে হে প্রাণ, আন করো না ॥
যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমন লাভ,
পীরিতের পথ, সুগম যেমত,
বুঝেছ তুমি তো, কারেও বলো না ॥

ইমন্ কল্যাণ—জলদ তেতালা

জানি হে নাথ, তোমার যেমত,
পীরিতে হে কত মত ব্যবহার।
ভুলায়ে নয়ন, হরে লয় মন,
হলে হে এমন, দেখা পাওয়া ভার ॥
না দেখিলে তব মুখ, জীবন সংশয় দেখ,
দিয়ে দরশন, দিলে প্রাণ দান,
ইহাতে হে প্রাণ, ক্ষতি কি তোমার ॥

ইমন্ পুরিয়া - জলদ তেতালা

সদয় রহিও, শুন প্রাণপ্রিয়,
নিদয় না হয়ো নাথ।

প্রথমে যে রীতে, মজালে পীরিতে,
সেই রীতে রেখ চিত ॥
ধন, প্রাণ, আর মন, আমার নহে এখন,
সঁপেছি তোমারে, তোমার বিচারে,
কর যা হয় উচিত ॥

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

যায় যায় যায়, প্রাণ যায় রে,
নিষেধ না মানে করি কি এখন ।
আশা তাহার নিকটে, ঘরে নাহি মন ॥
যাহারে আপন জানি সঁপিলাম প্রাণ ।
সে যদি না রাখে আর, পারে কোন জন ?

আলাইয়া ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

নয়ন নিকট থাক অন্তর হইও না ।
অন্তর হয়ে, অন্তর আমার জ্বালাইও না ॥
আমার অন্তরে আছ তুমি জান না ।
জানিলে অন্তরে ভয় কখন হইত না ॥

কালাংড়া—ঢিমে তেতালা

মন তোর মোর একই স্বভাব কি লাভ আর।
দুই মন একমন হওয়া অতি ভার
উভয়ের প্রেমগুণে জানিবে এ সার ।
রীতে রীতে, চিতে চিতে, সুখ হে অপার।

ভাটিয়ারী—জলদ তেতালা

বরিষে ঘন ঘন ঘন কেন গরজ ঘন ।
তৃষায়ে চাতকী মরে, শুন শুন শুন ॥
মিলন সময় নিকট হইলে,
বিরহ অনল আর অধিক জ্বলে,
তৃষিত ডাকিছে বারি, আন আন আন ॥

ইমন্ ভূপালী—একতালা

বুঝিলাম এত দিনে প্রাণ, বুঝেছ আমার মন।
কি পরমাধিক হইল এখন ॥
জানাইতে মোর মন, করেছিলাম প্রাণপণ,
তুমি তো বুঝিলে এবে, পূরিল সাধন ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী

মনে নাহি ছিল প্রাণনাথ পাইব তোমারে।
সদয় হইবে শশী কাতর চকোরে ॥
পুনঃ অনুকুল নাথ, হইবে অধীনে,
হেরিব ও বিধুমুখ তৃষিত নয়নে।
পুরিবে মনের আশা দুঃখ যাবে দূরে ॥

কানাড়া—জলদ তেতালা

দেখ দেখি কি সুখ সখী, এমন পীরিতে।
লাজ ভয় সব গেল, কলঙ্ক কুলেতে ॥
দিবা নিশি যদি তারে, রাখিলো হৃদয় পরে,
তিলেক বিচ্ছেদে হয় বিরহে জলিতে ॥
নয়ন শ্রবণ ত্বক্, নাসিকা রসনা দেখ,
পাঁচ জন সুখ-লোভে ডুবালে দুঃখেতে ॥

কালাংড়া জলদ—তেতালা

এসো রসরাজ বিরাজ নলিনী ভবনে।
শুন ওহে প্রাণ, হারাইবে প্রাণ,
কেতকী কণ্টকে কেনে ?
যেমন মতন আমি করি হে তোমারে,
তেমনি আমারে তুমি না ভাব অন্তরে,
যেমন স্বভাব, নিজ লাভালাভ,
বুঝিতে না পার মনে ॥

কাফী—জলদ তেতালা

এত কি চাতুরী সহে প্রাণ,

তোমার পীরিতে দিবানিশি ঝুরে আঁখি।
এত যদি ছিল মনে, পীরিতি করিলে কেনে,
শঠতা সরলা সনে, উচিত হয় কি ?
কপট বিনয় ছলে, অবলারে ভুলাইলে,
এখন এমন হলে, দেখনা হে দেখি ॥

কাফী—জলদ্ তেতালা

পীরিতে এই তো লাভ, হইল আমারে।
নয়ন সহ জীবন, অনল অন্তরে,
এমন হইবে আগে জানিলে কে করে ॥
লোকলাজ কুলভয়, রহিল কোথারে।
নিদ্রা হিংসা করি গেল দেখিয়ে চিন্তারে ॥

কাফী—ঢিমে তেতালা

তুমি কি আমারে ত্যজি, পারহে রহিতে।
ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়, যাহারে দেখিতে ॥
না দেখিয়ে মোর মুখ, বাঁচিবে কেমতে,
তব মন ধন প্রাণ, আমার হাতেতে,
আমারে বিরস করি, রবে কি সুখেতে ॥

ভাটিয়ারী—জলদ তেতালা

কমলিনী তব প্রাণ মধুকর।
শুনহে ভ্রমর, এবে এই কর নয়ন অন্তর
হইও না, বাসনা এই মোর ॥
বিরহ-অনল, না হেরি প্রবল,
ইহাতে হে বল, কে না কাতর।
মানেতে কত, কহি অনুচিত হইও না।
ভাবিত, চকোরী কি ত্যজে শশধর।

ভাটিয়ারী—জলদ তেতালা

মধুকর তব প্রাণ কমলিনী,
বিরস বদন, করো না কখন, শুনলো বচন,

প্রাণের অধিক তোমারে জানি ॥
হৃদয়-কমল, নহে প্রফুল্ল,
নয়ন সজল, নিরখি ধনি।
এরূপ দেখে, যদি হয় সুখী, ইহাতে
ক্ষতি কি, হরষিত হওলো বিনোদিনী ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা

কমলিনী হের না ভ্রমরে।
অনুগত জনে মান, প্রাণ, সতত কে করে ॥
ধনী হইয়ে যদি অধীনে না হেরে।
বল তবে প্রিয়ে সে ওলো, যাইবে কোথারে ॥

কাফী—পলাশী আড়াঠেকা

নয়নে নয়ন আলিঙ্গন মনে মনে মিলিল।
দেখিতে অন্তর, নহে সে অন্তর,
অন্তরে অন্তর পশিল ॥
উভয়ের প্রেমগুণে, বাঁধা গেল দুই জনে,
ভাবের অভাব, নাহি এত ভাব,
স্বভাবে স্বভাব, মজিল ॥

কামদ—আড়াঠেকা

পী রতে কি সুখ সই,
যে না পারে লাজ ত্যজিতে।
মনে উপজয় সুখ, লয় হে দুখেতে,
কখন বাসনা নহে তিলেক ত্যজিতে,
ক্ষণেকে কি সুখ হয় তার সহিতে ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা

পীরিতি প্রতি রয় মতি, অতিশয় বাসনা।
এ রতন নিধি, পাইলাম যদি,
হে বিধি বিবাদী হৈও না ॥
লাজ ভয় ক্রোধ আদি, হও নিবৃত্তির বাদী,

দুই হয়ে এক, সদা দেখ এক,
অধিক কি সুখ, দেখনা ॥

কামোদ—জলদ তেতালা

প্রাণ কেমনে আইলে তারে ত্যজিয়ে।
কেতকী কত কি মনে করিছে না দেখিয়ে ॥
যাও নাথ শীঘ্রগতি, কামিনী কাতর অতি,
তোমারে ভাবিয়ে।
তার সুখে দুঃখ দিয়ে, আইলে কি লাগিয়ে ॥
শুন ওহে অলিরাজ, আসিতে না হলো লাজ,
এখানে ফিরিয়ে।
সখার উদয় দেখা নহিলে কভু কি হয়ে ॥

কামোদ—জলদ তেতালা

জানিরে প্রাণ যেমন, তোমার আমারে যতন।
কি দোষ তোমার, বিশেষে আমার,
কঠিন পরাণ ॥
দুখ বিনে সুখ, নাহি হইতে পারে,
ইহা বুঝি প্রাণ তুমি বুঝেছ অন্তরে,
যে হেতু অন্তর, থাক নিরন্তর, করেছ বিধান ॥

কামোদ খাম্বাজ—জলদ তেতালা

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা ॥
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর,
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ?

কামোদ—জলদ তেতালা

বরিষে ঘন চাতকী কত কি করিছে মনে।
তৃষায় অনল, করে জল জল,
জলধর জল হয় কেনে।
শুনি গরজ গভীর, পুলক হয় শরীর,

বিহনে জীবন, কেমনে জীবন,
আর বল কি সে বাঁচিবে প্রাণে ॥

কালাংড়া—খাড়াঠেকা

নিরখি ঘন, বরিষে নয়ন, বাহুলতা মূলে।
বাহুলতা মূলে জল, বিরহ লতা প্রবল,
হয় সেই জলে ॥
শোক-সিন্ধু প্রলাপিত, মনেরে ডুবালে।
দুখতরু তাহে দেখ, উন্নত হল অধিক,
শোভা ফল ফুল ॥

কেদারা—জলদ তেতালা

প্রেমবাণ প্রাণ, আমার প্রাণে হানিলে।
চিহ্ন নাহি তার, বেদনা অপার,
বল কি করিলে ॥
বিস্ময় হইলেম নাথ, কথায় তা কব কত,
বিনে শরাসন, অপরূপ বাণ,
নিক্ষেপ করিলে ॥
এ-কথা কাহারে কব, কেমনে তারে বুঝাব,
বিনে নিদর্শনে কেহ নাহি মানে,
কামিনী মজালে ॥
কেমনে হইব স্থির, উপায় না দেখি আর,
এই হয় মনে, সুখ দরশনে,
দুখ না দেখিলে ॥

আলাইয়া—জলদ তেতালা

যাবে কেমনে হে কান্ত, এমন বরষাতে।
দেখ ঘন ঘন, বরিষে নয়ন,
হইবে ভিজিতে ॥
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু, স্থির কি হইবে তায়,
দেখ সৌদামিনী, রাখি একাকিনী,
শোকের পথেতে

কামোদ গৌড়—একতালা

দুখেতে কহিতে আঁখি, আর না হেরিব সখী,
এখন নয়ন তার অধীন হইল ॥
অঙ্গের অঙ্গ অবশ, কার বলে করি রোষ,
সময় পাইয়ে দিব সমুচিত ফল ॥

কামোদ-খাম্বাজ—তেতালা

ছাড়িলে তো ছাড়া না যায়।
ছাড়া হেন রব হলে প্রাণ বাহিরায় ॥
অতএব এই বিধি, যাহা করিয়াছে বিধি,
ইহা কি অন্যথা হয় লোকের কথায় ॥

কেদারা—জলদ তেতালা

একেবারে এত অনুগ্রহ অধীনে।
এমন সময়, হইবে নিদয়, ছিল না মনে ॥
তোমারে হেরিয়ে প্রাণ, শূন্য দেহে এলো প্রাণ,
বারিধারা বহে নয়নে।
বিরহ অনল হইল শীতল, তব দরশনে ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী

সাধিলে করিব মান, কত মনে করি।
দেখিলে তাহার মুখ, তখনি পাসরি ॥
মম মানে কহে আঁখি, আর না হইবে সুখী,
দরশনে পুন, অধীন তাহারি ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা

হিম শিশিরে নীরে কেন আসিবে হে মধুকর।
জীবন থাকিতে, সতত দেখিতে,
না পাই থাক অন্তরেতে নিরন্তর ॥
যত দিন আছে প্রাণ, দিও ওহে দরশন,
এই তো বাসনা মোর।

দিবা অবসান হইলে, মিলন হবে তো হইলে,
কি গুণ জ্ঞান অন্তর ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা

জানিলেম তুমি প্রাণ রসিক হে যত।
অনল শীতল হয় কথায় হে কত ॥
হেরি নয়ন জুড়ায়, শ্রবণ সুখী কথায়,
মন আশা কে পূরায়, ভাবি হে সতত ॥

ভাটিয়ারী—জলদ তেতালা।

কহিও তারে যারে সখী দেখি, সে কি আসিবে
বিরহ নিরুপায়ে, তব মুখ না দেখিয়ে,
রাত্রিদিন জ্বালায়, একি শীতল হইবে ॥
মনের মানস এই, কহিবে তাহারে সই,
যদি হয় অনুকূল, তবে থাকে কুলশীল,
লজ্জাভয় সকল রয়, নিতান্ত জানিবে ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা

দিয়েছি যারে, তারে কি প্রকারে,
কহিব দেহ (প্রাণ)।
করে সে যতন, তাহার রতন,
কি কহিবে এখন, বিনে সেহ ॥
মিছে অনুযোগ কর, উপায় কি আছে আর,
দেখ মত্ত মন, স্বভাব বারণ,
না শুনে বারণ, বলি লহ ॥

কেদারা কামোদ—একতালা

অনিমিখে যারে নিরখে মৃগনয়নী
নিশ্চিত এ জান, তাহার পরান,
হরয়ে তখনি ॥
নীরদ নিন্দিত কেশী, নিরমল মুখশশী,
সুধা-ভাষী, মৃদু মৃদু হাসি,
মদন মোহিনী ॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা

মন তোরে মনে করে কি মনে করে।
রতন অধিক নিধি হলো কি বোধেরে ॥
কিবা প্রাণ সম নিধি ভাবয়ে অন্তরে।
শুনি অমিয় বচন, সুধা সিন্ধু করে জ্ঞান,
বাঁচাতে প্রাণেরে ॥
কি মদন শাস্তকারী, বুঝিল বিচারে,
কি মনোজে করে বৈরী, থাকিয়ে অন্তরে ॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা

প্রাণ তুমি বুঝিলে না, আমার বাসনা।
ঐ খেদে মরি আমি, তুমি তো বুঝ না ॥
হৃদয়-সরোজে থাক, মোর দুঃখ নাহি দেখ,
প্রাণ গেলে সদয়েতে, কি গুণ বলনা ॥

কালাংড়া—আড়া তেতালা

না হতে পতন তরু, দহন হইল আগে।
আমার এ অনুতাপ, তাহাকে ত নাহি লাগে ॥
চিতে চিত সাজাইয়ে, তাহে দুঃখ তৃণ দিয়ে।
আপনি হইব দগ্ধ, আপনারি অনুতাপে ॥

ভৈরবী—একতালা

শারদ নীরব রবে, প্রাণ কি রবে,
প্রাণকান্ত বিদেশে।
এমন মধুর স্বর, বোধ হয় বিষ-ধর,
আমার পরশে ॥
এমন সুখ-সময়, এক বিনে দুখময়,
বিষাদ হরিবে।
দামিনী কিরণ দেখি, শিহরে শরীর আঁখি
দুঃখেতে বরিবে ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান

তোমারই তুলনা তুমিই প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে।
আকাশের পূর্ণশশী, সেও কাঁদে কলঙ্ক ছলে॥
সৌরভে গরবে, কে তব তুলনা হবে,
আপনি আপন সম্ভবে,
যেমন গঙ্গা-পূজা গঙ্গা জলে *

* পাঠান্তরে এই গান এইরূপ দৃষ্ট হয় ;
তোমারি তুলনা তুমিই প্রাণ-এ মহীমণ্ডলে।
গগনে শারদশশী জিনেছে কলঙ্ক ছলে॥
সৌরভে আর গৌরবে, কে তব সদৃশ হবে,
অন্যের কি সম্ভবে, যেমন গঙ্গা পূজে গঙ্গাজলে॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা

কেশ-ফাঁসি গলে দিলে, প্রাণ, হাসিতে হাসিতে
তোমার বদন শশী, হেরিতে হেরিতে॥
ভুরু শক্রশরাসন, অনঙ্গ হয়েছে গুণ,
অস্থির তব নয়ন, বাণেতে বাণেতে॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা

হেরিতে হেরিতে পথ, কাতর আঁখি। (সই)
একবার এই হয়, চারিদিকে দেখি॥
কবে হবে সে সুদিন, মন পূরে পাবে মন,
আশা নিষেধ না মানে, ইহাতে অসুখী॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা

এই আসে আসে বলে যামিনী গেল।
দেখ নলিনীর সখা উদয় হইল॥
মনের বাসনা এক, হলো আর বুঝে দেখ,
প্রভাতে চকোরী সুধা পাবে কেন বল॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা

প্রাণ তোমার বিনয়ে কে আর তুলিবে।

তোমার পিরিতে সদা জলিতে হইবে ॥
তোমার এ ভাবে ভাব, কেমনে রহিবে ॥
তুমি হে চঞ্চল অতি, বুঝে না বুঝিবে ॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা

বলনা কেমনে রহিব সই নাথ বিহনে।
রাত্রি-দিন মোর, অন্তর নিরন্তর,
কাতর তার কারণে ॥
অতি সুখ লাভে পিরিতি করি,
দেখনা এখন বিরহে ম'রি,
আগে কি জানিব, পরান হারাব,
দ'হিব দুঃখ-দহনে ॥
যদি মনে করি ত্যজিব তারে,
বিরহে দ্বিগুণ দহন করে,
কামিনী সরলে প্রেমরস ছলে,
ভুলালে সুধা-বচনে ॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা

তুমি যারে জান লো আপন,
সে জন নিতান্ত তব, কভু নহে আন।
ইহাতে সন্দেহ তুমি, করো না হে প্রাণ,
যে যারে যেমন ভাবে সে ভাবে তেমন ॥
সুজনে সুজনে সুখ, হয়ত বিধান।
সুজনে কুজনে সুখ, না হয় কখন ॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা

পিরিতি এমন কেমনে সই আগে জানিব।
জানিলে এ প্রেম নাহি করিতাম,
পরান কেন হারাইব ॥
যতনে যাহারে সঁপিলাম প্রাণ,
সদাই চাতুরী করে সেই জন,
দেখিতে তাহারে, হইলে সাধেরে,
কাহারে দুঃখ কহিব ॥

যদি মনে ধৈরজ ধরিয়ে থাকি,
করয়ে রোদন সঘনে আঁখি,
অঙ্গ আপনায়, বশ হলো তার,
কাহার আমি হইব ॥

খাম্বাজ—তেতালা

আর আমি কাহারে কহিব আপন।
জানিয়া না জান যদি শুনহ হে প্রাণ ॥
যেরূপ যতন মোর, তোমার কারণ।
কহিতে সে সব দুখ বিদরে পাষাণ ॥
তোমার অধিক আর, আছে কি রতন।
তোমারে ভুলিয়ে তাতে, মজাইব মন

ভৈরব—কাওয়ালী

না দেখিলে বলনা সই বাঁচিব কেমনে।
দিবানিশি সেই রূপ সদা পড়ে মনে ॥
সতত কাতর প্রাণ, বারি সহিত নয়নে।
বিনা সে বিধুবদন প্রবোধ না মানে ॥
পিরিতি অমিয়াধিক. সকলে বলয়ে দেখ,
বিষম হইল মোর, করমের গুণে ॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা

নয়ন পাগল সই করিল আমারে।
যত দেখি তথাপি আশা নাহি পূরে ॥
যদি বিনয়েতে মন, স্থির হয় কদাচন,
নয়ন মন্ত্রণা দিয়ে ভুলায় তাহারে ॥
পলকে প্রলয় হয়, প্রাণ মোর সংশয়,
বল ইহার উপায়, বাঁচি কি প্রকারে ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা

থাক থাক সুখে থাক, যেখানে সুখাধিক
কি কাজ কমলে।

নিরন্তর নীরেতে দেহ জলে ॥
নানা কুসুম কাননে, তুমি তো ফিরিলে,
নলিনী সলিলবাসী না হেরিলে ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী

কহনে না না যায় সখী তার কত গুণ ।
রাত্রিদিন প্রাণ প্রাণ, করে যারে মন ॥
হরিষ বিষাদে দুই বিচ্ছেদমলিন ·
দুয়ের বাহিরে রাখে সে জন এমন ॥

ভৈরব—জলদ তেতালা

আগে কি জানি সই এমন হবে ।
নয়নে নয়নে মিলে, মনেরে মজাবে ॥
আকাঙ্ক্ষার ভার প্রাণ কতেক স'হিবে ।
যাতনা পাইলে ওলো সেও ত ভাঙ্গিবে ॥

গৌড় মল্লার—জলদ তেতালা

কি সুখ দেখনা ঘন গরজে বরষে ।
শরীর উল্লাস মোর পরশে পরশে ॥
ভেকে বাজাইছে ভেরি,
সমীরণ বীণাধারী, চাতকী আলাপে পিউ,
মনের হরিষে ।।

জয় জয়ন্তী—জলদ তেতালা

পিরিতি সুখের লোভে,
মজে হে যে জন । (প্রাণ)
সে হয় কেবল দেখ, দুখের ভাজন ।।
বিচ্ছেদ-মিলন আশে, থাকয়ে জীবন ।
মিলনে ভাবনা পুনঃ বিচ্ছেদ কারণ ॥

গাড়া ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা

কেমনে রহিব প্রাণ, না দেখিয়ে তোমারে ।
চকোরী কি হয় সুখী, না হেরে শশীরে ॥

প্রাণ বিনে শূন্য দেহ, থাকে কি প্রকারে।
শশী বিনে নিশি কোথা, বল শোভা করে ॥

জয় জয়ন্তী—জলদ তেতালা।

নয়নে শীতল থাকি, শুন ওলো সখি!
চেতনে সলিলে ভাসি, কোরে ওলো আঁখি ॥
পিরিতি করিলে লাভ, হয় লো এই কি!
সদা দুঃখে দহে মন, কদাচিত সুখী ॥

ভৈরব—জলদ তেতালা

অনেক সাধের সুখে, প্রাণ দুখ পাছে হয়।
কুজনের কথা শুন সদা ওই ভয় ॥
আমার যে নহে মত, যদি তাহে হও রত,
তবে বুঝে দেখ দেখি, কিসের প্রণয় ॥

গৌড়—জলদ তেতালা

তুমি যা বুঝিলে প্রাণ, সেই ভাল ভাল।
আমার বচন, স্বরূপ কথন,
বোধ নাহি হ'ল হ'ল।
এতেক করি যতন, তবু না পাইলেন মন,
আপনারি মন, দিয়াছি যখন,
উপায় কি বল বল ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী

কত ভালবাসি তারে, সই কেমনে বুঝাব।
দরশনে পুলকিত মম অঙ্গ সব ॥
যতক্ষণ নাহি দেখি, রোদন কয়রে আঁখি,
দেখিলে কি নিধি পাই, কোথায় রাখিব ॥

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

নয়ন অন্তরে তোরে, প্রাণ বলনারে,
করিব কেমনে।
যদি নিরন্তর তুমি, আছ মোর মনে ॥

বাহিরে না হেরি বারি বহে নয়নে ॥
তোমারে পেয়েছি আমি, অনেক যতনে
তিলেক বিচ্ছেদ কি আর সহে এখনে ॥

জয় জয়ন্তী—জলদ তেতালা

সতত যতন আমি, করি যে যেমন (প্রাণ)
তুমি কি কখন ভাব, আমার কারণ ॥
জীবন যৌবন সুখ সব অকারণ।
বিনে দরশন তব ও বিধুবদন ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা

পিরিতের গুণাগুণ, যদি জান সই,
কারেও বলো না।
ত্যজিতে না পারি যাহা, তাহার কি শোচনা ॥
ক্ষণেক সুধাসাগর, ক্ষণে হলাহল শর,
যত দুখ তত সুখ, মনে কেন বুঝনা ॥
দেখি পিরিতি রতন, পাইয়াছে যেই জন
ত্যজিতে সংশয় প্রাণ, ফণী মণি দেখনা ॥
চক্রবাক চক্রবাকী, দিবসে দোহেতে সুখী,
নিশিতে বিচ্ছেদ দুঃখে তথাপি ত্যজে না ॥

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ কাওয়ালী

যেখানে থাকহ প্রাণ ভুল না অধীনী জনে।
অভি মোর জয়জয়, লোকের গঞ্জনে ॥
তোমা বিনে কেহ যদি, অন্য নাহি জানে।
ক্ষতি কি তোমার হবে, তাহারে দেখনে ॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা

কেন লো প্রিয়ে কি লাগি মানিনী।
ইহার কারণ আমি কিছুই না জানি ॥
হরি হরি মরি মরি, মান ভরে ভর করি,
নয়ন সহিত বারি, হেরিয়ে ধরণী ॥

আলুয়ে পড়েছে কেশ, বিষাদিনী হীন বেশ,
তোমার বিরস শেষ দংশে মোরে ধনি ॥
মলিন বদন শশী, তাহে নাহি হেরি হাসি,
চকোর কাতর আসি, ও বিধুবদনি !

পিলু—জলদ তেতালা

পিরিতে সখি এই সে হইল ॥
লাজ ভয় কুল শীল সকলি মজিল ॥
না করিলে গুণাগুণ বোধ নহে কদাচন,
করিয়ে মরি এখন, দেখ তার ফল ॥
পিরিতি রতন যদি, যতনে মিলাল বিধি,
পাইয়ে এমন নিধি দুঃখ নাহি গেল ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা

রতন অধিক তোরে প্রাণ, করি যে যতন.
বুঝা নাহি যায় ভাব তোমার কেমন ॥
কখন থাক সদয়, কখন অতি নিদয়,
অবলা সরলা, জ্বালা দিও না কখন ॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা

শুন শুন শুনরে প্রাণ,
অধীনী জনেরে, নিদয় হইও না।
বিরহ যন্ত্রণা বুঝি তুমি জান না।
জানিলে জ্বালাতনে জ্বালাইতে না ॥
কবিতা বনিতা লতা, বুঝে দেখনা
নিরাশ্রয়ে কদাচিত, শোভা থাকে না ॥

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

নয়নে নয়নে রাখি, (প্রাণ)
অনিমিখ হয় আঁখি, বাসনা মনেতে।
পলক পড়িলে আমি হই অতি দুঃখী।
কি জানি অন্তর হও, ওই ভয় দেখি ॥

ঝিঁঝিট—তেতালা

রাহুর আহার শশী, যে বিধি করয় ।
পিরিতি বিচ্ছেদ বুঝি, তাহা হতে হয় ॥
এই খেদ হয়, প্রেম সুখে তায়, বিচ্ছেদ মিলায়,
চমকেতে প্রাণ যায়, সদা ওই ভয় ॥

ঝিঁঝিট—তেতালা

কেমনে তোমার আশা পূরাইব মন ।
একে তুমি তাহে আর কান্দিছে নয়ন ॥
অতএব এই কয়, নিজ আশা পরিহর
নয়নেরে শান্ত কর, এই সে বিধান ॥

ঝিঁঝিট—তাল হরি

প্রাণ তুমি জাননা যেমন আমার মন ।
রতি নিজ পতি প্রতি, যেমন তাহার মতি,
তব প্রতি আমিও তেমন ॥
চকোর চাতকী যেন, হেরিবারে শশী ঘন,
চঞ্চলিত থাকে যেমন ।
মণির কারণে ফণী, যেরূপ কাতর জানি,
ততোধিক তোমার কারণ ॥

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

পিরিতি না জানে সখি, সেজন সুখী কেমনে
যেমন তিমিরালয় দেখ দীপ বিহীনে ॥
প্রেমরস সুধা পান, নাহি করিলে যে জন,
বৃথায় তার জীবন, পশুসম গণনে ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী

অবলা সরলা অতি প্রাণ, শঠতা কি সহে
তপন কিরণ দেখ, কমলে না দহে ॥
সুজনের এই রীত, তোষে তারে যে যেমত,
বিশেষ অধীনে কেহ বিরূপ না কহে ॥

ঝিঁঝিট—তেতালা

ভাল ত ভুলালে প্রাণ, বিনয় ছলেতে।
তোমার প্রেমের ছুরি, হাসিতে হাসিতে।
অতি সাধ করে আমি দিলাম গলেতে।
উচিত তোমার হয়, চাতুরী ত্যজিতে ॥
অবলা সরলা অতি, বুঝহে মনেতে ॥

ঝিঁঝিট—একতালা

হলো হলো হলোরে প্রাণ,
পূরিল মনের সাধ আমার।
কলঙ্কিনী হইলাম প্রেমেতে তোমার ॥
এই তো হইল লাভ রোদন সার ॥
যে নহে আমার, আমি হইলে তাহার,
সে কেন বুঝিবে দুঃখ নহে ত বিচার ॥

কল্যাণ—জলদ তেতালা

আমি কি কখন তোমারে,
ওরে, না দেখে থাকিতে পারি।
বিনা দরশনে প্রাণ, শূন্য দেহ হয় প্রাণ,
সচেতন হয় পুনঃ তব মুখ হেরি ॥
প্রথম মিলনাবধি, বুঝিয়াছি মনে,
কদাচিত নহি সুখী তোমার বিহনে,
এবে এই নিবেদন, বিচ্ছেদ না হয় যেন,
নয়ন নিকটে থাক, সদা সাধ করি ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান

হায় কি বিপরীত বিধির ঘটন।
কহিতে উপজে দুঃখ আইসে রোদন ॥
সুখেতে করিলে তুমি নিশি জাগরণ
আমার হইল দেখ অরুণ নয়ন ॥
তুমি হে করিলে চুরি পরের রতন।
মদন প্রহারে মোরে বিচার এমন ॥

ঝিঁঝিট—তাল হরি

এই মনে প্রাণ তোমার ছিল হে নাথ ।
সদাই চাতুরী করি জ্বালাইতে চিত ।
মনেরে ভুলাইয়ে লইবে প্রাণ,
যতনে রাখিতে তারে হয় তো বিধান,
তা না করে বধিবারে হলো হে মত ॥

ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতালা

যাও তারে কহিও সখী,
আমারে কি ভুলিলে । (হে)
বিরহে তব প্রাণ সংশয়,
ভাসি আমি নয়ন সলিলে ॥
আসিবে আশয়ে, পথ নিরখিয়ে,
আছি প্রাণ ; তোমার মনে প্রাণ,
জানি কি আছে প্রাণ,
গেলে কি হবে আইলে ॥

আলাইয়া—জলদ তেতালা

আর এলে না প্রাণ মান করে যে গেলে
মান করি প্রাণনাথ, এই সে করিলে,
কেন অবলা মজালে ॥
আমার নাহিক দোষ, না বুঝি করিলে রোষ,
তবে দোষ থাকে যদি, যায় তো বুঝালে,
না করি মানেতে রহিলে ॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা

প্রাণ তুমি কার হবে, আমি যদি মুদি আঁখি,
অন্যজনার মন পেয়ে আমারে দিও না ফাঁকি ॥
শুন প্রাণ তোমারে কই, আমি বুঝি কেউ নই,
যদি দেশান্তরে রই, হৃদকমলে তোমায় দেখি ।

সিন্ধু—কাওয়ালী

অমর করেছে রে প্রাণ প্রেমসুধাদানে।
আর কি বধিতে পার বিচ্ছেদেরি বাণে ॥
যে করেছ পান অমৃত, তার কি আর আছে মৃত,
রাহুকেতু শীর্ণীকৃত, বেঁচে আছে প্রাণে প্রাণে ॥

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

কেন এত নিদয় হইলে অধীনী জনে।
দিবানিশি হৃদিপরে, সোহাগে রাখিতে যারে,
এবে তারে ভুলিলে কেমনে ॥
তোমার প্রতি মোর মন প্রথমাবধি এখন,
ভিন্ন ভাব নহে কখনে।
তোমার কেমন ভাব, নাহি হয় অনুভব,
এবে লাভ সলিল নয়নে ॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা

ওই দেখ, সই, নাথ তোমার আছে দাঁড়াইয়ে।
যাহার কারণ, কিবা রাত্রি দিন,
দহিতে দেখ না আসিয়ে ॥
কই কই বলে ধনী, বাহির হইল শুনি,
প্রফুল্ল বদন, হরষিত মন,
অনিমিখে রহিল চাহিয়ে ॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা

পূজিব পিরিতি প্রেম, প্রতিমা করে নির্মাণ।
অলঙ্কার দিব তাহে যত আছে অপমান ॥
যৌবনে সাজায়ে ডালি, কলঙ্ক পূরি অঞ্জলি,
বিচ্ছেদ তায় দিব বলি, দক্ষিণা করিব এ প্রাণ
পাঠান্তরে—"গঞ্জনার করি ডালি।"

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

আমার নয়ন লয়ে হেরে যদি তারে।
মমাধিক সুখী হতে অবশ্য সে পারে ॥

সবে বলে নহে ভাল, সেই সে আমার ভাল,
সে মুখ হেরিলে দুঃখ যায় দূরে ।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী

শুনলো সই, এখন কহিলে কি হবে ।
করেছি যে কাজ, তাহার উপায় কি হবে ॥
বটে লো বিরহানলে জলয়ে পরাণ,
দুঃখ ত্যজিবারে মন হয় লো কখন,
হেরি দুখ যার সুখ কে জানে ভুলাবে ॥
লাজ ভয় সব যায়, প্রথম মিলনে,
মিলিলে পিরিতি হয় কত খেদ মনে,
ইথে যদি নাহি চেত তুমি কি করিবে ॥

সিন্ধু—জলদ তেতালা

আমি দুখী হলে যদি, তুমি সুখী হও ।
তথাপি আমা হইতে, সুখের উদয় ॥
দুখের উপরে সুখ, যার দুঃখ তার সুখ,
একে দুঃখী আরে সুখী, কেমনে, বুঝায়ে ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী

সদা সুখে থাক হে প্রাণ আমার বাসনা ।
আমার কারণে তুমি, ভাব না ভেবো না ।
তোমার কি ক্ষতি আমি পাইলে যাতনা ।
বুঝিলে আমার দুঃখ কখন হ'তো না ॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা

গোসা করো না প্রাণ আমার কি দোষ ।
গুরুজন ভয়ে মরি, তুমি কর রোষ ॥
পরান কাতর হয়, দেখিলে বিরস ।
তুমি ইহা নাহি বুঝ, খেদ হে অশেষ ॥

খাম্বাজ—তেতালা

বিরহেতে মরি হে বিধি, অনুকূল হইও
পঞ্চভূত পঞ্চস্থানে নিযুক্ত করিও ॥

যে আকাশে বাস তার, আকাশের ভাগ মোর,
এবে সে এই বাসনা, তাহাতে মিলায়ো ॥
পবন তার ব্যজনে, তেজ মিশুক দর্পণে,
জলে সেই জলে রেখো তার ব্যবহারিয়ো।
পদ বিরহণ যথা, পৃথ্বী-অংশ রেখো তথা,
ইহার অধিক আর যে হয় বুঝিও

খাম্বাজ—জলদ তেতালা

অতি সাধ ছিল হে প্রাণ, আমার হইবে।
কে জানে চাতুরী করি সতত জ্বালাবে।
আগে কি জানিব আমি, এমন করিবে।
আমার হৃদয়ে থাকি, আমারে ভুলাবে ॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা

মান-তাপে তাপিত প্রাণ, ছিলাম হে নাথ!
সমাদর কে করিবে, কুসঙ্গে মোহিত ॥
মান ভরে কে কাহারে, আদর করিত ।।
ইথে মন ভার এত, করা কি উচিত ।।

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

জানিলাম প্রেম প্রিয় আমায় যেমন।
তোমার হে হয় তারে, কর সদা জ্বালাতন ॥
ন র হুতাশনে তব, আছে দুই গুণ।
আমি হুতাশনে জ্বলি, জল কোথায় এখন ॥

আলাইয়া ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

কে ও যায় চাহিতে চাহিতে।
ধীর গমন অতি হাসিতে হাসিতে ॥
যতক্ষণ যায় দেখ না পারি সরিতে।
আঁখি মোর অনিমিষ হেরিতে হেরিতে ॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা

হইলাম তব বশ যা কর এখন।
বাঁচালে বাঁচাতে পার, বধ কে করে বারণ ॥

আপনার বশ আমি, নহি ত এখন।
যতন করিয়ে প্রেম, করেছি যখন॥

ঝিঁঝিট জলদ—তেতালা

একি ঝক্‌ঝকি রাত্রি দিন বুঝালে বুঝে না।
তোমা হতে আর কারে, আমার ভাবনা।
অমিয় ত্যজিয়ে বিষ, খায় কে বলনা।
আমার অমিয় পানে, নাহি কি বাসনা॥

গারা কাফি—আড়াঠেকা।

প্রাণ, সেই সে রসিক,
যে সুখ-সাগরে সদা বিহরে।
দুখ অভিমানী দেখ যার অনাদরে॥
পিরিতি পরম সুখ, যাহার বিচারে,
সদা সুধা রস পান সেই জন করে।
বিরস কখন নহে, হরিষ অন্তরে॥

গারা ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

কে আপন অধিক তোমার।
বুঝাইলে নাহি বুঝ, খেদ হে আমার॥
তোমার হইয়ে আমি, হইব কাহার।
সুধা ত্যজি বিষ খায় হয় কি বিচার

গারা কাফি—আড়াঠেকা

প্রাণ চাহ লো প্রেয়সী,
কমল নয়নে অধীন জনে।
মন ত্যজ হাস প্রাণ, বিধু বদনে॥
বিচ্ছেদ দুঃখেতে দুঃখী নহি কদাচনে,
পলকে হেরিলে পুনঃ সুখী হই মনে,
ইহাতে বিরস হলে, বাঁচিব কেমনে॥

গারা ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা।

আর আমারে কেন কর জ্বালাতন।
এমন দরশন হতে ভাল অদর্শন॥

যেমন তোমারে আমি করেছি সাধন।
তাহার উচিত ফল পাইলাম এখন ॥

গারা ঝিঁঝিট—হরি।

মননে নহে এত সুখ যত বাহ্য দরশনে।
যদি ইহা হতো, নহে কদাচিত,
বহিত সলিল নয়নে ॥
চাক্ষুষে হরিষ আঁখি, বচনে শ্রবণ সুখী
পরশে পরশ, লাভ কি অদৃশ
কীদৃশ না যায় কহনে ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী

এত ভালবাসা রে প্রাণ, ভুলেছ কি একেবারে
বোঝা গেল রীতি তব বিশেষ প্রকারে ॥
এত যে বাসিতে ভাল, ভালবাসা জানা গেল ॥
পেতেছিলে মায়াজাল, অবলা বধিবার তরে ॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

আমার কি হলো সই, ওগো ধর ধর।
বিরহ বাতাসে, সঘনে হুতাশে,
অঙ্গ কাঁপে থর থর ॥
পিরিতে বিমল সুখ, বিচ্ছেদে তেমতি দুঃখ,
সুখ আশা করি, এখন যে মরি,
তনু হলো জর জর ॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা

আমার কি অযতন প্রাণ তোমারে।
তুমি কি যতনাধিক করহে আমারে ॥
মুকুরে আপন মুখ, দেখায় যেমনি দেখ,
মনের মুকুর মন, নিরখ অন্তরে ।।

ভৈরবী—কাওয়ালী

হউক আমারে যত, করহ যতন।
তার সাক্ষী দিবানিশি, দহে মোর মন।

তোমার গুণের কথা অকথ্য কথন
অনল অন্তরে মোর, সজল নয়ন ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী

তারে ভুলিব কেমনে
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে, আপন জেনে ॥
আর কি সেরূপ ভুলি, প্রেম-তুলি করে তুলি.
হৃদয়ে রেখেছি লিখে, অতি যতনে ॥
সবাই বলে আমারে, সে ভুলেছে ভুল তারে,
সে দিনে ভুলিব তারে, যে দিনে লবে শমনে ।*

* এই গানটির নিম্নলিখিত কয়েকছত্র কোন কোন পুস্তকে হরিমোহন রায়ের রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ; যেমন—

'তারে ভুলিব কেমনে,
মন প্রাণ সঁপিয়াছি যার চরণে,
আর কি সে রূপ ভুলি, প্রেম তুলি করে তুলি,
হৃদয়ে রেখেছি লিখি, অতি যতনে ।।"

ঝিঝিঁট—মধ্যমান

সে কেন রে করে অপ্রণয়, ও তার উচিত নয় ।
জানি আমি তার সনে, কভু ত বিচ্ছেদ নয় ॥
কখন কি বলেছি মানে, আজ কি তা আছে মনে,
তা বলে কি মানে মানে, অভিমানে রইতে হয় ।
সখিগো আমার হয়ে, বল তারে বুঝাইয়ে,
পিরিতি করিতে গেলে, সুখ দুঃখ সব সয় ।।
দিনান্তে প্রাণান্ত হত, একবার যদি দেখা দিত,
তবে কেন অবিরত, হৃদয় মাঝে উদয় হয় ।*

* কোন কোনও সঙ্গীত-পুস্তকে এই গানটি শ্রীধর কথকের রচিত বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায় । নিধুবাবু ও শ্রীধর কথক, উভয়েই প্রায় সমসাময়িক । সুতরাং কাহার রচিত, এখন নিশ্চয় করা কঠিন । তবে বঙ্গবাসী অফিস হইতে সংগৃহীত 'শ্রীধর কথকের' গানের মধ্যে আমরা কিন্তু এই গান পাইলাম না ।

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়া

অনুগত দোষী হলে, তার দোষ নাহি লয়।
মহতেরই এই রীত আপন করিয়ে লয়॥
দেখ মলয়া গিরি, বেষ্টিত ভুজঙ্গ,
গরল সরল হয়, মহতেরি সঙ্গ,
চাঁদে যে কলঙ্ক আছে, ছেড়ে কি উদয় হয়॥

বেহাগ—আড়াঠেকা

তবে তার কে করে যতন।
বশীভূত হ'ত যদি আপনারি মন॥
প্রথম মিলন কালে, হাতে চন্দ্র এনে দিলে,
প্রেম-ফাঁসি গলে দিয়ে, পলায় সেজন॥

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা

প্রাণ কেন এত রোষ কর, অধীনী অবলা পর।
তুমি ধন মন প্রাণ, এই ভাব রাত্রি দিন,
অন্তরে হয় মোর॥
তোমা বিনে থাকি আমি, যেন শূন্যাকার।
দরশনে সচেতন, নিঃসন্দেহ হই তখন,
ভয় নাহি আর॥

দরবারী কানাড়া—জলদ তেতালা

কেন এমন মান করে তারে মন না করি বিচার
যাহার বদন, বিরস কথন,
দেখি যদি প্রাণ, হয় লো বিদার॥
প্রাণের অধিক যারে, সতত যতন করে,
তারে করি মান, যত দুঃখ প্রাণ,
তুমিও তো জান, বুঝাব কি আর॥

দরবারী—কানাড়া জলদ তেতালা

মন হরণ মন করহ যতন, বলি হে তোমায়।
নিলে এক গুণ, হইবে তো জান,
দিতে দুই গুণ না রবে কথায়॥

সকল ধন অধিক, মন ধন প্রিয় দেখ,
হরিলে সে ধন, এই সে কারণ,
তোমারে নয়ন, ছাড়িতে না চায় ॥

কানাড়া—আড়াঠেকা

এ রসে বিরস কেন, সরস বসন্তে।
মানশর কুহুস্বর, ভেদ কি কৃতান্তে ॥
মলয়া সমীর, বহে ধীর ধীর, জলায় জলন্তে।
ফুলবাস, করায় রোষ, মদন দুরন্তে ॥
থাকিলে অন্তর, জ্বলিত অন্তর,
কেবা করে শান্তে।
যামিনীর কামিনীর সুখ পায় কান্তে।

সুরট—কাওয়ালী

আমি হে তোমার প্রাণ, বুঝিছি মনের মত।
নহে কি সকলাধিক, যতন কর কি এত ॥
না দেখিলে জ্বালাতন, দেখিলে হরিষ মন,
যেরূপ যতন কর, কথায় কহিব কত ॥
মন দিয়ে পেলে মন, হলো ইথে লাভ জ্ঞান,
এমন সুজন সনে, থাকিতে সাধ সদত ॥

ভাটিয়ারী—জলদ তেতালা

না বুঝিয়ে প্রাণ, কেন কর এত অভিমান।
তোমার অধিক কারে, করি হে যতন ॥
ভুলিয়ে জলে আপনি, শীতল নহে সে জানি।
ঘুচাইয়ে ভ্রম দেখ, মনের সমান প্রাণ ॥

বেহাগ—জলদ তেতালা

কিসের কারণ বিধুমুখি, করিছ তুমি অরুণ আঁখি
তোমার বিরসে, আর কোন রসে,
হৃদিপদ্ম হবে বল সুখী ॥
তোমার চন্দ্র বদন, আমার চকোর মন,

ইহাতে অরুণ-বরণ নয়ন,
করি কর কেন এত দুঃখী ॥

কানাড়া—জলদ তেতালা

ভ্রমরা রে কেন মিছে, লাজ করিলে কি হবে
কখন না হয় মনে, স্বভাব ত্যজিবে ॥
অনেকের প্রাণ তুমি, দুখ কি বুঝিবে।
হইলে আমার মত, জানিতে হে তবে ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা

আপনার মত বিনে সুখী কে কোথায়।
মন মত হলে চিত, সুখ হয় কত মত,
বলা নাহি যায় ॥
যে যার আপন হয়, সে হয় তাহার ;
ভিন্নভাবে ভাব কোথা হয়েছে কাহার ;
স্বভাবে স্বভাব ভাব, সকলের এই রব,
সন্দেহ কি তায় ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা

অনর্থ চিন্তার্ণবে ডুবিলে।
পরেরে আপন ভাবি, পরান সঁপিলে ॥
নিত্য নিত্য করি মনে, মিলিব তাহার সনে,
নিকটেরে দূর বোধ, কাহারে করিলে ॥

বারোঁয়া—ঠুংরী

পিরিতের দুখ ভ্রম জ্ঞান সুখময়।
যাহার যেমন মন, তাহার ফল তেমন,
হয় হে উদয় ॥
প্রেম করি দুই জ্ঞান, থাকে যতদিন,
কখন সমুহ সুখী, কখন সু-দিন,
এক জ্ঞান হলে চিত, দুখ হয় কদাচিত
সুখ অতিশয় ॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা

মানেতে মনকে মিছে, দহন করিছ (প্রাণ) ।
না দেখে কমলমুখী, অলির কমল আঁখি,
কমল জীবন মন তাহা তো শুনেছ (প্রাণ) ॥
যাহার যেবা স্বভাব, তার কি হয় অভাব,
বৃথায় ভাবিছ ।
অন্য অন্য ফুলগণ, বলয়ে অলি রাজন,
সে অলি কমলাধীন, তুমি ত জেনেছ (প্রাণ) ॥

বেহাগ—জলদ তেতালা

অনেক দিবস পর মিলন হইল ।
বিরহ-বিষ-অনল, ছিল অধিক প্রবল,
তাহা যে শীতল হবে মনেতে না ছিল ॥
মিলন আশয়ে প্রাণ, ছিল যেঞি তেঁই প্রাণ,
তোমারে পাইল ।
কত সুখ হলো লাভ, কথায় কত কহিব,
আনন্দ সাগরে মন, নয়ন সজল ॥

বেহাগ—জলদ তেতালা ।

তারে বারণ কর সই, আসিতে এখানে
এমন সময় ।
যদি কোন জন, কহে কুবচন,
জ্বলিবে জ্বলিব তায় ॥
উভয়ের ভয় যায়, সে সময় আসিতে হয়,
আমার এ মত হউক সম্মত,
ভয়েরো কি থাকে ভয় ॥

বেহাগ—জলদ তেতালা

সখি কোথা পাব তারে, যারে প্রাণ সঁপিলেম ।
যাহার কারণে আমি, কলঙ্কী হইলেম ॥
পরান কেমন করে, রহিতে না পারি ঘরে,
সুখ-আশে দুখ-নীরে, এবে যে ডুবিলেম ॥

আগেতে না জানি এত, এমন করিবে নাথ,
জানিলে কি করি প্রীত, না জেনে মজিলেম ॥

বেহাগ—জলদ তেতালা

অধীনী জনে প্রাণনাথ, নিদয় হয়ে,
ছিলে হে কেমনে।
ও বিধুবদন না হেরিয়ে প্রাণ,
জলিত জীবন সঘনে ॥
শয়ন স্বপনে প্রাণ, কখন কি চিতে ;
অধীনী বলিয়ে মনে, নাহি কি করিতে ॥
একাকিনী নারী, থাকে কেমন করি,
নিবারি দুরন্ত মদনে ॥
এতদিন পর মোরে পড়েছে মনে,
তেঞি প্রাণনাথ বুঝি এসেছ এখানে,
ছিল হে জীবন, শুভ দরশন,
হইল নাথ তব সনে ॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা

পিরিতি কখন পারে কি প্রাণ করিতে গোপন।
মুদিত কমল, দেখিলে কেবল,
যখন উদয় অরুণ ॥
তিমির আলয় দীপ, দেখায় দেখ কিরূপ ?
তিমির কখন, উজ্জ্বলে বারণ,
করয়ে কে জানে, বলনা এখন ॥

বেহাগ জলদ—তেতালা।

সে জানে না, আমার মন, যেমন তার তরে।
জানিয়ে বুঝনা কেন, বিচ্ছেদের হুতাশন,
দহন করিবে মোরে ॥
তারে জেনে এই হলো, নয়ন সদা সজল,
কহিব কারে।
যারে কয় সেই জন, সুখ-দুঃখের কারণ,
সে বিনে সুখী কে করে ॥

ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতালা।

আমার মনের দুঃখ, আমি কারে কহিব।
ইহার উপায় কি, বিষ খাইব।
কি মকরপুরে গিয়ে শীতল হইব॥

বেহাগ জলদ—তেতালা।

ওষ্ঠাগত প্রাণনাথ, না দেখে তোমারে
স্বস্থানে যাবে কি বাহির হইবে,
বলনা আমারে॥
অধীনে সদয়, হলে ক্ষতি হয়, বুঝেছ অন্তরে।
ইহাতে কেমনে প্রবোধিবে মনে,
থাকি কি প্রকারে॥
অনুকূল বিধি, যদি প্রাণ নিধি,
দিলে হে আমারে॥
করিতে যতন, সংশয় জীবন, বলিব কাহারে॥

বেহাগ—একতালা।

নিত্য নিত্য করি মনে, বল খেদের কারণ,
তারে আর সাধিব না।
প্রভাত হইলে পুনঃ, কেমনে কররে প্রাণ,
আর সে ভাব থাকে না॥
হইয়ে আপন মন, হইল তার অধীন,
কি করি বলনা।
ইহাতে উপায় আর, থাকিলে দেখ আমার,
না হতো এত যাতনা॥

পরজ—আড়াঠেকা।

শুন সই মোর মন মজিল এখন কি করি।
পশ্চিমে অরুণোদয় হলে পাসরিতে নারি।
কুল শীল অভিমান, ত্যজিয়ে হলেম অধীন,
লোকের কথাতে, পারি কি ত্যজিতে,
ত্যজিলে তখনি মরি॥

পরজ—আড়াঠেকা

পড়িলাম আমি তাহার নয়ন-জলেতে।
শেষ ফাঁসি তাহে, দিয়েছে গলেতে ॥
যদি প্রাণপণ করি চাহি পলাইতে।
যাইতে না দেয় তার, ঈষৎ হাসিতে ॥

পরজ—জলদ তেতালা

দেখিবে আপনমত আপন জনে। (প্রাণ)
না বুঝিলে তব মত, মতাধীন হবে কেনে ॥
দৈবের ঘটনা যাহা, বল কে খণ্ডিবে তাহা,
কমলে কণ্টক আছে, মধুকর তা কি মানে ॥

পরজ জলদ—তেতালা

কেন লো প্রাণ নয়নে অরুণ উদয়।
তপন সবারে দহে, না দহে কমলে,
তব আঁখি রবি হৃদিকমলে জ্বলায় ॥
তব কেশ ঘন ঘন, শীতল করিত মন,
এখন তা নয়।
আজ ফণিময় হেরি, কাতর পরান,
নিকট না হতে পারি, দংশে পাছে ভয় ॥

পরজ—জলদ তেতালা

কেমনে রে প্রাণ বুঝাব, যেমন আমার মন।
জেনে যদি না জানিবে, কে জানিতে পারে,
বিষম হইল মোরে, করি কি এখন ॥
মোর মনে নিরন্তর, প্রাণ তুমি বাস কর,
না জান কেমন।
মন জ্বলয়ে যখন, তুমি নাহি জ্বল,
জ্বলিলে বুঝিতে তবে, আমি হই যেমন ॥

পরজ—জলদ তেতালা

কখন রে প্রাণ ভাবনা, আমি তোমার।
হৃদয়-সরোজাসনে, করিয়ে যতন,
তোমারে রেখেছি প্রাণ, দেখি নিরন্তর,

দেখিতে দেখিতে দেখ, অনিমিখ হয় আঁখি,
সুখ হে অপার।
পিরিতে মান মিশ্রিত, জানহ তাহা তো,
সে মান উদয় হলে, উভয়ে কাতর ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান

কি জানি কি ছলে ছিল ব'সে
আমারে ত্যজিবার আশে।
আমি ত জানিতাম ভাল, আমায় সে ভালবাসে ॥
অভিমান ছল পেয়ে, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে,
মনোমত ধন লয়ে, রয়েছে উল্লাসে ভেসে।
আমার মর্ম্মবেদনা,
সে কি তা জেনেও জানে না।
কিসে যাবে এ-যন্ত্রণা, তাই ভেবে মরি হুতাশে ॥

কালাংড়া—তেতালা

কে বলে সখী, সরোজে শশী নাহি পিরিত।
তার চাঁদমুখ নিরখিলে দেখ,
হৃদয় কমল হয় বিকশিত ॥
তপনে কমলে প্রীত, এ-নিয়ম অনুচিত,
অরুণ নয়ন, হেরে তবে কেন,
হৃদয় কমল হয় মুদিত ॥

ভৈরব জলদ—তেতালা

যেন ঘন হতে বাহির হতেছে শশী,
নিরন্তর ঐরূপ দেখি দিবানিশি ॥
অমিয় সমান স্বর, ইথে বুঝি শশধর,
মৃগ আঁখি শোভা তায় সৌদামিনী হাসি ॥*

* প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা রাধামোহন সেনের এইরূপ একটি গান আছে। ভাষা-ভাবে সে গানটি সম্পূর্ণ এই গানের অনুরূপ।

* ঠিক এই গানটি, একটি আধটি কথা পরিবর্তিত হইয়া শ্রীধর কথকের গানের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। গানটি কাহার রচিত, তদ্বিষয়ে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়। এইরূপে আরও অনেক গান নিধুবাবু ও শ্রীধর কথক উভয়েরই সঙ্গীত-পুস্তকে অবিকল দেখা যায়।

ললিত—আড়াঠেকা

দেখিতে দেখিতে কোথা, লুকাইল ওলো সখি।
আঁখি পালটিতে পুনঃ, তারে আর নাহি দেখি॥
ক্ষণে দরশনে আঁখি, কদাচিত হয় সুখী,
তৃষা অতিশয় হয়, মনে বুঝে দেখ দেখি॥

পরজ—জলদ তেতালা

আমারে কিছু বলো না সই,
মন মোর তার বশ হলো।
লোকলাজ কুলভয়, কোথায়ে রহিল॥
পিরিতি সুখের নিধি, অনুকুল দিলে বিধি,
এ যতনে যায় প্রাণ সেই বরং ভাল॥

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

এত দিনে মন বশ হইল নয়ন।
তার সে রূপ হৃদয়ে করেছে ধ্যান॥
বাহ্যে অদর্শনে দুখী, নহে কদাচন।
সদা মনযোগে তায়, করি দরশন॥

পরজ—জলদ তেতালা

এমন করো না প্রাণ, অধীনী জনের সহ।
নিতান্ত সে হল তব, তারে মিছে কেন দহ॥
অধীনে সদয় থাক, নিদয় হইলে দুখ,
এ দুখ মোচন করে, কোন জন আছে কেহ॥

পরজ—জলদ তেতালা

দেখিতে দেখিতে তোরে, অনিমিখ হয় আঁখি
বুঝাতে না পারি দেখ, হই আমি কত সুখী॥

ভাবনা রহিত মন, আমার হয় তখন,
মনপুরে মহানন্দ, আর কিছু নাহি দেখি ॥

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—তেতালা

রীতে রীতে চিতে চিতে, মিলিলে সে সুখ হয় ।
সুরীতে কুরীতে মিত্র হয়েছে কোথায় ॥
স্বভাবে অভাব ভাব, ভাব দেখি সে কিভাব,
ছাগে বাঘে সতাসতে কিসের প্রণয় ॥

পরজ—জলদ তেতালা

কেতকী এত কি প্রেয়সী তব মধুকর ।
নলিনী নিরাশ্রয়ে দহে নিরন্তর ॥
নাম তব রসরাজ, রাজার উচিত কাজ,
এই তোমার, অন্যেরে আপন জ্ঞান,
আপন অন্তর ॥

পাহাড়ী ঝিঁঝিট জলদ—তেতালা

বুঝিলাম এখন মনে, দুখিনী জনে
নিধি লাভ হবে কেনে । (সই)
সতত রাখিয়াছিলাম নয়নে নয়নে ।
তথাপি সে লুকাইল করমের গুণে ।
হৃদয়ে তাহার রূপ, হেরি লো মননে ।
সুস্থির কি হয় প্রাণ, চাক্ষুষ বিহনে

খাম্বাজ—মধ্যমান

মনের বাসনা সই, সেই সে জানে ।
কাহারে কহিব আর কেহ নাহি জানে ।
আপন নয়ন হয়ে, প্রবোধ না মানে,
বিরহ অনল অতি, বাড়য়ে রোদনে ।
অনল শীতল হয়, তার দরশনে ।
সেই নয়নের নীরে সময়ের গুণে ।

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

বারে বারে এবারে, আর আমি তারে
সাধিব না। (সই)
কতবার মনে করি, মনেতে থাকে না॥
এতদিনে না বুঝিলাম তাহার মন্ত্রণা
সে কি আমার হইবে, করিলে সাধনা॥

পাহাড়ী ঝিঁঝিট জলদ—তেতালা।

মনেতে বুঝিয়া দেখ, না দেখিলে তব মুখ,
রহা যাবে কেন। (প্রাণ)
দেখনা কান্দিতে হয়, হলে অদর্শন॥
দরশনে পুলকিত প্রফুল্ল বদন,
সকল রতন হতে, মন অতি ধন।
সে ধন তোমার কাছে তুমিও তা জান॥

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

নয়নের বাণ, কে বলিলে প্রাণ, দেখ নলিনীদল।
বলিতে পারিবে বটে, স্বভাব অনল॥
তেজেতে উৎপত্তি যার, দাহিকা শক্তি তাহার,
তপনের সখী বলে অধিক প্রবল॥
আর অপরূপ গুণ, কেহ জান কিনা জান,
কটাক্ষে বিরহানল করয়ে শীতল॥

পাহাড়ী—ঝিঁঝিট তেতালা

ঐ যায় সই, ডাকনা উহারে, মোর প্রাণ যায়।
মানেতে কহেছি কত, ফিরে নাহি চায়॥
কেনবা করিলাম মান, এখন যে যায় প্রাণ,
রতন যতন বিনে, থাকে কি কোথায়॥

কালাংড়া জলদ—তেতালা

জানি তুমি প্রাণ নিধি। (হে)
বিরস দেখিলে মুখ কতমত সাধি॥

সতত বাসনা মোর, কখন হয় না অন্তর,
অন্তরে হলে অন্তর, কেমনে প্রবোধি ॥

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

বিধি দিলে যদি বিরহ যাতনা।
প্রেম গেল কেন প্রাণ গেল না ॥
হইয়ে বহিয়ে গেছে প্রেম ফুরাইয়েছে,
রহিল কেবল প্রেমেরি নিশানা ॥

শ্যাম—জলদ তেতালা

কেমনে এলে অলিরাজ, এলে ত্যজিয়ে কেতকিনী
হইবে অনেক সুখ, মনেতে বুঝিয়ে
বুঝি প্রাণ, সঁপিলে তাহারে ওরে,
রোদিত কমলিনী সব ফুলে সমভাব,
তোমার বিচারে যদি প্রাণ।
বৃথায় নলিনী ভাবে, আপনি সোহাগিনী ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী

তাই কি মনে করে, মানভরে অভিমানে আছ।
জ্বলিয়ে বিরহানল, দাহন হতেছ ॥
যে দুঃখে পিরিত হয়, সকলি কি মনে রয়,
তাহলে কি বিচ্ছেদ হয় কার মুখে শুনেছ ॥

পূরবী জলদ—তেতালা

নিশা অবসানে আসি, রসরাজ বিরস কেনে।
আছি যতক্ষণ, হরিষ বদন, দেখিতে বাসনা মনে
সময়ে না এলে প্রাণ, অসময়ে আগমন,
তোমার কি দোষ, অনেকের বশ,
সহিল আমার প্রাণে ॥

পূরবী—ঢিমে তেতালা

চল সখি যাই যমুনা তীরে,
ঘন বরণ ঘন উদয় মনেতে।

না দেখি নয়ন, করিছে রোদন,
কি করে এখন, লোক লাজেতে ॥
অজ্ঞান-কলঙ্ক যার, দেখিলে কি থাকে তার,
লোক কলঙ্কেতে, কি করে তাহাতে,
মন যে সঁপিলে, সেই রূপেতে ॥

পূরবী—ঢিমে তেতালা ।

ঘন ঘন ঘনবরণ ধ্যানে, মম মনের মত
রহিল দূরেতে
আর অন্যরূপে, মজিব কিরূপে,
মজেছি স্বরূপে, সেই রূপেতে ॥
দেখিতে বরণ কাল, অন্তর করয়ে আল,
ঘুচাইয়ে ভ্রমে, কেহ ক্রমে ক্রমে,
মজে তার প্রেমে, পারে বুঝিতে ॥

পূরবী—জলদ তেতালা

কি সুখ পিরিতে শুন, প্রাণ সই,
না হলে মিলন ।
সে জন আমারে, না হেরে যাহারে,
সদত করি যতন ॥
তৃষিত চাতকী যেন, আশায়ে প্রাণ ধারণ,
তেমতি তাহারে, ভাবি হে অন্তরে,
তথাপি না রাখে মান ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী

পিরিতি তোমার সনে, রহিল মনে ।
কখন না পাসরিব, তোমায় জীবন মরণে ॥
কি জানি কি গুণে প্রাণ, বান্ধিয়াছ মম মন,
থাকিবে যে চিরদিন, সদা রাখিব যতনে ॥

পূরবী—জলদ তেতালা

সেই সোহাগিনী লো, যারে প্রিয় সতত চাহে ।
দুঃখিত কখন, নহে সেই জন, না বিরহে দহে ॥

মদন দাহন তারে, করিতে নাহিক পারে,
সুখের সাগরে, সদা বিরহে, না যাতনা সহে ॥

পূরবী—জলদ তেতালা

যতনে যে ধন সদা, করে উপার্জ্জন
কে কোথা দুঃখেতে ত্যজে, না দেখি কখন ॥
অনেক যতনে ফণী, মণিরে পাইয়ে,
শিরেতে ধারণ করে মনে নিরখিয়ে,
বিহনে এমন ধন, বাঁচে কি জীবন ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কমলিনী অধীনী তোমার শুন অলিরাজ
সদায় তোমারে, ভাবি হে অন্তরে,
এই মোর কাজ ॥
সদয় থাকহে নাথ, এই হয় মম মত,
নিদয় কখন, হয়ো না হে প্রাণ,
সুখেতে বিরাজ ॥

বারেঁায়া—ঠুংরী

আগে তারে দিও না রে মন।
পরে জানিবে—পর যে কেমন ॥
সখি সে নহে আপন।
সে শঠের শিরোমণি, আমি তারে ভাল জানি,
শঠের পিরিতি যেমন জলের লিখন ॥

বাহার—জলদ তেতালা

বিরস ত্যজিয়ে ওলো, হরিষে হাসনা।
গলিত কেশ নীরদ, তাহার আড়েতে চাঁদ,
লুকায়ে কেন বলনা ॥
ত্যজনা বিষম বেশ, করহ স্বভাব বেশ।
ঈষৎ হাসিয়ে প্রিয়ে, অভিমান বিনাশিয়ে,
প্রাণ সরসে মজনা ॥

বেহাগ—জলদ তেতালা

আমারে কি তার আছয়ে মনে।
মনেতে করিত যদি, তবে কি মরি হে কাঁদি,
নিরখিয়ে থাকি পথপানে ॥
তাহারে না দেখে, প্রাণ যেমন করে,
এ কথা কে বুঝিবে কহিব কারে,
কিবা রাত্রি দিন, তার প্রতি মন,
আমি যে কাতর সে কি জানে ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী

আর কি প্রাণনাথ যাইতে পারে গো সখি।
বান্ধিয়াছি প্রেমডোরে, রক্ষক তায় আঁখি ॥
হৃদি সরোজ-ভিতরে, লুকায়ে রেখেছি তারে,
বাহির কি করি আর, বুঝে দেখ দেখি ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা

কহিও সই এই বিবরণ মোর, প্রাণনাথে।
নয়নের বশ আমি, করি কি ইহাতে ॥
নয়নের বশ তুমি—নহ কদাচিতে।
বশ হলে তবে কেন, হইবে কান্দিতে ॥
ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়, তোমারে দেখিতে।
গেলে কি হইবে ভাল, হয় কি মতেতে ॥

বেহাগ—জলদ তেতালা

নয়ন প্রবোধ মানে কি প্রাণ, না দেখে তোমারে
একে তো নয়ন, তাহাতে শ্রবণ.
অমিয় বচন, চাহে শুনিবারে।
রসনা রসের আশ, পরশ চাহে পরশ,
নাসিকা সুবাস, সদা অভিলাষ,
বলিলাম বিশেষ, বুঝনা বিচারে ॥

বেহাগ—জলদ তেতালা

তুমি মোরে ভুলিলে ভ্রমরা রে
কি রসে মজিয়ে।
বিরহ আগুন, দিয়ে এই ধন,
রয়েছে প্রাণ প্রবোধিয়ে॥
নানা ফুলের ভ্রম সকলের সনে প্রেম,
নলিনী নীরেতে, তাহারে দেখিতে,
কদাচ মনে নাহি হয়ে॥

বেহাগ—ঢিমে তেতালা

আমি কি তোমার কেনা কেনা
এই জনরব, ঘরে ঘরে সব,
করিছে কে না॥
এ রবে নীরব আমি, মনে বুঝে দেখ তুমি,
তুমি যদি জানবে না, আমার নাহি ভাবনা,
বলিছে কি না॥

ভৈরবী—কাওয়ালী

এই কি মনে প্রাণ করিয়াছিলে,
জ্বালাবে বিরহানলে।
সাধের পিরিত, তোমার সহিত,
করিয়ে ভাসি, নয়ন-সলিলে॥
নয়ন অন্তর, থাকি নিরন্তর,
তোমার মতে বিচার করিলে॥

বেহাগ—জলদ তেতালা

বিরহ যাতনা, শুন রে সজনি, সহে না। (আর)
মন অতি চঞ্চল, নয়ন সজল,
তথাপি অনল নিবে না॥
হইবে কবে মিলন, হেরিব বিধুবদন,
ঘুচিবে যন্ত্রণা
উদয় হইবে সুখ, রবে না অসুখ,
এ কি পূরিবে বাসনা॥

বেহাগ—জলদ তেতালা

পিরিতি করি প্রাণ, এই লাভ হলো আমার।
দেখাইয়ে সুখ মুখ, দিলে দুঃখভার॥
অবলা সরলা আগে না করি বিচার।
মজিল দেখ বিনয়-ছলেতে তোমার॥

বেহাগ—জলদ তেতালা

আইলে হে অধীনী জন সদনে।
তোমার বিরহে প্রাণ, আছে কিনা আছে প্রাণ,
এই বুঝি দেখিবারে হয়েছে মনে॥
মনের মানস বিধি, পুরাইবে পাব নিধি,
হলো এত দিনে।
ভাগ্যগুণে যদি পুন, হইল সুখ মিলন,
বিচ্ছেদ না হয় যেন, সাধ এক্ষণে॥

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ মধ্যমান

চন্দ্রাননে কি শোভা, কমল নয়ন।
ভুরু ভৃঙ্গ ভঙ্গি করি, করে মধুপান॥
কেশ বেশ কি তাহার, কিবা নীরদ আকার,
মন শিখী তাহা দেখি, হরিষে অজ্ঞান।
শ্রবণে শোভে কুণ্ডল, চমকে অতি চঞ্চল,
কিরণে ঝলকে তার, দামিনী সমান॥

বেহাগ—জলদ তেতালা

গঞ্জনে নিরঞ্জন, হয়েছে নয়নে।
সেই নীর হার হতো, যদি হিংসা না করিত
কোন জনে॥
করিতে প্রেম ভঞ্জন, আছে কত শত জন,
ত্যজিতে অসত জন, বলে বিনে প্রয়োজন
প্রিয় জনে॥

সরফর্দা—আড়া

কোথারে চলিলে হে প্রাণ, মন মান ভরে ।
দুঃখের উপরে সুখ, দুখ দিয়ে মোরে ॥
যদি অনেক দিনান্তে, পাইলাম প্রাণকান্তে,
প্রাণ গেলে নাহি কয়, বল না কে কারে ॥
আপন ভাবিয়ে নাথ, অভিমানে কহি কত,
ইথে এত বিপরীত, ভাবিলে অন্তরে ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা

তোমারে কে জানে প্রাণ,
যে জানে সেই সে সুখী
তোমারে জানিতে, সাধ যায় চিতে,
কদাচিতে নহে সে দুঃখী ॥
তোমারে যে নাহি জানে,
তারে কেহ নাহি জানে,
জেনেছে যে জন, ভুলিতে কখন,
সে কি পারে নাহিক দেখি ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা

অহঙ্কার কারোপর, করিব কে সহে ।
যে করিল সোহাগিনী,
সেই বিনে আর কেহ নহে ॥
আপন নহে যে জন, তারে কিবা প্রয়োজন,
সেই জন প্রিয় জন, সুখে সুখী দুঃখে দহে ॥

বেহাগ—জলদ তেতালা ।

কি সন্দেহ কর প্রাণ নিঃসন্দেহ রহ ।
আর কাহারোপর আমার নাহি মোহ ॥
মোহরে করিয়ে দূর, নির্ম্মোহী নাম মোর,
দয়ার অধিক দয়া, তোমারে বুঝে লহ ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা

কখন যামিনী কামিনীমুখ চাহি কি রহে।
আমার যে মন, তোমার কারণ,
পথ চাহি পরান দহে॥
যামিনী থাকিতে কেন আনিতে সে দিবে প্রাণ,
তুমি জান ভাল, আমারে সকল
দুখ সহে, তারে না সহে॥

মূলতান—আড়াঠেকা

নয়ন নীরে কি নিবে মনের অনল।
সাগরে প্রবেশি যদি, না হয় শীতল॥
তৃষায় চাতকী মরে, অন্য বারি নাহি হেরে,
ধারাজল বিনে তার, সকলি বিফল॥
যবে তারে হেরি সখি, হরিষে বরিষে আঁখি,
সেই নীরে নিবে জানি, অনল প্রবল॥

মূলতানী—ঢিমে তেতালা

বোধ না হইলে ভ্রম, ঘুচিবে কেমনে॥
করিছ ক্রোধ অবোধ অবলা বচনে॥
বারণে অজ্ঞানে ভেদ, না হয় কথনে।
অঙ্কুশে উচিত হয়, সুচিত দুজনে॥

মূলতানী—ঢিমে তেতালা

অনেকের প্রাণ হে তুমি মধুকর।
কেমনে বলিব তুমি, কেবল আমার॥
আর কি বলিব প্রাণ, শরীর তোমার।
রাখিতে তোমার আছে, না রাখ তোমার

বেহাগ—কাওয়ালী

তুমি কি রাজা হলে প্রাণ, আমার দেশেতে।
ভব মতে মত্ত কেন, হয় হে করিতে॥
ভুলে যদি কর ক্রোধ, করিতে হয় অনুরোধ,

হইয়ে কাতর আর, হয় সে সাধিতে ॥
খেদ উপজিলে মনে, হেরি না হে নয়নে,
দেখিলে নয়ন মন, ভাসয়ে সুখেতে ॥

মূলতানী—ঢিমে তেতালা

নিদয় ঋতুরাজন বিরহী জনে।
দেশ ত্যাগিলে সুখ নাহি কাননে ॥
অন্য অন্য রাজা যত, সকলের এই মত,
পলাতকে নাহি দেয়, দুখ কখনে।
এ রাজার দূতগণ, একে এক শত জন,
মলয়া কোকিল ফুল, বান্ধে তিনগুণে ॥

মূলতান—একতালা

তুমি কি আমার মনের বাসনা জান না।
দিবানিশি তোমা বিনে, করি কি আর সাধনা ॥
কে দিলে শিখিয়ে প্রাণ এমন মন্ত্রণা।
নিতান্ত অধীনী জনে, দিতে কি হয় যন্ত্রণা ॥

বেহাগ—জলদ তেতালা

আমি কি তোমার অবশ কখন রে প্রাণ।
তবে যে বিরস দেখ, দুখে উপজয়ে মান ॥
তোমার অলির রীতি, একই সমান।
আমার ঐ রীতি হলে, করিতে সুরীতি জ্ঞান ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

একের দুখ আরে বুঝিবে কেন (প্রাণ)
আপনার বশ যদি না হলো আপন মন ॥
সাধ্য সাধকতা জ্ঞান আছে যতদিন।
দুই জ্ঞানে সুখ দুখ হয় হে নিতান্ত যেন ॥

সরফরদা—জলদ তেতালা

হৃদয় নিবাসী জনে, না হের নয়নে প্রাণ।
চঞ্চল চিত্ত কারণ,
যাহার তরে উচিত হয় অনুচিত মান ॥

যে যারে আশ্রয় দেয়,
সে তার সকলি সয়, এই ত বিধান।
আশ্রিত নির্দ্দোষ, তার প্রতি রোষ,
এ কোন্ পৌরুষ, বল কর কি প্রমাণ ॥

সর্ফরদা—জলদ তেতালা

রাগে অনুরাগ নাহি রহে রে।
বিরাগ সুখের লাগি, করি প্রাণ দহে রে ॥
মান উপজিলে মনে, মরণের ভয়;
না থাকয়ে অনুচিত, কহিবারে হয়;
যে হয় আপন জন, সেই সে তা সহে রে ॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা

দেখনা লো সই এমন সুদিন।
ডাকিছে কোকিল, মত্ত অলিকুল,
বিকসিত ফুল, মলয়া পবন ॥
মিলন শশী উদিত, বিচ্ছেদ তপন গত,
সুখী হৃদি পদ্মানন।
সহ প্রাণ কান্ত, যামিনীর কান্ত,
হলো উপনীত, বসন্ত রাজন ॥

রাগ সাগর—জলদ তেতালা

এমন কল্যাণ কর বিধি,
প্রাণনিধি না হয় নিদয়।
দিবানিশি এই অভিলাষ, থাক সে সদয় ॥
কত মত যতনেতে, রতন পেলেম হাতে,
অতএব শুন নয়নের অন্তর না হয় ॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

তবে প্রেমে কি সুখ হ'ত।
আমি যারে ভালবাসি, সে যদি ভালবাসিত ॥
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টকহীনে,
ফুল ফুটিত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত।

প্রেম সাগরের জল, তবে হইত শীতল,
বিচ্ছেদ-বাড়বানল, যদি তাহে না থাকিত ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা

শুনহে কহি, এই আমি চাহি,
বলো না কাহারে।
আমার পরান, করিয়ে হরণ,
রাখিয়াছ প্রাণ, নয়ন ভিতরে ॥
যে যারে নয়নে রাখে, সে তারে সতত দেখে,
সন্দেহ ইহাতে, নাহি কদাচিতে,
বুঝনা মনেতে, কি কব তোমারে ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা

কি করিব রে মন মোর বশ নহে।
যাবৎ তাহারে হেরিলাম, হারাইলাম লাজ ভয়,
বিরহে শেষে দহে ॥
জানি তোরে যা যাবে, যাহারে প্রাণ-সঁপিলে
সকল রজনী কামিনী বাসে,
রঙ্গরসে ভোর করিলে ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা

কেমন করি মোরে, ভুলি রহিলে একেবারে।
তুমি কি তা নাহি জান, যেমন আমার মন,
তোমার তরে ॥
দিবানিশি ভাসি আমি, নয়নের নীরে।
তুমি নাহি মনে কর, আমি হে অতি কাতর
বিরহে—শরে ॥

রামকেলী ললিত—জলদ তেতালা

আর কার নহি প্রাণ, তোরি রে।
তিলেক না হেরি যদি, বোধ হয় মরিবে ॥
কিরূপ আমারে তুমি, ভেবোনা কখন,

স্বরূপে এই জানিবে, তব বশ মন,
আর কিসে হবে সুখী, বল্না তা করিবে ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

তোমার বিরহ সয়ে, বাঁচি যদি দেখা হবে।
হেন জ্ঞান হয় প্রিয়ে, এ দেহে প্রাণ
আর না রহিবে ॥
আমি মাত্র এই চাই, মরি তাই ক্ষতি নাই,
তুমি আমার সুখে থাক, এ দেহে সকলি সবে।*
"কারণ প্রলয় জ্ঞান, পলকে নিশ্চিত প্রাণ,
অবশ্য অন্তর হলে প্রণয় হইবে তবে।"

বেহাগ—ঝিঁঝিট আড়াঠেকা

তুমি তার তরে হলে, সুধামুখি পাগলিনী।
সেই ধ্যান জ্ঞান, তার গুণ-জ্ঞান, দিবস রজনী ॥
অন্য অন্য বিষয়েতে, থাক তুমি অন্য চিতে,
তাহার প্রসঙ্গ হলে, নানারঙ্গ কুরঙ্গ নয়নী ॥

সঙ্কর তারণ—তালহরি

যে দিকে চাই, সেই দিকে পায়,
দেখিতে তোমারে।
কি জানি কি গুণে, ভুলালে নয়নে,
তোমার বিহনে, না দেখি কাহারে ॥
যখন থাকি শয়নে, তোমারে দেখি স্বপনে,
পুনঃ জাগরণে, নয়নে নয়নে,
থাকি সেই মনে, কি হলো আমারে ॥

* এই গানটি প্রসিদ্ধ জগন্নাথ প্রসাদ বসুমল্লিকের রচিত বলিয়া কোনও কোনও পুস্তকে দেখা যায়। তাহার তৃতীয় চরণে অতিরিক্ত এই দুইটী ছত্র আছে:—

ভৈরবী জলদ—তেতালা

হউক মেনে সই কহিও নিদয়ে,
সদয় হলে কি ক্ষতি।
দেখ চাতকিনী তৃষায়ে ব্যাকুল নবঘন প্রতি॥
চকোরী সুধার তরে, দেখ অভিলাষ করে,
বিধু কি বঞ্চনা করয়ে তাহারে, হয় কি এমতি॥

বেহাগ—আড়াঠেকা

মানিনী মানেতে রহিলে তুমি,
প্রাণ চলিল তব মান মোচন।
মানের যতন, অধিক রতন,
হতেছে বুঝি এখন॥
কি হইবে মান গেলে, এখন নাহি বুঝিলে,
তব দুখে দুখী, শুন ওলো সখি,
তেঁই সে বলি এমন॥

বেহাগ ঝিঁঝিট—তালহরি

সকল রতন, অধিক যে মন, (সই),
যতনে আমি দিলাম যাহারে।
বিহনে সে জন, আর প্রিয় জন,
বলিব বল কাহারে॥
ইহার অধিক হিত, হইবার যার মত,
অবুঝ বুঝিবে তাহারে।
যাহার কারণ, তৃষিত নয়ন,
অন্তর দহে অন্তরে॥

বেহাগ—আড়াঠেকা

অনেকের প্রিয় সে, আমারে প্রিয় বলিবে কেন।
এমন বাসনা, কেবল যন্ত্রণা, সদা জ্বালাতন॥
নয়ন-নীরেতে ভাসি, ভাবি তারে দিবানিশি।
আমার এ কাজ, সে তো অলিরাজ,
তার কি এখন॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী

মনে করি বারে বারে, নাহিক হেরিব তারে,
তার সনে আলাপের, নাহি কোন গুণ ॥
হেরিলে সে ভাব আর, না থাকে অন্তরে মোর,
পুলক নয়ন রসনা, কহিতে চায় শুনিতে শ্রবণ
মম হৃদি কম্প হয়, মনেতে কত উদয়,
না যায় কহনে, যদি কোন কথা কয়,
উত্তর না করি তায়, উপজয়ে মান,
নয়ন অন্তরে হয় করিতে রোদন ॥

মুলতান—আড়াঠেকা

নয়নের দোষ কেন,
মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নেরে দোষ কেন ।
আঁখি কি মজাতে পারে, না হলে মন-মিলন ॥
আঁখিতে যে যত হেরে সকলই কি মনে ধরে,
সেই যাকে মনে করে, সেই তার মনোরঞ্জন ॥

মুলতানী—জলদ তেতালা

পিরিতের গুণ কি কহিব তোমারে ।
শুনিলে বিস্ময় হয়, শরীর শিহরে ॥
প্রেমডোরে বদ্ধজন, ভ্রময়ে অন্তরে ।
এ গুণ যে বান্ধা নহে, নহে সে অন্তরে ।

বেহাগ জলদ—তেতালা

তাহার কারণে কেন, দহে মোর মন ।
যে রূপ তাহারে আমি করি হে যতন ॥
সতত চাতুরী সখি, করে সেই জন ।
সে বরং ছিল ভাল, নাহিক মিলন,
মিলয়ে এই সে হলো, সদা জ্বালাতন ॥

কালাংড়া জলদ—তেতালা

মৃগনয়নি তুমি ভাবিতেছ কেন এত ।
প্রফুল্ল বদনি তুমি, আজ কেন বিষাদিত ॥

হেরিলে তোমার মুখ, বিদরে আমার বুক,
বাঁচাও জীবন ওতো, হয়ে প্রাণ হরষিত ॥

মুলতান জলদ—তেতালা

আমি ত তাহার সই, সে জানে আমার মন ।
অযতনে কে কোথায়, কারে সঁপে প্রাণ ॥
মনে রাখিবারে মন, করে এক মন,
মনেতে মনেতে তবে, হয়লো মিলন ॥

মুলতান জলদ—তেতালা

অরুণ বরণ আঁখি, বিধুমুখি কেন ।
এরূপ তোমার, হেরিয়ে চকোর, করিছে রোদন ॥
এলায়েছে কেশ-ঘন, বহে-নিশ্বাস-পবন,
বাক্য-সুধা দান, করয়ে এখন, বাঁচাও জীবন ॥

মুলতানী—আড়াঠেকা

ও বিধুবদনি ধনি হেরনা নয়নে । (ওলো)
বধিলে কি লাভ তব, অনুগত জনে ॥
অনায়াসে চকোর তুষিতে সুধাদানে
আজ্ শশী মান-মেঘ, কিসের কারণে ॥

সুরট জলদ—তেতালা

মিলন কি সুখময়, হৃদয়ে উদয় হল
ধরিয়ে দুঃখের হাত, বিচ্ছেদ চলিল ॥
পিরিতের যত সুখ মনে মনে বুঝে দেখ,
আপার অতুল দুখ, প্রেম রস ফল ॥

মুলতান জলদ—তেতালা

আমার মন তোমার কারণ যেমন,
প্রাণ সেই জন জনে ।
দিবানিশি থাকি আমি, তোমার ধেয়ানে॥
তুমি তাহা নাহি জান, এই খেদ মনে,
মনের আকার যদি, না বুঝ বচনে,
আর কি সদৃশ আছে, বুঝাব সে গুণে॥

সুরট জলদ—তেতালা

প্রেম মোর অতি প্রিয় হে,
তুমি আমারে ত্যজো না।
যদি রাত্রিদিন, কর জ্বালাতন, ভাল সে যাতনা॥
সমূহ যাহার গুণ, কিঞ্চিৎ অগুণ,
কি দোষ বলিব তার, কিবা অপগুণ,
তব গুণ-কথা, কহিতে সর্ব্বথা, হতেছে বাসনা॥
অন্য অন্য চিন্তা যত, আমার আছিল,
তব হুতাশনে তারা, সব দাহ হল।
ইহার অধিক, আর কিবা সুখ, মনেতে বুঝনা॥

সুরট জলদ—তেতালা

সে-কি না জানে সই মনের বাসনা।
জানিয়ে দেখনা মোরে, মনে নাহি করে,
সদা দিতেছে যাতনা॥
আমার মত এমন, আছে তার কত জন,
কে করে গণনা।
আমি মরি তার তরে, সে ত নাহি হেরে,
তবু মন তো মানে না॥

সুরট—তেতালা

প্রিয় দরশন হলে সই,
অধিক সুখ কি আর।
চকোরীর সুধালাভ, চাতকীর জলধর॥
মণিরে পাইয়ে কত, সুখী হয় বিষধর।
যামিনীর অতিশোভা, উদয়েতে শশধর॥

সুরট—আড়াঠেকা

তুমি যে নির্দয় হবে প্রাণ,
কি লাভ তাহাতে (হে)।
সদয় হওনে ক্ষতি, বাসনা শুনিতে॥

তৃষায়ে চাতক দেখ, নিরখয়ে ঘন-মুখ,
বারিদান কি অগুণ, গুণ কি দানেতে ॥

সুরট জলদ—তেতালা

ঘুচিল বিচ্ছেদ দুখ হল সুখমিলন।
প্রেম রস পানে চিত, হইল চেতন ॥
বিচ্ছেদ-তিমিরে মন, করেছিল আচ্ছাদন,
মিলন অরুণোদয়, হইল এখন ॥

মূলতান—জলদ তেতাল।

তব আগমন শুনি, হে প্রাণ, নিরখিছিলাম পথ
এই এসে এসে বলি, চিত অতি চঞ্চলিত ॥
তোমারে হেরিয়ে আমি, হইলেম সুখী এত।
শূন্য দেহে এলো প্রাণ অধিক কহিব কত ॥

সুরট—আড়াঠেকা।

তারে এই কথা কহিও সই,
মোরে যেমন দেখিলে।
সদা তব নাম মুখে, ভাসে নয়ন সলিলে ॥
যদি মোর দুখ যায়, একবার দেখা দিলে।
ক্ষতি কি তোমার ইথে, অধীনে সদয় হলে ॥

সুরট জলদ—তেতালা

নয়ন রূপেতে ভুলে, মন ভুলে গুণে।
ইহার অধিক কেহ, শুনেছ শ্রবণে ॥
গুণের আদর যত, রূপের না হয় তত,
রূপেতে গুণ সংযোগ, রতন কাঞ্চনে ॥

সুরট—তালহরি

জানি নাথ যাও হে জানিলাম।
তোমার পিরিতে নাথ, প্রাণ হারালাম ॥
অবলা সরলা অতি, নাহি বুঝিলাম।
শঠের বিনয় বিষ, পান করিলাম ॥

ইমন্ কেদারা—আড়াঠেকা।

এ কেমন রীতি প্রাণ, নয়ন অন্তরে হয়,
অন্তরে অন্তর।
এই আসি বলে গেলে, আসিলে এতদিন পর।
আশায়ে আছিল প্রাণ, তাঞা হলো দরশন,
তোমার যে আগমন, মম মন অগোচর॥

সিন্ধু মধ্যমান

বিচ্ছেদ যাতনা অতিশয়, ভাত নয়গো।
সুখের জলধি-স্রোত, নিরবধি বয়গো॥
সদা নেত্র উন্মীলনে, হেরি সে মনোরঞ্জনে
প্রতি পলক পতনে, অঞ্জনে মিশায় গো।
যখন থাকি নিদ্রিত, স্বপনে প্রাণ পুলকিত,
সে হ'য়ে মনে উদিত, যেন কথা কয়গো॥

সিন্ধু মধ্যমান্

যার মন তার কাছে, লোকে বলে নিলে নিলে।
দেখা হলে জিজ্ঞাসিব,
সে নিলে কি আমায় দিলে॥
দৈবযোগে একদিন, হয়েছিল দরশন,
না হতে প্রেম মিলন,
লোকে কলঙ্ক রটালে॥ *

সিন্ধু—আড়াঠেকা

নয়ন-ঘরে তোমারে, রাখিব কেমনে।
বিষম বিরহানলে, উর সে সঘনে॥
হৃদয় কমলে থাক, দুখ-মুখ নাহি দেখ,
অনল বেষ্টিত তাহে, হয়েছে এখানে॥

সিন্ধু ভৈরবী—ঢিমে তেতালা

দেখনা সই কত সুখী হই, দেখিলে তাহারে।
অদর্শনে হুতাশন, জলয়ে অন্তরে,

* এই গানটি কোন কোন পুস্তকে শ্রীধর কথকের রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা শ্রীধরের সঙ্গীত পুস্তকে খুঁজিয়া পাইলাম না।

চক্রবাক চক্রবাকী, নিশিতে একত্র দেখি,
তাহার অধিক সুখী, বুঝিলাম বিচারে ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা

তুমি জান আমার যতন, যেমন তোমারে।
আপন জানিয়ে মন, সঁপিলে আমারে ॥
প্রাণপণে তব মন, করি লো আমি যতন,
ইহাতে অন্যথা প্রাণ, ভেবো না অন্তরে ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা

দেখনা সই, প্রাণনাথ বই, করি কি এখন ॥
প্রবল মদন মোরে, করিছে দাহন ॥
আমার দুখেতে দুখী, নহে সে কখন।
তাহার সুখেতে সুখী, হই সর্ব্বক্ষণ।
রতিপতি করে মোরে, করি সমর্পণ।
কামিনী সহিত সুখে, মজিল সে জন ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা

হের ভ্রমরে ও কমলিনি।
মধুকর কাতর প্রাণ, হেরি বিবাদিনী ॥
দেখনা স্বভাব গুণে, ফিরে নানা ফুল বনে,
দিবানিশি তব ধ্যানে, থাকি বিনোদিনী ॥

সিন্ধু কাফী জলদ—তেতালা

আমি জানি তোমার যতন,
এমন কে জানে। (প্রাণ)
প্রাণ সঁপিলাম আমি, এই সে কারণে ॥
তুমি মোর মনোমত, আমি তব মত-মত,
হয় কি আর মত লোকের বচনে ॥

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা

আসিব না বলিলে কেন প্রাণ।
এখন বলিলে বটে, হরিয়াছ মন ॥

পাছে ফিরে দিতে হয়, বুঝি হইয়াছে ভয়,
যায় যায় যাক্ প্রাণ, বলো না এমন ॥

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা।

কারে এত করিবে যতন, যেমন তাহারে।
তার এই রীতি সই, মনে নাহি করে ॥
আমি মরি তার তরে, সে নাহি হেরে আমারে,
নিরখিয়ে পথ আঁখি ভাসয়ে নীরে।
সে ভ্রমে এমত কহিতে বুক বিদরে।

সিন্ধু কাফী—তেতালা

তারে দেখিতে এত সাধ কেন।
তিলেক না হেরি যদি, সজল নয়ন ॥
আভরণ করিয়াছি, লোকের গঞ্জন
তাহার কারণে মরি, সে নহে আপন ॥
তাহার রীতের কথা অকথ্য-কথন।
তবে যে ভুলেছে মন, জানয়ে কি গুণ ॥

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা।

কি আর অদেয় আছে প্রাণ,
তা দিতে নাহি কাতর।
তুমি কি তা নাহি জান, দিয়াছি আপন মন,
থাকে যদি দিব আর ॥
তোমার মনের মত, মত হে আমার।
ইহাতে অন্যথাভাব, কর কেন অনুভব,
ভাব যে যার সে তার ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা

জানি যাও হে, ও মধুকর।
যথা মধু মিলয়ে প্রাণ, বশ হও তার ॥
অরুণ উদয় যদি, নাহি করিতে বিধি,
তবে কি মরি হে কান্দি, অধীনী তোমার।

ভৈরবী জলদ—তেতালা

তোমার দেখা দিতে বল, এত ক্ষতি কি এখন।
কি লাভ ছিল যখন, প্রথম মিলন।
কতেক মিনতি করি, আমার হাতেতে ধরি,
কহিতে তখন।
তিলেক না হেরি যদি, না বাঁচে জীবন॥

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা।

মিলনের সাধ বুঝি নাহিক তাহার।
হইলে যাতনা কেন হইবে আমার॥
তার প্রতি যত আশা, আছয়ে আমার।
জানিয়ে অনুচিত, করয়ে ব্যভার॥
বিচ্ছেদেতে প্রাণ মোর দহে অনিবার।
তার বোধ হবে কেন, অনেক যাহার।

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ মধ্যমান

এই কি তোমার প্রাণ, করিতে উচিত।
তারে কি জ্বালাতে হয়, যে নহে তব অমত॥
কিবা রাত্রি কিবা দিন, যে তব আশ্রিত।
তার আশা পূরাইতে, নিদয় কেন হে এত॥

সিন্ধুকাফী—জলদ তেতালা।

দেখ দেখি কতরূপ, করিতে যতন।
এখন কি রাজা হলে, ছিলে না তখন॥
লইয়ে আমার মন, দিলে হে আপন মন,
এবে সেই মন চুরি করি কারে দিলে,
কোথা মম মন॥

কালাংড়া—আড়াঠেকা

সে পুরিলে বল সাধনা কে করে।
যতন অধিক থাকে, আশা নাহি পুরে॥

তৃষায়ে ব্যাকুল জন, জল জল করে।
তৃষাহীন জন নাহি যায় সরোবরে।।

সিন্ধু কাফী—ঢিমে তেতালা

পিরিতি কি হয় যায়, কাহার কথায়।
উভয় মন সংযোগ, নয়ন কারণ তায়।।
পিরিতের গুণাগুণ, করে যে জানে সে জন,
অন্য জন বৃথা কেন, তাহারে বুঝাতে চায়।।

সিন্ধুকাফী—ঢিমে তেতালা

অতিশয় সাধ করি, এই তো হইল।
সতত কাতর প্রাণ, নয়ন সজল।।
পিরিতি রতন লাভ, হবে আশা ছিল।
তা না হয়ে মোর মন ধন হারাইল।।

সিন্ধুকাফী—ঢিমে তেতালা

হেরিয়ে কমল কেন, প্রকাশে কমল।
জানিতেম তপন হেরি, বিকসে কমল।।
তার সাক্ষী দেখ তব, বদন কমল।
হেরিলে প্রফুল্ল মন, হৃদয় কমল।।

সিন্ধুকাফী—ঢিমে তেতালা

প্রবোধ কি মানে আঁখি, না দেখি তাহারে।
বুঝালে বুঝিবে কেন, তার মত দেখে কারে।
মন নয়ন সংযোগ, তারে দেখিবারে।
নিবৃত্তিরে নাহি দেখে, থাকে প্রবৃত্তির ঘরে।।

সিন্ধুকাফী—ঢিমে তেতালা

আমি কিলো তাহারে, সাধিতে যতন করি।
সব ধনাধিক মন করেছে চুরি।।
মিছে অনুযোগ কর, সকলি বুঝিতে পার,
আপনার বশ নহে, ইথে কি করি।।

সিন্ধু কাফী—ঢিমে তেতালা।

মনে মনে উপজিল ভয়ে তা নিবারি।
মম বিরসে বিরস. পাছে তারে হেরি॥
যেরূপ যতন তারে, বুঝাতে না পারি।
মণির কারণে যেন, হরি হরি হরি॥

কালাংড়া—একতালা।

সুধামুখি তোমার নয়ন অমিয় বরিষে।
কটাক্ষে জীবন পায়, বিরহ-বিষে॥
কেমন কুরঙ্গ আঁখি, কত রঙ্গ করে দেখি,
কখন হানয়ে বাণ, কখন তোষে॥

সিন্ধুকাফী—ঢিমে তেতালা।

তারে সাধি লো যত, তত জ্বালায় আমারে।
যেরূপ খেদ ইহাতে, কহিব কাহারে॥
এত দুখে মন তবু, ভুলিতে না পারে।
অবশ হইয়ে আশা, মজালে আমারে॥

কালাংড়া—একতালা।

ওরে তোরে দেখিতে নয়ন পাগল কেন।
এই বোধ হয় মোর, জান কি গুণ॥
যদি নিরন্তর দেখি, তৃষাহীন নহে আঁখি
না দেখিলে দেখ দেখি, কি দুখী প্রাণ॥

সিন্ধু কাফী—একতালা

তুমি আর বলো না আমারে, তুমি লো আমার
তোমার হইলে তুমি, হইতে আমার॥
তবে নাহি জ্বালাইতে, উচিত ইহার।
অধীনী জনের সহ এরূপ ব্যবহার।
কে কোথায় করে বল, দেখহ কাহার॥
দুখেরে করিয়ে কোলে,

ভাসয়ে সুখ-সলিলে,
অনল শীতল হয়, তাহার তখন ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা

আমি আর পারিনে সাধিতে, এমন করিয়ে
কত মত কহিলাম, মিনতি করিয়ে ॥
তাহার কি করি বল, না শুনে শুনিয়ে।
যত দুঃখ মোর সখী, তাহার লাগিয়ে ॥
বৃথায় কি ফল বল, সে কথা কহিয়ে ॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা

মান ভয়ে ভয় করিছ কেমনে।
অমিয় সমান, এমন বচন, না যায় সহনে ॥
মানেতে মনেরে দহে তাহাও তোমায় সহে,
মিনতি আমার, বোধ হয় শর,
বল কি কারণে ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াঠেকা

ঐ দেখনা লো সই, আসিছে হাসিতে
মোর মনোরঞ্জন।
দেখ যাহার কারণ, ওষ্ঠাগত মোর প্রাণ,
তার দরশনে কি করিবে গঞ্জন ॥
প্রতিপদ অর্পণে, লোমাঙ্ক হরিষ মনে,
দুখ হলো ভঞ্জন
আলিঙ্গন করিবারে, কুচ ভুজ নৃত্য করে,
নয়ন রাখিতে চাহে, করি অঞ্জন ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা

আমার নয়ন মানে না,
বল বুঝালে কি হবে সই!
তুমি বল সে আসিবে,—আমি বলি কই।

বিলম্বের নাহি গুণ, করিতে হয় গমন,
গিয়ে দেখি তুমি বলো,—তব প্রাণ ওই ॥

সোহরাই বাহার—ঢিমে তেতালা

সুধামুখি ! মুখ বিরস করো না !
বিরস বিষেতে, না পারি জ্বলিতে,
তুমি তা বুঝ না ॥
অমিয় আসক্ত জন, গরল খাইবে কেন,
সুধা কর দান, বাঁচাও জীবন,
অধীনে বধো না ॥

হাম্বির—আড়াঠেকা

তাহারে কি ভুলিতে পারি ।
যাহারে আমি সঁপিলাম মন ॥
দেখিতে যার বদন, অতি কাতর নয়ন,
শুনিতে বচন-সুধা শ্রবণ তেমন ।
দেখিলাম কত মত, নাহি দেখি তার মত,
সে জন এমন ॥
যদি তার বিরহেতে, সতত হয় জ্বলিতে
জ্বলিতে জ্বলিতে হবে নির্ব্বাণ কথন ॥

সোহরাই বাহার—জলদ তেতালা

তোমারে আমার এত সাধিতে হইল । (প্রাণ)
সাধিলে করিব মান,—মোর মনে ছিল ॥
বাসনার বিপরীত আমারে ঘটিল ।
তবু কি তোমার সাধ, ইথে না পূরিল ॥

সোহরাই বাহার—জলদ তেতালা

কুরঙ্গ নয়ন কি রঙ্গ করিল ।
সে রঙ্গ প্রসঙ্গে কত রঙ্গ উপজিল ॥
কথন চঞ্চল, কর দরশন, বদন কমল ।
হেরিতে হৃদি পুলক, কহিতে অধিক সুখ,
কথন চকোর, সহ শশধর, কমলে কমল ॥

সোহনী বাহার—জলদ তেতালা

তোমার গুণের কথা কি কব,
কহিতে প্রফুল্ল বদন।
উদয় যাহা মনেতে, শুনি তোমার মুখেতে,
আর ইহা হ'তে আশ্চর্য্য কেমন॥
অতএব প্রিয়জন, তোমা বিনা আর কোন,
আছে মোর প্রয়োজন।
জনরবে কিবা ভয়, তুমি থাকহ সদয়,
হয়ো না নিদয় এই নিবেদন॥

সিন্ধু খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা

পিরীতি রতন নিধি পাইল যে জন।
তাহার মনের মত না হ'বে কখন॥
দুঃখেরে করিয়ে কোলে ভাসয়ে সুখ-সলিলে
অনল শীতল হয় তাহার তখন॥

বাগেশ্রী জলদ—তেতালা

এতদিন পরে নিবিল আমার মনের অনল সখি
দেখ যতদিন, ছিল দুই জ্ঞান, সতত ঝুরিত আঁখি
ভাবিয়ে তাহার রূপ, আমি হলেম সেইরূপ,
কুমীরকে আরশুল ভেবে এই হলো,
সে ভয়ে—এ সুখে দেখি॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান

আমার কি অযতন প্রাণ তোমারে।
তুমি কি যতনাধিক করহে আমারে॥
মুকুরে আপন মুখ, দেখায় যেমন দেখ,
মনের মুকুর মন, নিরখ অন্তরে॥

ইমন ঝিঁঝিট জলদ—তেতালা

তুমি মোর মত প্রাণ হইতেছ কেন।
বিচ্ছেদে কাতর আমি, তুমিও তেমন

বুঝিয়ে তোমার দুঃখ, দুখের উপর দুঃখ,
এরূপ হতেছে বোধ সংশয় জীবন ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী

মনের যে আশা যদি তাহা না পূরিত।
তবে কি পরাণ কেহ রাখিতে পারিত ॥
দেখনা চাতকী ঘন, দিবানিশি করে ধ্যান,
বারিদানে তোষে তারে, না রাখে তৃষিত ॥
তার সাক্ষী প্রদীপ পতঙ্গ আশ্রিত,
হইয়ে আগেতে দেখ হয় প্রজ্জলিত ॥
তার আশা পূরাইতে পতঙ্গ পুলকচিতে,
আপনি জ্বলয়ে তাতে, রাখিতে পিরীত ॥

গুজ্জ´রী টোড়ী—জলদ তেতালা

তোমার নয়ন রক্ষক আমার ও মৃগনয়নি।
মৃগের গমন দ্রুত, আমি পলাইব কত,
পথ না পাই ধনি ॥
তাহার সহিত হাসি, দেখ আর কেশ ॥

দেওয়ান ব্রজকিশোর

ব্রজকিশোর রায় দেওয়ান মহাশয় রঘুনাথ রায়ের পিতা। তিনি বর্দ্ধমান রাজ্য সরকারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ব্রজকিশোর পরমধার্মিক ও কালীভক্ত ছিলেন। গীত রচনায় তাঁহার চমৎকার পারদর্শিতা ছিল এবং তিনি দেবদেবী বিষয়েই অধিকাংশ গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। পিতা ব্রজকিশোরের সমস্ত সদ্গুণই পুত্রের অন্তরে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। এই সঙ্গে তাহার রচিত একটি গীত সন্নিবেশিত হইল।

আড়ানা—তেতালা

অভয়ে ব্রহ্মময়ী ভবদে ভবানী
ভীত ভয়নাশিনী ॥
ভজন বিহীন জনে।
কর কৃপা ওগো মা তারিণী ॥
হৈমবতী হর ঘরণী

হয়তি দুর্গতি দুর্গে দুঃখনাশিনী মহিষাসুরমর্দিনী
মহেশ্বরী মম মন মানস পূর্ণকারিণী।
করুণাময়ী কাত্যায়নী
কমল ভৈরব-নাদিনী
বিমলা পার্বতী মহেশ্বরী পরম পদদায়িনী ॥
সর্বাণী সর্বেশ্বরী শক্তি প্রকৃতি সাবিত্রী।
দ্বিজ ব্রজকিশোর বলে
ভবার্ণব জলে,—
তারিতে তারিণী চরণ তরণী ॥

দেওয়ান মহাশয়

(জন্ম—১১৫৭ ; মৃত্যু—১২৪৩ সাল ১৯শে ভাদ্র)

বর্দ্ধমান, কালনার সন্নিকটবর্তী চুপী গ্রামে ১১৫৭ সালে রঘুনাথ রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ব্রজকিশোর রায়। ব্রজকিশোরের দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের তিন পুত্র। তন্মধ্যে রঘুনাথ মধ্যম। ব্রজকিশোর বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। চুপীর রায়বংশ বর্দ্ধমান রাজবাড়ীতে বংশ-পরম্পরায় বহুকাল হইতে এই দেওয়ানী পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কার্য করিয়া আসিতে-ছিলেন। ব্রজকিশোরের মৃত্যুর পর রঘুনাথ এই দেওয়ানী পদপ্রাপ্ত হন। পরে তিনি বর্দ্ধমানে দেওয়ান মহাশয় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সেই হইতে সারা দেশে তিনি দেওয়ান মহাশয় নামেই সমধিক পরিচিত।

বর্দ্ধমানে পিতার কাছে থাকিয়া সংস্কৃত ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করিতে করিতে রঘুনাথ অল্পদিনের মধ্যেই এই দুইটি ভাষাতে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই পরমার্থ চিন্তায় এবং সেই বিষয়ে সঙ্গীত রচনায় রঘুনাথের বিশেষ আসক্তি দেখা যাইত। যখন তিনি দেওয়ানী পদপ্রাপ্ত হন, তখন মহারাজ তেজশচন্দ্র বর্দ্ধমানের অধিপতি। সঙ্গীতে দেওয়ান মহাশয়ের বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া মহারাজ তেজশচন্দ্র দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ হইতে ওস্তাদ আনাইয়া রঘুনাথ রায়ের সঙ্গীত শিক্ষার রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

দেওয়ান মহাশয় প্রতিদিন অতি অল্পক্ষণই দেওয়ানী কার্যে মনোনিবেশ করিতেন। পরন্তু তাঁহার অধিকাংশ সময়ই ধর্মকার্য্যে ও সঙ্গীত চর্চ্চায় অতিবাহিত

হইত। তিনি বহু গীত রচনা গিয়াছেন। তাঁহার রচিত সমস্ত গীতই দেবদেবী বিষয়ক। অন্য ধরনের রচনা তাঁহার আছে বলিয়া জানা যায় না ভণিতায় অকিঞ্চন কথাটি প্রায় প্রত্যেকটি গীতরচনাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে রঘুনাথ প্রত্যহ প্রাতঃকালে দেবী বিষয়ক অন্ততঃ একটি গীত রচনা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তাঁহার রচিত কৃষ্ণবিষয়ক গীতও অনেক আছে। ১২৪৩ সালের ১১শে ভাদ্র ৮৬ বৎসর বয়সে ভগবদ্ভক্ত সুকবি দেওয়ান মহাশয় পরলোকগমন করেন। তাঁহার রচিত কিছু গীত এই সঙ্গে সন্নিবেশিত হইল।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা

হে ভগবতি সতি! প্রজাপতি দুহিতে
কোটী উড়ুপতিখিনি, শ্রীমুখের জ্যোতিঃ,
গুণাতীত গুণবতী প্রধানা শকতি,
ওমা, আমি জড়মতি, কিবা জানি স্তুতি,
গতিহীন অকিঞ্চনে, তুমি মাত্র গতি॥

যোগিয়া—তেতালা

মহিষমর্দ্দিনী রূপে ভুবন করো উজ্জল,
অমল কমল দল, নিন্দিত চরণ-তল,
শশধর-নিকর নখররূপে প্রকাশিল॥
রতন নূপুর সাজে কটিতটে কিঙ্কিণী
বাজে,
বিরাজে যোগিনী মাঝে করি কুতুহল,
মৃদুহাস সুধাভাব সুরনর-ত্রাস-নাশ
এই অকিঞ্চন আশ দেহি শ্রীচরণে স্থল।

বেহাগ—একতালা

কিরূপ অনুপমা মা মহেশ
মনোমোহিনী।
কলঙ্করহিত পরিণত শতবিধু-নিন্দিত
বদনী॥
যেরূপ কিরণে হয় হীরকাদি রত্ন ভূষণে
ভূষণী;
মঞ্জীর চরণে বাজে রুণ্ ঝুনু মণি মুকুতা
গাঁথনি।
দশকরা বিবিধপত্র ধরা, সদলে দনুজ
বিনাশ করা
পদভরে কাঁপে ধরা দেবদেবী দেয়
জয়ধ্বনি,
আদ্যাশক্তি তুমি ভগবতী, কে জানে
মাত স্তুতি,
আকৃত কুমতি অকিঞ্চন প্রতি, প্রসীদ
বিশ্বজননী।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াঠেকা

নিবিড় নিতম্বিনী কে রমণী সমরে।
অম্বর করেছে আলো নেচে এলো-
চিকুরে॥
বয়সে বালা ষোড়শী, মুখে মৃদু-মৃদু হাসি,
উদয় হয়েছে শশী, আসি পদ-নখরে॥
বাম করে অসি ধরি, রণমাঝে দিগম্বরী,
নীচে অসুর সহকারী, মগ্না হয়ে রুধিরে।

আড়ানা বাহার—আড়াঠেকা

মা, কে বিহরে সমরে কালকামিনী।
বিবসনা ত্রিনয়নী অম্বুদবরণী।
ঘন নহু নহুঙ্কার ধ্বনি, বিকট ব্যাপ্তাননী,
মহাঘোরে ঘোর নিনাদিনী।
সব শিশু কুন্তল, লোলশ্রুতি জল
দনুজমুণ্ডমাল, আপদলম্বিনী,
হরহৃদি পঙ্কজোপরি, চরণ সরোজ হেরি,
অকিঞ্চনে কৃতার্থ কারিণী॥

কেদারা—আড়াঠেকা

কে রণতরঙ্গে উলাঙ্গী ভঙ্গিনী।
কুরঙ্গনয়নী নীরদাঙ্গী শনচারিণী॥
পদভরে কাঁপে ধরা, করে অসি?
মুণ্ডধরা
প্রত্যঙ্গে রুধিরধারা, নরশিরহারিণী॥
এ কারণ অসহনে, করিছে ক্ষয় রিপুগণে
বিকট দশন বদনাতি বিস্তরিণী;
রূপ হেরি অকিঞ্চন, চরণে সঁপেছে মন,
দীনে কুরু কৃপা কালি, কাশী কলুষ-
নাশিনী॥

ইমন্‌কল্যাণ—একতালা

হর উরোপরে কে বিহরে ললনা,
তিমির বরণা দিগবসনা।
করে করবাল, বালশশী শোভে শিরে;
লোল রসনা অতি বিস্তৃত বদনা॥
অসংখ্য দনুজদল সমূলে বিনাশ হল,
শোণিত হিল্লোলে মহী প্রায় যে মগনা;
মম হৃদি-পদ্মাসনে বিশ্রাম লহ শ্যামা,
অকিঞ্চন দীনের এই নিতান্ত কামনা॥

সোহিনী—আড়াঠেকা

নবাম্বুবরণী কার কামিনী নাচে উলঙ্গিনী?
বিকট অট্টহাস, নাহি লাজ ভয় লেশ,
একি বেশ এলোকেশ রণ উন্মাদিনী?
নারীর এমন সাজ, অসম্ভব মহারাজ!
যুদ্ধে নাহি কাজ, বুঝি হবে
সর্ব্ব-সংহারিণী;
কহে অকিঞ্চনে কি ভাবরে দৈত্যগণে?
যে ভাব ভাব মনে, সেই ভবেভাবিনী।

সিন্ধু—ঠেকা

দুর্গে-দুর্গতি হারিণী তারিণি?
অনুগত প্রণত, ভকত-হিত কারিণি!
চিন্ময়ি নির্গুণানন্তগুণ ধারিণি!
অপার মহিমা বেদাগমে তব নাহি সীমা;
আমি মূঢ় জ্ঞানহীন, তত্ত্ব কি
জানি?—মা!
স্বগুণে করুণাদানে হইও গো
চরমে অকিঞ্চনে চিত্তকারিণী॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

বুঝনা মন বুঝাইলে, পরামার্থ না
চিন্তিলে।
দিনান্তে মনের ভ্রান্তে, কালী বলে না
ডাকিলে।
জঠরস্থ ছিলে যোগী, জন্ম মাত্র
কর্ম্মভোগী;
শ্যামানামামৃত ত্যাগী, বিষয়
সম্ভোগী হলে!
অকিঞ্চনের সম্মতি, ত্যজ কামাদি
সংহতি;

ছয় জনার ছয় রীতি, সম্প্রতি তোমায়
মজালে।
ইন্দ্রিয়-বলে ইন্দ্রত্ব, পেয়ে হয়েছে উন্মত্ত,
পড়ে রবে সে ইন্দ্রত্ব, দশেন্দ্রিয় অবশ
হলে॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা

কবে সে দিন হবে তারিণি মোরে
তরিবে ;
অনন্যশরণ জনে, চরণে রাখিবে শিবে।
রসনায় বলিবে তারা নাম মধুক্ষরা,
তারা নাম বিনে শ্রবণ, আর না শুনিবে॥

কালাংড়া—একতালা

ত্রিলোচন! দুঃখ মোচন, করহে
করুণা করে।
বিদায় দাও আমায় অভয়া, লয়ে যাব
গিরিপুরে॥
পাষাণী হয়ে অধীরা অচৈতন্য ধরা,
চৈতন্যরূপিণী তারা বিনে কে
চৈতন্য করে॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা

পড়িয়ে ভবসাগরে ; ডুবে মা তনুর তরী।
"মায়া-ঝড়, মোহতুফান" ক্রমে বাড়ে
গো শঙ্করি॥
একে মনমাঝি আনাড়ি, তাতে ছ'জন
গোঁয়ার দাঁড়ি,
কু-বাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু
খেয়ে মরি॥
ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল,
ছিঁড়ে গেছে শ্রদ্ধার পাল,
তরী হল বানচাল বল কি করি।
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন
ভেবে সার,
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার, দুর্গানামের
ভেলা ধরি॥

খাম্বাজ—একতালা

মা কত কর বিড়ম্বনা।
অজ্ঞানান্ধে রাখি আর জিওনী যন্ত্রণা॥
অনিত্য সুখে ভুলায়ে, দুঃখার্ণবেতে
ডুবায়ে
মা হয়ে সন্তানে কত কর বিড়ম্বনা।
(ভাল রহিত করুণা)॥
যাগযজ্ঞ পূজনাদ, বিবিধ বিধান
বিধি, দুর্গে!
তব কৃপা বিনা না হয় ঘটনা।
অকিঞ্চন প্রতি কৃপান্বিতা হয়ে ভগবতি,
দুর্গতি-নাশিনী যশঃ প্রকাশ কর মা॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী

কেরে বামা নিবিড়-নীরদ-বরণী।
বল-হারিণী, প্রতিপদ বিহরণে কম্পিত
ধরণী;
এতো নয় (নয়) সামান্য রমণী॥
বিগলিত কেশী, উন্মত্তকেশী, মুখে
অট্টহাসি,
দশানে চমকে যেন তড়িত শ্রেণী॥
অকিঞ্চনে এই কয়, কটাক্ষে দনুজ ক্ষয়,
অপাঙ্গে দনুজ কুল-বলহারিণী॥

দেওয়ান নন্দকুমার

দেওয়ান নন্দকুমার ॥ দেওয়ান মহাশয় রঘুনাথ রায়ের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ছিলেন। গীত রচনায় তিনিও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শক্তি বিষয়ক বহু গীত তিনি রচনা করেন। বর্দ্ধমানের চুপী গ্রামের এই রায় বংশ অর্থাৎ দেওয়ান বংশ শক্তি সাধনায় এবং শক্তি বিষয়ক গীত রচনায় যেন সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

ভৈরবী—আড়াঠেকা

ভুবন ভুলাইলি গো ভুবনমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণা-বাদ্য-নিনাদিনী ॥
শরীরে শরীরে যন্ত্রে সুষুম্নাদি হয় তন্ত্রে,
গুণভেদে মহামন্ত্রে তিন গ্রাম সঞ্চারিণী।
আধারে ভৈরবাকার, ষড়দলে শ্রীরাগ আর,
মণিপুরেতে মল্লার বসন্তে হৃৎ-প্রকাশিনী,
বিশুদ্ধে হিল্লোল সুরে ত্রিসপ্ত সুর ভেদিনী।
মহামায়া মোহ-পাশে বদ্ধ কর অনায়াসে
তত্ত্ব লয়ে তত্ত্বাকাশে, স্থির আছে সৌদামিনী
শ্রী নন্দকুমার কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়
তব তত্ত্ব গুণত্রয়, কাকি মুখে আচ্ছাদিনী ॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

ভাব বসে, মদনান্তক রমণী মম মানসে,
নাহি পর্য্যটন শ্রম, প্রেম গন্ধ ভাব কুসুম,
তেজ ধূপ-দীপ, আদি প্রাণ; আছয়ে তব পাশে ॥
সহস্রারামৃতে পাদ্য অর্ঘ্য দেহ মন,
ভাবরূপ নৈবেদ্য তায় কররে অর্পণ,

কাম আদি ছয় জন, বলীর এই নিরূপণ ;
জ্ঞান-কৃপাণে ছেদন, কর অনায়াসে।
হোম কুণ্ড কর শ্রদ্ধা, সমিধ সমাধি
ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বাল তায় মন এই বিধি
হোতা হও ত্যজি কর্ম্ম, ব্রাঢ্য ঘৃতে রাখি মর্ম্ম,
আহুতি দাও ধর্ম্মাধর্ম্ম মনরে হোমে ॥

মূলতান—একতালা

কালীপদ সরোজ রাজে সহজে ভৃঙ্গ হওনা মন
পদে মত্ত হও মকরন্দে সাজে সদানন্দে রওনা মন
মধুরধারা বহিছে তার চরণে স্মরণ লওনারে মন।
পদে লিপ্ত হও ত্বরায় যাও
উদর পূরিয়া খাওনা মন ॥
ঈষৎ উড়ে উড়ে মায়ের পদে ;
পড়ে গুন্ গুন্ গুন্ গাওনা মন ॥
যুগ্মপদ্ম ত্যজিয়ে বদ্ধ মায়া কেতকী ফুলেতে।
তাতে কেবল ধবদ্ধ গন্ধ মাত্র অন্ধ তত্র রেণুতে।
জড়িত পক্ষ কণ্টকে মন
তথায় বিরস হওনা রে মন ॥
কি সুখে রও নীরসপুষ্পে কি রস পাও কওনা মন।
বিষয় শিমুল মুকুলে মন ব্যাকুল চিত্ত
হয়েছে ব্যর্থ অর্থ চিন্তা সতত নিত্য অর্থ ভুলেছ।
কুমার বলে ওরে ভৃঙ্গ দুরাশা ভঙ্গ হওনা।
মায়ের পাদপদ্মে আশাবাসা করতে যাওনা মন ॥

ভৈরবী—ঠেকা

কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে।
অহংতত্ত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনা সনে।
উপেক্ষিয়ে মহত্তত্ত্ব, ত্যাজি চতুর্ব্বিংশতত্ত্ব।
সর্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব, দেখি আপনে আপনে
জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়া তত্ত্বে, পরমাত্মা আত্ম-তত্ত্বে

তত্ত্ব হবে পরতত্ত্বে, কুণ্ডলিনী, জাগরণে।
শীতল হইবে প্রাণ, অপানে এ পাইব প্রাণ ॥
সমান উদার ধ্যান্ ঐক্য হবে সংযমনে।
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ, ভূত পঞ্চময় তঞ্চ,
পঞ্চে পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ, বঞ্চনা করি কেমনে,
করি শিব। শিবযোগ, বিনা শিবে ভব-রোগ,
দূরে যাবে অন্ত ক্ষোভ, ক্ষরিত সুধার সনে।
মূলাধারে বরাসনে, ষড়দল লয়ে জীবনে
মণিপুরে হুতাশনে, মিলাইবে সমীরণে।
কহে শ্রীনন্দকুমার, ক্ষমাদে হেরি নিস্তার,
পার হবে ব্রহ্মদ্বার, শক্তি আরাধনে ॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী

কবি নিত্যানন্দদাস বৈরাগী ১১২৫ সালে চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন। চন্দননগরেই তিনি বসবাস করিতেন। তৎকালীন কবিওয়ালাদের মধ্যে তিনিও অসাধারণ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার নিজের কবিগানের দল ছিল এবং সে দলের গীত তিনি নিজেই রচনা করিতেন। কবিগান ব্যতীত তাঁহার রচিত অনেকগুলি ভাল প্রণয়সঙ্গীতও দেখা যায়। ১১৫৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সঙ্গে তাঁহার কিছু রচনা সন্নিবেশিত হইল।

মধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
নহে কেন অঙ্গ অবশ হইলো,
সুধা বরষিলো শ্রবণে ॥
বৃক্ষডালে বসি পক্ষী অগণিত
জড়বৎ কোন কোন কারণে
যমুনারি জলে বহিছে তরঙ্গ,
তরু হেলে বিনে পবনে ॥
একি একি সখি, একি গো নিরখি,
দেখ দেখি সব গোধনে।
তুলিয়ে বদন, নাহি খায় তৃণ,
আছে যেন হীন চেতনে ॥
হায়! কিসের লাগিয়ে,
বিদরে হিয়ে উঠি চমকিয়ে সঘনে।
অকস্মাৎ একি, প্রেম উপজিল,
সলিল বহিছে নয়নে।
আর একদিন, শ্যামের ঐ বাঁশী
বেজেছিলো কাননে।
কুললাজ ভয়, হরিলে তাহাতে
মোরিতেছি গুরুজনে ॥

আগে মনো কোরে দান ফিরে যই লই।
লোকে দণ্ডহারী কবে সই॥
ভাল বোলে ভালবাসি যায়,
প্রাণো সঁপি তায়।
সেকি মন্দ হোলো, তারে মন্দ বলা
যায়?
এত তারো শঠতা ব্যভার।
তবু সে অত্যাজ্য আমার॥
সখ্যতা কোরেছি আগে কেমনে বিপক্ষ
হই॥
হেরি প্রাণরে তব মুখোকমলে নয়ানো
খঞ্জন
ওলো, হবে দুখো নিবারণ।
অতি সুমঙ্গ হেরি আজ যুবতি,
বুঝি ভূপতি হব এখন॥
কমলো পরেতে খঞ্জন,
যদি দেখে কোন জন।
অবশ্য তাহারো হয় রাজ্য লাভ ওলো.
এই তো বেদের বচন॥
হায়, ইহার কারণে যাত্রা-কালেতে,
শুন ওলো সুন্দরী।
বামে শিব শিবা কুম্ভ
দক্ষিণে মৃগ দ্বিজ হেরি॥
তারি ফল বুঝি আমার
আসি ফলিল এখন।
ছত্রধারী হবো, তোমার হৃদয়ে
পাব হৃদিসিংহাসন

*

আমি তো সজনি! জানি এই।
যে ভালবাসে ভালবাসি তায়।
পরেরি সনে করে প্রণয়,
পরের লাগিয়ে, প্রাণে মরি গিয়ে
পর যদি আপনারি হয়॥
আমারি কেমন স্বভাব গো সই,
বিনা মূল্যে তার দাসী হই॥

সখি! ঐ মনোচোরা মোরে মনো লয়ে
যায়।
কেমনে গো প্রাণ সখি, ধরিব উপায়॥
আঁখিরো অন্তরো হোতে অন্তর লুকায়।
চোরেরো চরিত্র সখি, না জানি এমন।
নয়নে নিদিলি, মোরো দিলে গো।
কেমন।
জেগে যেন ঘুমাইলাম কি হোলো
আমায়॥

পিরীতি নগরে বিষমো সখি!
মন চোরেরো যে ভয়!
বসতি ইহাতে দায়।
নয়নে নয়নে সন্ধানো, মনো
এমনি হরিয়ে লয়॥
সন্ধান করিয়ে মন চোর, ভ্রমিছে নগরম।
কুলেরো বাহিরো হোয়ো না।
থেকো সাবধানে লো সদায়।
পিরীতে বই এমন বিবাগী হই।
ভাবি তার মুখ নিরখিব না।
এমুখ তারে দেখাব না।
বিরহে প্রাণ গেলে তবু কথা কব না॥
পুনো হলে দরশন, করয়ে কি গুণ,
তখন সে মনে থাকে।
সখি! না জানি কি ক্ষণে,
সে লম্পটো সনে হইলো বিধিরো ঘটনা।

অন্তরে সদা ঔদাস্ত, দিবানিশি ঐ
ভাবনা ॥
সখি ! হেন পাহি কেহ, নিবারে এদাহ
দেখনা ॥
আমি তোমার মন বুঝিতে করিছে
মান ।
দেখি, আমায় কেমন তুমি ভালবাস
প্রাণ ॥
মনে আমার একবার নাহি বিভিন্ন
জ্ঞান ।
অন্তরে হরিষ, মুখেতে বিরস,
কপটে ঝরিছে এ দুটি নয়ান ॥
তুমি বল প্রেয়সী আমি তোমার
প্রেমাধীন ।
অন্য নারী সহবাস নাহি কোন দিন ।
প্রত্যক্ষে সে কথা করি ঐক্যতা
সরলো কি তুমি পুরুষো পাষাণ ॥

*

ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমারে ।
ললিতে গো ধন্য কুবুজায় ।
যোগী যারে ধ্যানে নাহি পায় ।
হেন গুণ সিন্ধু হরি, কি গুণে ভুলালে
তায় ।
এত দিন অবধি আমরা কোরে
আরাধন ।
হইলাম বঞ্চিতো, সে হরির চরণ ।
গৃহে বোসে অনায়াসে,
অতুলো চরণো পায় ।

*

কেন সজনি, মোরে মরণ নাহিক হয় ।
সুখো কালে সুখ ঋতু, দুখ দেয় অতিশয় ।
তথাচ এ পাপ প্রাণো, কি মুখে এ দেহে
বয় ॥
যারে অনুগত প্রাণো সে গেল তেজে
আমায় ।
তারো সাথে, সেই পথে,
প্রাণ কেন নাহি যায় ।
মরিলে এ দেহ সখি, জলে চিতা আগুনে
দুখ বোধ নাহি হয়ো শব অঙ্গ দাহনে,
সজীব শরীরো এ যে, বিরহ অনলে দয় ।
দগধিয়ে মরি সখি, ইহা কি পরাণ সয় ।

*

কমল কম্পিতো পবনে ।
অলি কাতরো প্রাণে ।
এই সরোবরে নিত্য করি যাতায়াত
এমনো দেখিনে কভু ঘটিতে উৎপাত ।
অস্থির নলিনী হেলে, মধুকরো ধায় ।
পবনেতে বাদো সাধে বসিতে না পায় ॥
হায় গুন গুন স্বরে কাঁদে অলি
অধোবদনে ।
ধারা বহিছে অলির দুটি নয়নে
অলিরো দুর্গতি দেখি হাসে তপনে ।

বসন্ত—একতালা।

যাহার লাগিয়ে জাগিয়ে যামিনী,
রয়েছ বসিয়ে শ্যাম সোহাগিনী,

যাহার লাগিয়ে, সুরাগে রাঙ্গিয়ে,
ওগো সুধামুখি রাই, সোহাগে গলিয়ে,
ত্যজিয়ে ভুবন সাজায়েছ আজ নিকুঞ্জ কানন ,
কুসুম ভূষণে, সেজেছ মোহন
কুলশীল লাজে দিয়েছ ছাই। *
মনের আনন্দে, গো বৃন্দে চল,
শ্রীবৃন্দাবনে হরি দরশনে
এখানে মাধব সেখানে ॥

*

উভয়েতে হেরি গিয়ে জুড়াব উভয়।
ইহাতে হইবে কত সুখোদয়।
মনের তিমির যাবে মনোমিলনে ॥
সাজগো, সাজগো, সাজ, সাজ, ত্বরিতে।
সুচরিত্রে চম্পকলতা আরে ললিতে
রঙ্গদেবী, সুদেবী গো, যত সখীগণে ॥
আমার সঙ্গেতে সবে করহ গমন
রাধা বলে বাজে বাঁশী শুনি শ্রবণে ॥

* এই গানটি এবং ইহার পূর্ব্বের গানটি পুস্তক বিশেষে হরিমোহন রায়ের রচিত রচিত বলিয়া দেখা যায়।

রাজা রামমোহন

(জন্ম—১১৮০ ; মৃত্যু—১২৩৯)

ভারতের যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের নাম, কি স্বদেশে কি বিদেশে, প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে আজ সর্বত্র সগৌরবে বিঘোষিত। আপন জ্ঞান গবেষণার গরিমায় বঙ্গভাষায় নবজীবন সঞ্চারে, বেদান্ত উপনিষদের আলোচনায়, বৃটিশ দরবারে মোগল সম্রাটের দৌত্য কার্যে ঐতিহাসিক রাজা রামমোহন বিশ্বজন-পরিচিত এই গীত রচনা প্রচার প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনের বহুবিধ বিষয়ের মধ্যে সামান্য কয়েকটির উল্লেখ করা হইল।

গঙ্গানদীর তীরে হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের কাছে রাধানগর গ্রামে ১১৮০ সালে (ইং ১৭৭৪ খৃঃ) রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। রায়পদবী তাঁহাদের নবাব প্রদত্ত উপাধি। বংশ পদবী বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতার নাম তারিণী দেবী।

পাঠশালাতেই রামমোহনের শিক্ষার আরম্ভ। সেখানকার প্রচলিত শিক্ষার পর রামমোহন বিশেষ যত্নসহকারে পারসিক ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। প্রভাতের বালারুণের মধ্যেই যেমন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর তেজের আভাস পাওয়া যায়, তেমনি রামমোহনের বাল্যকালেই তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্র ৯ বৎসর বয়সের সময় রামমোহন ফারসী ভাষায় অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে তাঁহাকে পাটনা যাইতে হয়। পাটনায় অবস্থিতির সময়ে তিনি সযত্নে আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। ইহার পর মাত্র ১২ বৎসর বয়সে রামমোহন কাশীধামে গিয়া একাগ্র চিত্তে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। দেশীয় বিভিন্ন ভাষা ব্যতীত ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু ও ইংরাজী প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষায়ও অসাধারণ প্রতিভাশালী রাম-মোহন কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। হিন্দু দেবদেবীর উপর বাল্যকালে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সে ধর্ম্মমতের পরিবর্তন ঘটে। এবং কেবলমাত্র সেই কারণেই দুইবার তিনি পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হন। প্রথমবারে গৃহ হইতে বাহির হইয়া, ধর্ম্ম-জ্ঞানার্জন মানসে তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে পর্য্যটন করেন। দুর্গম দুরারোহ তিব্বত প্রদেশ পর্যন্ত তিনি পরিভ্রমণ

করিয়াছিলেন। এবং প্রায় চার বৎসর পর গৃহে প্রত্যাগমন করেন। পিতা রমাকান্ত সাদরে পুত্রকে গ্রহণ করেন এবং তাঁহার বিবাহ দেন। কিন্তু পুনরায় পিতার সঙ্গে ধর্মমতের অনৈক্য হওয়ায় রামমোহন আবার গৃহ হইতে বিদূরিত হইলেন। এই সময়ে ১২১৭ সাল হইতে ১২২৭ সাল পর্যন্ত রামমোহন ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে, উত্তর বঙ্গে রংপুরে ও সুদূর ভাগলপুরে সেরেস্তাদারী কার্যে নিযুক্ত থাকেন। সুদীর্ঘ দশ বৎসরে তিনি বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়া তৎকালে যে সকল জমিদারী ক্রয় করেন তাঁহার বংশধরগণ পরে তাহা ভোগ করিয়াছেন।

ইংরেজ সরকারের কার্য পরিত্যাগ করিয়া রামমোহন কিছুদিন কলিকাতা নগরে অবস্থান করেন। এই সময়ে হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি ধর্মালোচনায় ও ধর্মান্দোলনে প্রবৃত্ত হন। এবং তাহারই ফলে হিন্দু সমাজের কিছু অংশের প্রচুর বিতৃষ্ণা ভাগ্যে জুটিলেও রামমোহন প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির সহায়তায় কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন।

তৎকালীন মোগল সম্রাট কর্তৃক রামমোহন 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হন। এবং ১২৩৮ সালে, মোগল সম্রাটদিগের পেনসন অর্থাৎ বৃত্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ তিনি ইংলণ্ড গমন করেন। এই প্রকারে ইউরোপের বহুদেশে পর্যটন করিয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রি দুইটা পঁচিশ মিনিটের সময় ব্রিস্টল নগরে জ্বররোগে এই মহামানব তাঁহার মানবলীলা সংবরণ করেন।

ধর্মসংস্কারক রাজা রামমোহন ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। সমাজ-সংস্কারক হিসাবে একমাত্র তাঁহারই প্রচেষ্টায় ও আন্দোলনে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক ভারতবর্ষে সহমরণ প্রথার প্রচার প্রচলন আইন করিয়া রহিত করিয়া দেন। রামমোহনকে আধুনিক বাংলা গদ্যের জন্মদাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বেদান্তের ন্যায় দুরূহ বিষয় সর্বসাধারণ্যে বুঝাইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এদেশে সর্বপ্রথম তিনিই অনুবাদ সহ উপনিষদ প্রকাশ করেন। ধর্ম সম্বন্ধে রামমোহন আরও অনেক সুচিন্তিত রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন রচিত বৈরাগ্যভাবোদ্দীপক ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি বাংলা ভাষার অতুল সম্পদ। হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোকই একবাক্যে তাঁহার বৈরাগ্য সঙ্গীতের প্রশংসা করেন।

রাজা রামমোহনের তিন বিবাহ। প্রথম বিবাহের দুই তিন বৎসর পরেই তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। বর্দ্ধমান জেলার অধীন কুড়মন পলাশী গ্রামে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যুর পর কলিকাতায় ভবানীপুরে তাঁহার তৃতীয় বা শেষ বিবাহ হয়। ব্রিস্টল নগরে আজও রাজা রামমোহনের সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান। এই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে আজও সারা ভারতবর্ষ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে প্রণাম নিবেদন করে। রাজা রামমোহন রচিত কিছু গীত এই সঙ্গে সন্নিবেশিত হইল।

ইমনকল্যাণ—আড়াঠেকা

কেমনে হব পার, সংসার পারাবার
বিনা জ্ঞানতরণী বিবেক কর্ণধার।
শুনরে মম মানস, স্বীয় কলুষ কলস,
কর্মগুণে বাঁধা সদা কণ্ঠেতে তোমার।
ঘোরতর মায়াতম, আশা পবন বিষম,
প্রবৃত্তি তরঙ্গ রঙ্গে, উঠে বারেবার;
নানাভিমানের ধারা, বহে খরতর তারা,
কাম ক্রোধ মোহ লোভ জলচর
দুর্নিবার।
মমতাবর্ত বিকচ বিশাল
তাহে ভাসে মোহব্যাল
মাৎসর্য্য পাথার জল, নাহি পারাবার;
কালধীবরের করাল পেতেছে
ব্যাধির জাল,
ধরে লবে প্রাণমীন, নাহিক নিস্তার॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা

নিজগ্রামে পরগৃহে চোর প্রবেশিলে
মন।
লোকে শুনে তাহে কত মনে মনে ভীত
হন।
নবদ্বারী দেহপুরে, কালরূপী তস্করে,
নিত্য পরামায়ু হরে, নাহি তার
অন্বেষণ।
মোহরাত্রি তম-ঘন, মায়ানিদ্রায়
প্রাণিগণ,
প্রহরী নাহিক কোন, কে করে বারণ।
শুন মন অতঃপরে, জ্ঞান আসি করে
ধরে,
জাগিয়া কৃতান্ত চোরে কর নিবারণ॥

কেদারা—আড়াঠেকা

বিপত বিশেষং; জনিতাশেষং;
সচ্চিদং সুখ পরিপূর্ণং।
আকৃতিবীতং ত্রিগুণাতীতং স্মর
পরমেশং তূর্ণং।
গচ্ছদ পাদং বিবেক বিবাদং পশ্যতি নেত্র
বিহীনং,
শৃণকর্ণং বিরহিত বর্ণং গৃহ্নদহস্তমপীনং।
বেদৈর্গীতং প্রত্যগতীতং পরাৎপরং
চৈতন্যং,
অজরমশোক, জগদালোকং সর্ব্বস্যৈ-
কশরণ্যং।

ব্যাপ্যাশেষং স্থিতম বিশেষং, নিগুর্ণম-
পরিচ্ছিন্নং,
বিগত বিকাশং জগদাবাসং সর্ব্বোপাবিধি-
বিভিন্নং ॥

রামকেলী—আড়াঠেকা

দম্ভ ভাবে কত রবে, হও সাবধান।
কেন এত তমোগুণ, কেন এত
অভিমান ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পরনিন্দা
পরদ্রোহে,
মুগ্ধ হয়ে নিজ দোষ, না কর সন্ধান ॥
রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে
ব্যাকুলমতি,
অথচ "আমার" ব'লে—মনে মনে ভাণ।
অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও
অবশ্য মরিবে জানি, সত্য কর ধ্যান ॥

কেদারা—আড়াঠেকা

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা
অনিত্য এদেহ মম, জেনেও কি
জান না ॥
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার-মাস তিথি
রবে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবারো
ভাবিলে না ॥
এ কারণে বলি শুন, ত্যজ রজস্তমো গুণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন,—এ বিপত্তি
রবে না ॥

কালাংড়া—আড়াঠেকা

মন যারে নাহি পায়, নয়নে কেমনে
পাবে।
সে অতীত গুণত্রয় ইন্দ্রিয় বিষয় নয়,
যাহার বর্ণনে হয়, শ্রুতি মনস্তাপে ॥
ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ,
ইচ্ছামতে রাখে, ইচ্ছামতে করে নাশ,
সেই সত্য সব আর অসার এ ভবে ॥

কেদারা—কাওয়ালী

সংসার দুর্গতি হতে নিবৃত্তি না হবে।
যাবৎ কর্ম্মের ফলে প্রবৃত্তি রহিবে ॥
দেখিতে সুরঙ্গ ফণ, যাতে হলাহল
পাবে।
কেন ভোগে মুগ্ধ হও, "আমি আমি"
সদা কও,
আশার বশেতে রও,—বৃথা প্রাণ
যাবে ;—
অতএব সাবধান, ত্যজ মিথ্যা অভিমান,
ভজ সত্য সনাতনে অমৃত পাইবে ॥

জয়জয়ন্তী—মধ্যমান

বিষয়-বিষ-পানাসক্তে, ত্যজিলে জীবন
প্রত্যেকেতে পঞ্চজীবের শুন বিবরণ।
রূপেতে মরে পতঙ্গ, রসে মীন, গন্ধে ভৃঙ্গ,
স্পর্শে হত মাতঙ্গ, শব্দে কুরঙ্গ নিধন।
বিষয়েতে আছে রত, যেই জীব
অবিরত,
বিনষ্ট হবে ত্বরিত পতঙ্গাদি নিদর্শন।
অতএব সাবধান, ত্যজ বিষয় রস-পান।
বৈরাগ্যেতে কর যত্ন, হৃদে ভাব
নিরঞ্জন ॥

সাহানা—ধামার

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়।

যাহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয়
হয় ॥
জড় ছিলে,—সচেতন যে করে
তোমারে,
পুনর্ব্বার ক্ষণমাঝে পারে নাশিবারে,
জগতের আত্মা সেই জানিহ নিশ্চয় ॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

কোথায় আনিলে আমায়,
আমায় কোথায় আনিলে।
আনিয়ে সাগরমাঝে তরী ডুবালে।
নাহি দেখি পারাবার, চারিদিক
অন্ধকার,
প্রাণ বুঝি যায় এবার ঘূর্ণিত জলে।
কোথা রইল মাতা-পিতা, কে করে স্নেহ
মমতা,
প্রাণ প্রিয়া রইল কোথা বন্ধু সকলে ॥

দেওয়ান রামদুলাল

দেওয়ান রামদুলাল নন্দী ১১৯০ সালে ত্রিপুরা জেলার কালী কচ্ছগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ মেধাবী ছাত্র রামদুলাল, বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া প্রথমে ত্রিপুরা কালেক্টরীতে মুন্সীর পদে নিযুক্ত হন। তাহার পর ক্রমান্বয়ে নোয়াখালি কালেক্টারীর এবং শ্রীহট্ট জেলার জজ আদালতের সেরেস্তাদারের কার্য করেন। অবশেষে ত্রিপুরার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। সেই হইতে দেওয়ান রামদুলাল নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। তাঁহার অধিকাংশ গীত রচনাই পরমার্থ বিষয়ক এবং ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ। ১২৫৮ সালে ২৪শে অগ্রহায়ণ তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার কিছু রচনা এই সঙ্গে সন্নিবেশিত হইল।

গৌরী—একতালা

পরম পরম পরমকারণ।
পরমব্রহ্ম পরাৎ চিন্তামণিরূপিন্।
তেজমধ্যে চণকাকার, প্রকৃতি পুরুষ
জগদাধার,
একই কায় যে যেই চায়,
সেইরূপে তাহা কর পূরণ।
শৈব আদি ভাবুকগণ,
শিব আদি রূপে পায় দরশন।
সাধনহীন অতিশয় দীন,
শ্রীরামদুলালে প্রণমে চরণ।

বাহার—আড়া

মা, মনে যত আশা করি, নাহি পূর্ণ
হয়।
বাণী তুল্য পাই বিদ্যা, শিব তুল্য হয়
সিদ্ধা

পিতামহ সম আয়ু, ধনেশের ধন হয় ॥
মা মনে যত আশা করি, হয় না হয় করী
করি,
কি করি কি করি দয়াময় ।
শ্রীরামদুলালে কয়, মানবে কি ইহা হয়
দিচ্ছেন আত্ম পরিচয় মন মহাশয় ॥

গারা—আড়া

মন কি ভুলে ভুলিয়াছ, ভুলে কি ভুলিতে
নার ।
ভুলে মূল হারাবে পাছে, মূলেরি সন্ধান
কর ।
ভাই বন্ধু দারা সুত, পরিজন আছে
যত,
যাকে অতি ভালবাস সেক্ষণ
ভাব মায়ের ॥
নিত্য বস্তু পরমাণু যার চেয়ে হয়
তনু ,
সংযোগ হইলে ধ্বংস, ভেবে
দেখ কেবা কার !
শ্রীরামদুলালে রটে, সদা
ফেরে মাঠে ঘাটে,
ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে ভাব তুমি
সেই সার ॥

আলাইয়া—আড়া

নাহি ধন না হইবে বিল্ব অর্চ্চনা
ঘরে দাক্ষায়ণী পূজা করিব
স্ববাসনা ॥
অষ্টোকণ মণ্ডপেতে, রতন বেদি
উপরে,
সিংহাসনে প্রেতশিরে,
আছে বামা স্থাপনা ॥
বপুষ্প পঞ্চ দ্রব্যেতে,
পঞ্চ উপহার দিয়ে পূজিব
তাহায়,
পুষ্পেন্দ্রিয় মালাদানে, কামাদি
বলি প্রদানে ।
শ্রীনাথ স্বারায় পূজা করিব
স্ববাসনা ॥

ললিত—আড়া

কি কুহক তারা তোমার,
ত্রিলোকে কেহ না জানে ।
বলে ক্ষিপ্ত লোকে তারে,
যে থাকে ঐ সন্ধানে
দ্বিধা ভাবে এক শক্তি জননী
রমণী উক্তি,
ঐক্য করে ক্ষেপা ব্যক্তি,
অনৈক্য হয় ভ্রান্তজ্ঞানে ॥
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ,
সচৈতন্য নহে কেহ,
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি ;
কুহকে কুহক দিয়ে, মায়ার মায়া
আচ্ছাদিয়ে,
চাহ মা সদয় হয়ে, শ্রীরামদুলাল
পানে ॥

মোহিনী বাহার—যৎ

ওগো জেনেছি জেনেছি তারা,
তুমি জান ভোজের বাজি ।
যে তোমায় যেমনি ভাবে,

তাতে তুমি হও মা রাজি ॥
মগে বলে ফরাতরা, গীত বলে
খোদা বলে ডাকে তোমায়,
মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী।
শাক্তে তোমায় বলে শক্তি,
শিব তুমি শৈবের উক্তি,
গৌর বলে সূর্য্য তুমি, বৈরাগী
কয় রাধিকাজি ॥
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষে তুমি
ধনেশ।
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর
নায়ের মাঝি ॥
শ্রীরামদুলালে বলে, রাজি নয়
এ জেন ফলে,
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে,
মন আমার হয়েছে পাজি ॥

*

ত্রিভুবনে অগুরূপা সকলি
আপন ॥
আর শুনেছি অধিক, করেছ
পুণ্য পাতক,
স্বর্গনরক তবে তাহা মানি,
যাহা নাহি হও আপনি,
তবে কি হবে তাহা ভোগের
কারণ ॥
শ্রীরামদুলালে ভণে, কিবা
লীলা ভুবনে,
কর মা কথন—কি কহিবে
জ্ঞানহীনে ॥
বেদে নাহি ভেদ জানে,
তাহে আমি দীনহীন,
না জানি ভজন ॥

আলাইয়া মিশ্র—একতালা

ত্বং নমামি অপাদগামিনী।
অবাণী, সর্ব্বদায়িনী, অচকে হেরিণী
অকর্ণে শ্রবণী, সর্ব্ব আত্মারূপিণী ॥
সগুণা নির্গুণা তুমি ত্রিলোচনা,
কৃষ্ণ কৃষ্ণা সেজে নাহি সীমা।
তুমি সকলে সর্ব্বমঙ্গলে ;
শ্রীরামদুলালে মন কুতূহলে,
নিবেদয়ে বাণী চরণ কমলে।
যেরূপা হও তুমি, সে রূপে
প্রণমি,
রূপের সীমানা জানি ॥

রামপ্রসাদী—একতালা

চল মন সুদর্‌বারে।
যথা কোট্‌নামি কারও খাটে নারে ॥
দেওয়ান যথা ভস্ম মাথা কপট
ভক্তি জানে নারে ॥
সেথা লেংটা গেলে আদর আছে,
ধন কড়ি তায় লাগে নারে ॥
দুলাল বলে কোন ফেরে, টাকা
দিয়ে মিলে নারে,
তথায় হাজির বাসী জানাইলে,
দয়াময়ী দয়া করে ॥

ললিত—আড়া

প্রবোধ অবোধ মন না মান
প্রবোধ কেন।
হবে কি সুবোধ বুধ, কর বুধ
আচরণ ॥

বালকে যেমন খেলাকালে,
জনকজননী বলে,
তেমনি মোহেতে বলে, নানারূপে
কর ধ্যান ॥
এক ব্রহ্ম নাই আর, কেন
ভ্রান্ত বারম্বার,
প্রকৃতি পুরুষে মন, কেন কর
ভেদ।
বেদে নাহি ভেদ রয়, যে
অভেদে অভেদ হয়,
শ্রীরামদুলালে কয়, সর্ব্ব
ঐক্য কর মন ॥

ভৈরবী—মধ্যমান

কিবা করুণাসিন্ধু চরণে
ধারণ।
ময়ি অভাজনে হল
দয়াবারি বিতরণ ॥
নাহি ভজন পূজন, জপন
মনন ধ্যান.
নাহি কীর্ত্তন শ্রবণ, সদা
ধ্যায়ী পরিজন ॥
ক্রমে শেষ হল দিন, বয়স
গেল পঞ্চায়,
ভীতিতে করে উত্তীর্ণ. রাখিলি
যশঃ ঘোষণ ॥
হ'ল স্থগিত আমার নয়ন খঞ্জন।
দশ দিক্ নিরখিয়ে না হেরে
মনোরঞ্জন।
কে নিল কি কব কারে, ভাবে
বুঝিলাম অন্তরে,
সকলি কপালে করে, কারে
করিব গঞ্জন ॥
শ্রীরামদুলালে বলে, নয়ন
সারাও কলে,
সে মনোলোভায় সতত কর
নয়ন অঞ্জন ॥*

*কাহারও কাহারও মতে এই গানটি রামদুলালের রচিত শেষ সঙ্গীত। কোনও কোনও গ্রন্থে এই গানটি কবি নরচন্দ্রের রচিত বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়।

রাম বসু

(জন্ম—১১৯৪ সাল ; মৃত্যু—১২৩৬ সাল)

বাংলার আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র কবিওয়ালা রাম বসু এতদ্দেশীয় কবিদের দলে উচ্চ আসনে সমাসীন। কবি রাম বসু—"বিরহ সঙ্গীতের রাজা" বলিয়া প্রখ্যাত। কবি গানের আসরে প্রশ্ন ও উত্তর রচনার যে প্রথা, রাম বসুই তাহার প্রবর্তক। কবিগান ছাড়াও সব রকমের গীত রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিশেষতঃ মর্মাহত। নায়িকার মর্মবেদনা প্রকাশে নিষ্ঠুর নায়কের প্রতি শ্লেষভাষে তিনি যে গীত রচনা করিয়াছেন তাহা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রেমে আত্মবিসর্জন ও সর্বসমর্পণের ভাব তাঁহার গীত রচনাগুলিতে সমূহ পরিস্ফুট এবং সার্থক।

হাওড়ার অন্তর্গত সাল্কিয়া গ্রামে ১১৯৪ সালে রামমোহন বসু জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার জোড়াসাঁকোতে তাঁহার পিসীমার বাড়ী। সেখানে থাকিয়াই তিনি লেখা শিখেন। পাঠশালাতে কলার পাতে যখন লিখিতেন সেই সময় হইতেই তাঁহার সঙ্গীত রচনায় অনুরাগের কথা জানা। সামান্য ইংরাজী শিখিয়া প্রথমে তিনি কোনো অফিসে কেরানীর কর্মে নিযুক্ত হন। এই সময় ভবানী বণিক, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার ও ঠাকুরদাস সিংহ প্রভৃতি কবিওয়ালাদের অবৈতনিকভাবে তিনি গীত রচনা করিয়া দিতেন। এই সকল গান রচনায় রাম বসুর যশঃ সৌরভ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই সময় তিনি চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া নিজেই একটি কবিদল সৃষ্টি করিয়া বসেন। প্রথম দিকটায় তাঁহার এই দল অপেশাদারী ছিল ; শেষে তাহা পেশাদারীতে পরিণত হয়। ১২৩৬ সালে মুর্শিদাবাদে কাশিমবাজারের রাজবাড়ীতে রাম বসু কবিগান গাহিতে যান। সেখানেই মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে বাংলার কাব্য কাননের এই দুর্লভ পুষ্প অকালে ঝরিয়া পড়ে।

রাম বসুর সময়েই কবির দলের খ্যাতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল। বঙ্গদেশে এই ধরনের কবির দলের প্রাধান্যে বঙ্গ সাহিত্যে বহুবিধ অমূল্যরত্ন পুষ্ট হয় এবং আজ আমরাই তাহার উত্তরাধিকারী।

অন্তরা।

ওহে এ কালো, উজ্জলো, বরণো,
তুমি কোথা পেলে
বিরলে বিধি কি নির্ম্মিলে।
যে বলে সে বলে, বলুক কালো,
আমার নয়নে লেগেছে ভালো,
বামা হোলে শ্যামা বলিতাম তোমায়,
পুজিতাম জবা বিল্বদলে।
আরো তো আছে হে অনেকো কালো,
একালো নহে তেমনো,
জগতের মনোরঞ্জনো
না মেনে গো-কুলে কুলেরো বাধা,
সাধে কি শরণো লয়েছে রাধা,
জনমের মত ঐ কালো চরণে,
বিকায়েছে বিনি-মুলে॥
ওহে শ্যাম, কালো শব্দে কহে কুৎসিতো,
আমার এই ত জ্ঞান ছিল।
সে কালোর কালত্ব গেলহে কৃষ্ণ,
তোমারে হেরে কালো।
এখন বুঝিলাম কালোরো ধাড়া,
সুন্দরো নাহিক আর।
কালো রূপ জগতের সার।
ত্রিলোকে এমন আর, নাহিক হেরি,
ওরূপে তুলনা কি দিব হরি।

কালো রূপে আলো করেছে সদা
মোহিতো হয়েছে সকলে॥
একো কালো জানি কোকিলো,
আরো ভ্রমরার কালো বরণ।
আর কালো আছে জলো কালিন্দীর,
কালোতো তমালো বন॥
আরো কালো দেখো, নবীনো নীরদ,
ছিলহে দৃষ্টান্তে-স্থল, কালোতো নীলকমলো,
সে কালোর কালত্ব দেখেছে সবে।
প্রেমোদয়, অশ্রু হয়, কারে বা ভেবে!
তোমারো মতনো, চিকণো কালো,
না দেখি ভুবনমণ্ডলো॥*

*

যদি চলিলে মুরারি, ত্যেজে ব্রজপুরী,
ব্রজনারী কোথা রেখে যাও॥
জীবনো উপায় বোলে দাও।
হে মধুসূদনো, করি নিবেদনো,
বদনো তুলিয়ে কথা কও॥
শ্যামা যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি,
থাক হরি, যথা সুখ পাও॥
একবার সহাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে,
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও।
জনমের মত শ্রীচরণ দুটী, হেরি হে
নয়নে শ্রীহরি,

* রাম বসু, হারু ঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগের গান "কবির সুরে" গীত হইয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেক গানই—প্রথমে মহড়া, তার পর চিতেন, তার পর অন্তরা, পরে ক্রমান্বয়ে চিতেন ও অন্তরা—এইভাবে রচিত দেখা যায়। এই কারণ আমরা অতঃপর আর কোন কবির গানের মহড়া চিতেন প্রভৃতির উল্লেখ করিলাম না। তবে প্রথম দুই দাঁড়ী পর্য্যন্ত মহড়া, দ্বিতীয় দুই দাঁড়ী পর্য্যন্ত চিতেন ইত্যাদি ভাবে গানগুলি সাজান হইল।

আর হেরিব আশা না করি।
হৃদয়ের ধন তুমি গোপীকার,
হৃদে বজ্র হানি কোথা চলি যাও ॥

*

এখন সময়গুণে এই দশা হয়েছে।
ছিল দাসী যে, হোলো রাণী সে,
রাধা রাজনন্দিনীর এখন কপাল ভেঙ্গেছে।
শরমে, মরমে মরি, ক'ব কার কাছে
যে জন আঁখি আড় হোতো না,
তারে দেখ্‌তে এসে এত লাঞ্ছনা।
আমরা পথে বসে কাঁদি আজ,
এমন কত কান্না তোদের রাজা কেঁদেছে ॥
কপাল মন্দ যারি হে,
কৃষ্ণের নিন্দা করা উচিত নয়।
দশা যখন বিগুণ হয়, বন্ধু লোকে মন্দ।
কয়,
রাধার চরণে যার লেখা নাম,
এখন তোদের পায়ে ধরায় সেই শ্যাম
ভাবতে বল্‌গে যা তোদের রাজাকে,
এমন অভিমান কতবার ভিক্ষে
লয়েছে ॥
কথা কইতে গেলে, নয়ন জলে অঙ্গ
ভেসে যায়।
রাধা-রাজার দাসী, এ রাজ্যে আসি,
কাঁদিতেছে দরজায়।
এমন নিষ্ঠুর ভূপতি, আমাদের শ্রীমতী,
কভু নয়
পেয়ে কাঙ্গালিনী ভয়, অন্তঃপুরে
গিয়ে রয়,
আমরা দয়াল রাজ্যে বাস করি,
চাইলে উল্‌টে ভিক্ষে দে যেতে পারি।

মনে করতে বল তোদের রাজাকে,
বুঝি আপনার সেদিন এখন ভুলে গিয়েছে ॥

*

দেখবো কেমন সুন্দরী সে কুবুজা।
তোদের রাজ যে, নিজে বাঁকা সে,
নূতন রাণী যে,হোয়েছে বাঁকা কি সোজা ॥

*

গিয়াছিলাম আশা ক'রে আনতে
মাধবেরে,
সে আশা পূর্ণ হ'ল না।
ব্রজে এল না কালাচাঁদ, হ'ল হরিষে
বিষাদ,
কৃষ্ণের আর আসার আশা কোরো না
যাতে বাঁচে রাই, কর সেই মন্ত্রণা।
রাধায় বুঝায়ে সই চল রাখি সকলে।
হ'লে শ্রীদামের শাপান্ত, পুন সেই শ্রীকান্ত
আসিবেন এই গোকুলো।
মনে অধৈর্য্য হ'য়োনা, ওগো ব্রজাঙ্গনা,
কৃষ্ণ অঙ্গনা, কৃষ্ণ এখন পাবে না ॥
জান্‌তাম আমাদের কৃষ্ণধন,
বিক্রীত রাধার প্রেমেতে।
গিয়ে দেখ্‌লাম শ্যামের এখন সে ভাব
নাই,
রাইকে নাহি মনেতে।
মধুরাজ্যেশ্বর বংশীধর হয়েছেন এখন।
রাজছত্র শিরে তাঁর দরশন পাওয়া ভার,
গোপিকায় নাহিক স্মরণ।
তিনি ন'ন রাধাকান্ত, হয়েছেন কুব্জাকান্ত,
রাধার প্রণান্তে ক্ষতি কি তাঁর বঙ্গনা ॥

*

ওহে গিরি গা তোল হে,

মা এলেন হিমালয়।
উঠ দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গা কর কোলে,
মুখে বল, জয় জয় দুর্গা জয়।
কন্যা পুত্র প্রতি বাৎসল্য, তায় তাচ্ছল্য
করা নয়,
অাঁচল ধোরে তারা,—বলে ছি মা,
কি মা,
মা গো, ওমা, মা বাপের কি এমনি
ধারা!
গিরি তুমি যে অগতি, বুঝে না
পার্ব্বতী,
প্রসূতির অখ্যাতি জগন্ময়॥
গত নিশিযোগে আমি হে দেখেছি যে!
সুস্বপন,
এলো হে সেই আমার তারাধন—
দাঁড়ায়ে দুয়ারে।
বলে মা কই, মা কই, মা কই
আমার,
দেও দেখা দুখিনীরে।
অমনি দু বাহু পসারি, উমা কোলে
করি'
আনন্দতে আমি—আমি নয়॥
মা হওয়া যত জ্বালা,
যাদের মা বলবার আছে, তারাই
জানে।
তিলেক না হেরিয়ে মর্ম্মব্যথা পাই,
কর্ম্মসূত্রে সদা স্নেহে টানে॥
তোমারে কেউ কিছু বোল্‌বে না,
দেখে দারুণ পাষাণ।
আমার লোকগঞ্জনায় যায় প্রাণ।
তোমার তো নাই স্নেহ।
একবার ধরো ধরো, কোলে করো,
পবিত্র হোক পাষাণদেহ,
আহা, এত সাধের মেয়ে, আমার মাথা
খেয়ে,
তিন দিন বই রাখে না মৃত্যুঞ্জয়॥

রাসু ও নৃসিংহ

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাসু ও নৃসিংহ ফরাসডাঙ্গার নিকটে গোঁদলপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রাসু ও নৃসিংহ দুই ব্যক্তি। উভয়ে সহোদর ছিলেন। তাঁহারা কায়স্থ ও কুলোদ্ভব এবং সুকবি। কাহারও কাহারও মতে রাসু নৃসিংহ নামে একজন কবিওয়ালাই ছিলেন। রাসু ও নৃসিংহ রচিত অনেক কবিগান এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবু সামান্য যে কয়টি এখনও পাওয়া যায় তাহাতেই এই কবিদ্বয়কে বঙ্গসাহিত্যে যশস্বী করিয়া রাখিয়াছে। দুই সহোদরের মধ্যে কোন্ জন গীত রচনায় বেশী পারদর্শী ছিলেন, এখন আর তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন, তাঁহাদের রচিত 'সখী-সংবাদ' গীতই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন বাংলা গান যাঁহারা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনিয়া বা শিক্ষা করিয়া থাকেন নিম্নলিখিত গীতখানি তাঁহাদের অবশ্য জানা বা শোনা আছে।

শ্রীমতীর মনে মানেতে মগনো
ওখানে এখনো যেও না ?
মানা করি কলহ আর বাড়াও না।
বিষাদের বাতি জ্বেলেছেন শ্রীমতী,
তাহাতে আহুতি দিও না।—

এই দুই ভ্রাতার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ সঠিক জানা যায় না বলিয়া এখানে উল্লেখ করা হইল না তবু এই দুই কবির যোগ্য আসন বঙ্গসাহিত্যে সঠিক নিরূপিত থাকিবে। তাঁহাদের রচিত কয়েকখানি মাত্র গীত এই সঙ্গে সন্নিবেশিত হইল।

ইহাই ভাবি হে গোবিন্দ সঘনে,
আঁখি হাসে, পরাণো পোড়ে আগুনে।
কি দোষ বুঝিলে, রাধারে ত্যজিলে,
কুঁজিরে পূজিলে কি গুণে।
জগতো সংসারো, ভুলাইতে পারো,
তোমারো বঙ্কিম নয়নে।
হে কুঁজি অবহেলে, বসিয়ে বিরলে,
তোমারে ভুলালে কিগুণে॥

শ্যাম, রূপে গুণে পূর্ণ, সকলি সুধন্য
অতুল্য লাবণ্য রাধারো।
ইহাই ভেবে মরি, কুবুজাবিহারি,
কিসুখে হোয়েছ নাগরো॥
শ্যাম, রূপেরো বিচারো, যদি মনে করো,
মজেছ যাহার কারণে।
ওহে লক্ষ্য কুবুজারো, রূপেরো ভাণ্ডারো,
শ্রীমতী রাধারো চরণে॥

শ্যাম, গুণেরো গরিমে, কি কহিব সীমে,
আগমে যাহারো প্রমাণো।
যার গুণো গেয়ে, মুরলী বাজায়ে,
নাম ধরো বংশীবদনো॥
শ্যাম, যার গুণাগুণো, করিতে সাধনো,
সনাতনো গেল কাননে।
ওহে এ বড় বেদনো, ত্যজিয়ে সে ধনো,
অধনে রেখেছ যতনে॥
শ্যাম, আপনার অঙ্গ, যেমনো ত্রিভঙ্গ,
কালিয় ভুজঙ্গ কুটিলে
কুবুজারো অঙ্গ, রসের তরঙ্গ,
তাহাতে শ্রীঅঙ্গ ডুবালে॥
শ্যাম, এই ভূমণ্ডলে, আধো গঙ্গাজলে,
রাধাকৃষ্ণ বলে, নিদানে।
এখন কুঁজি কৃষ্ণ-বোলে, ডাকিবে সকলে,
ভুবনো তরাবে দুজনে॥
শ্যাম,ত্যজিলে শ্রীমতী,তাহাতে কি ক্ষতি,
যুবতী সকলি সহিলো।
ভুজঙ্গমাণিকো, হোরে নিল ভেকো,
মরমে এ দুখো রহিলো॥
শ্যাম, প্রদীপেরো আলো, প্রকাশো
পাইলো,
চন্দ্রমা লুকালো গগনে।
ওহে গোখুরের জলো, জগতো ব্যাপিলো,
সাগরো শুকালো তপনে॥

*

প্রাণনাথো মোরো, সেজেছেন শঙ্করো,
দেখাসয়ে প্রিয়ে ললিতে।
অপরূপো দরশনো, আজু প্রভাতে।
বুঝি কারো কাছে, রজনী জেগেছে,
নয়ন লেগেছে ঢুলিতে॥

পার্ব্বতীনাথেরো, অর্দ্ধ-শশধরে
সবিতা অর্দ্ধ কপালেতে।
আমার নাগরো, সেজেছেন সুন্দরো,
চন্দনো সিন্দুর ভালেতে॥
হায়! মথনেরো বিষো, ভখিয়ে মহেশো,
নীল-কণ্ঠদেশে নিশানা।
নীলকণ্ঠ নাম, অতি অনুপম,
জগতে রোয়েছে ঘোষণা॥
আমার নাগরো, গিয়েছিলেন কারো,
কলঙ্ক-সাগরো মথিতে।
ফুরায়ে মন্থনো, এনেছেন নিশোনো,
আঁখির অঞ্জনো গলাতে॥
হায়! সে যেমনো ভোলা, তাহাতে
উজ্জলো,
গলে অস্থিমালা ছড়াতে।
মুখে কৃষ্ণ নাম, শিঙ্গায় বলে রাম,
বিশ্রাম কুচনীপাড়াতে॥
পোহায়ে রজনী, এই গুণমণি,
এসেছেন মন তুষিতে।
গুঞ্জছড়া গলে, মুখে সুধা ঢালে,
রাধা রাধা বলে বাঁশীতে॥
হায়! ত্রিলোচনো, হরো, জগতে
প্রচারো,
এক চক্ষু যারো কপালে।
কৃষ্ণপ্রেমে ভোরা, পাগলের পারা,
ধুতুরা শ্রবণযুগলে॥
ইহারো সেইমতো, সপত্র সহিতো,
কদম্ব শ্রবণযুগেতে।
ত্রিলোচনচিহ্ন, দেখ দীপ্যমান,
কপালে কঙ্কণো আঘাতে॥

শ্রীমতীর মনো, মানেতে মগনো,
ওখানে এখনো যেও না।
মানা করি কলহ আর বাড়াও না।
বিবাদের বাতি, জ্বেলেছেন শ্রীমতী,
তাহাতে আহুতি দিও না॥
নিবেদন করি, ফিরে যাও হরি,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থেক না।
কত নারীর সঙ্গে, কোরেছ কি রঙ্গ,
শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ছুঁও না॥
শ্যাম্, নিতি নিতি তবো, দেখি হে যে ভাবো,
তথাচ সে সবো পাসরি।
এ বারে তোমারো, রাধা পাওয়া ভারো,
যে ভাবে বোসেছেন কিশোরী॥
জিনি মেরুগিরি, মানভরে ভারি,
মারিবার ভয় করে না।
যদি গিরিধারী, হোতে চাহ হরি,
মনে করি রাধা পাবে না॥
শ্যাম্, কার ভাবে ভুলে, কহ কোথা ছিলে,
মোজেছিলে কার প্রেমেতে।
প্রভাতে কেমনে, আইলে এখানে,
নিলাজো বদনো দেখাতে॥
সুখের নিশিতে, এখানে আসিতে,
তোমারো মনেতে ছিল না।
বিপক্ষ হাসাতে, এসেছো প্রভাতে,
করিতে কপটো ছলনা॥
শ্যাম্, শরমে কি করে, বলি হে তোমারে,
শ্রীমতী রাধার কথাটি।
এবারে মাধবে, যে আনি মিলাবে,
সে খাবে রাধার মাথাটি॥

দিয়ে পদ দুটি, মাড়াবে যে মাটি,
শ্রীমতী তো সেটি ছোঁবে না।
তুলিয়ে সে মাটি, দিবে ছড়া কাটি,
শ্রীরাধার এটি কটুকেনা॥

*

কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা।
ঘুচাও আমারো মনের ব্যথা।
করিলে শ্রবণো, হয় দিব্য জ্ঞানো,
হেন প্রেমধনো, উপজে কোথা।
আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে
প্রীতিপ্রয়াগে, মুড়াব মাথা॥
আমি রসিকেরো স্থানো, পেয়েছি সন্ধানো
তুমি নাকি জানো, প্রেম-বারতা।
কাপট্য ত্যজিয়ে, কহ বিবরিয়ে,
ইহারো লাগিয়ে, এসেছি হেথা॥
হায়! কোন্ প্রেম লাগি,প্রহ্লাদো বৈরাগী
মহাদেবো যোগী, কেমন প্রেমে।
কি প্রেম কারণে, ভগীরথ জনে
ভাগীরথী আনে, ভারতভূমে॥
কোন্ প্রেমে হরি, ব'ধে ব্রজনারী
গেল মধুপুরী, কোরে অনাথা।
কোন প্রেমফলে, কালিন্দীর কূলে
কৃষ্ণপদ পেলে, মাধবীলতা॥

*

রসিক হইয়ে এমনো কে করে।
কাণ্ডারী হইয়ে, তরঙ্গে ডুবায়ে,
রঙ্গ দেখে গিয়ে, দাঁড়ায়ে দূরে।
প্রাণ তুমি হে লম্পট, নিতান্ত কপট,
প্রকাশিলে শঠ খল আচারে।
নহে কেবা কোথা, এত নিষ্ঠুরতা,
কোরেছে সর্ব্বথা নিজজনারে॥

প্রাণ, আরো একো শুনো, বচনে তোমারো
দাঁড়ালেম্ কুলের বাহিরে।
প্রাণ তুমি জেনে শুনে, বিরহতুফানে,
ভাসালে এ জনে, ছলনা কোরে॥

তোমার চরিত, পথিক যেমত,
হয়ে শ্রান্তিযুত, বিশ্রাম করে।
শ্রান্তি দূর হোলে, যায় সেই চোলে,
পুন নাহি চায় ফিরে॥

লালু নন্দলাল

কবি লালু নন্দলাল, রামু ও নৃসিংহের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার নিজের এক কবির দল ছিল, এবং তিনি বহু সংখ্যক গীত রচনা করিয়াছিলেন। সে সকল রচনার অধিকাংশই এখন লুপ্ত বা দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। বহু প্রচেষ্টায় বাংলার একটি বুলবুলের একটি মাত্র গীত রচনাই সংগৃহীত হইয়াছে।

হল এই সুখ লাভ,
পিরীতে চিরদিন গেল কাঁদিতে॥
হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার,
গিয়েছে—না যাবে কুল,
ডুবেছি—না ডুব দিয়ে দেখি পাতাল কত দূর
শেষে এই হল কাণ্ডারী পালাল,
তরণী লাগিল ভাসিতে॥
ধন প্রাণ যৌবন দিয়ে
শরণ লইলাম যার—তবু তার মন
আমার হইল ভার।
না পুরিল সবি উদয়ে-বিচ্ছেদ
মিছে পরিবাদ জগতে॥

এই একটি মাত্র গীত রচনাই লালু নন্দলালকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। ভাবের অকৃত্রিম প্রকাশে এই গীত রচনা রসভারে ছলোছলো। এবং তাই এ রচনা বঙ্গ সাহিত্যে একটি সার্থক সৃষ্টি।

গোঁজলা গুঁই

গোঁজলা গুঁই, রাসু ও নৃসিংহ, লালু নন্দলাল প্রভৃতি ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি গীতির প্রথম প্রবর্ত্তকদের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার রচিত একটি গানই মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে, অন্যান্যগুলি এখন একেবারে দুষ্প্রাপ্য। এই একটি মাত্র গানেই কবির কবিত্বের পরিচয় সকলে সঠিক বুঝিয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁহাকে যোগ্য আসনে বসাইয়া উপযুক্ত সম্মান দেখাইবে।

এসো এসো চাঁদবদনি,
এ রসে নীরস করো না ধনি।
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ
তুমি কমলিনী আমি যে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ
তুমি আমার তায় রতন মণি॥
তোমাতে আমাতে একই কায়—
আমি দেহ প্রাণ তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি॥

কেষ্টা মুচি

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অন্যান্য বহুল প্রচারিত কবিদের সমসাময়িক কেষ্টা মুচি নামে আর একজন কবির গীত রচনার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত যে বাংলা দেশের উচ্চবর্ণের জনগণ কুসংস্কারের প্রভাবে নিম্নবর্ণের লোকেদের কোনদিনই শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠা করে নাই। তাহা যে সব ক্ষেত্রে সঠিক নয় কেষ্টা মুচির কবি হিসেবে বঙ্গ-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাই তাহা প্রমাণ করে। কুসংস্কার বাংলাদেশে ছিল প্রচুর এবং আজও আছে, কিন্তু গুণীর আদরও বাংলা দেশ চিরদিনই করিয়াছে। কেষ্টা জাতিতে মুচি, জাত ব্যবসাও করিত আবার পেশাদারী কবির গানও গাহিত। তাঁহার একটি মাত্র গীত রচনা এই সঙ্গে

সন্নিবেশিত হইল এবং এই একটি মাত্র রচনাতেই তাঁহার কবিত্ব প্রতিভা জাজ্বল্যমান।

হরি কে বুঝে তোমার এ লীলে।
ভাল প্রেম করিলে—
হইয়ে ভূপতি, কুবুজা যুবতী পাইয়ে শ্রীপতি
শ্রীমতী রাধারে রহিলে ভুলে॥
শ্যাম সেজেছ হে বেশ, ওহে হৃষীকেশ,
রাখালের বেশ, এখন কোথা লুকালে।
মাতুল বোধিলে, প্রতুল করিলে
গোপগোপীকুলে, গোকুলে অকূলে
ভাসায়ে দিলে॥

ভোলা ময়রা

কলিকাতার অন্তর্গত সিমুলিয়াতে হরুঠাকুরের চেয়ে বয়সে কিছু ছোট বাংলার বিখ্যাত কবিগান রচয়িতা ভোলা ময়রা জন্মগ্রহণ করেন। ভোলা ময়রা হরু ঠাকুরের সুযোগ্য ও অত্যন্ত স্নেহাস্পদ শিষ্য ছিলেন। ভোলা ময়রার গুণে মুগ্ধ ওস্তাদ হরু ঠাকুর তাঁহাকেই ভাল ভাল গান ও সুর বাঁধিয়া দিতেন। সেজন্য অন্যান্য শিষ্যেরা রীতিমত ঈর্ষান্বিত হইত। ভোলা ময়রা নিজেই দল বাঁধিয়া পেশাদারী কবিগান করিতে আরম্ভ করেন। বিখ্যাত রচয়িতা সাতু রায় (সাতকড়ি রায়) ভোলা ময়রার দলে অবৈতনিক ভাবে গীত রচনা করিয়া দিতেন। গদাধর মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবি গীত রচয়িতাগণ তাঁহার দলে বেতনভোগী বাঁধনদার ছিলেন। এই সব কারণেই ভোলা ময়রার নিজস্ব গীত রচনা অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। প্রচুর সুনাম যশ অর্জন করিয়া প্রায় ৭৩ বৎসর বয়সে বিখ্যাত কবি গায়ক ভোলা ময়রা পরলোকগমন করেন। তাঁহার কবির দল এক সময়ে দেশ-বিদেশে অসাধারণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই সঙ্গে ভোলা ময়রার নিজস্ব মাত্র একটি গীত রচনা সন্নিবেশিত হইল।

চিন্তা নাই চিন্তামণির বিরহ
ঘুচিল এতদিনের পর।

অন্তর জুড়াও গো কিশোরী
হেরে অন্তরে বাঁকা বংশীধর ॥
যে শ্যাম বিরহেতে ছিলে কাতরা নিরন্তর,
সেই চিকণ কালা হৃদে উদয় হল,
এখন সুশীতল কর গো অন্তর ॥
যদি অন্তরে অকস্মাৎ উদয় হল রাধানাথ,
আছে এর চেয়ে বল, কি আর সুমঙ্গল,
বুঝি নিবলো রাধে
তোমার অন্তরের কৃষ্ণবিরহ-অনল।
হেরে অন্তরে কালাচাঁদ অন্তরের পুরাও সাধ
অন্তর করো না আর নীল কমল ॥
এ সময় পরশিতে বলো না, হয় পাছে অমঙ্গল
বিধি এই করুন, ঘুচুক শ্যাম বিচ্ছেদ,
রাই তোমার।
ওগো চন্দ্রমুখী, কৃষ্ণ সুখে সুখী,
তোমায় সদা দেখি সাধ সবাকার ॥
রাধে তোমার দুঃখ আর নাহি সহে সবাকার,
কহিলেন মাধব আজি
বিরহানল বুঝি সুশীতল ॥

নীলু ঠাকুর

ওস্তাদ হরু ঠাকুর, বিখ্যাত রাম বসু প্রভৃতি কবিওয়ালাদের পরবর্তীদের মধ্যে নীলমণি ঠাকুর অন্যতম। ইনি প্রথমে হরু ঠাকুরের দলে ছিলেন। কিছুকাল পরে নিজে দল বাঁধেন। এইরূপে নিজে দল বাঁধার পরও হরু ঠাকুর তাঁহাকে গীত রচনা করিয়া দিতেন। নীলু ঠাকুরের আর এক সহোদর ছিলেন। তাঁহার নাম রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদও ভ্রাতার কবির দলে থাকিয়া কবিগান করিতেন। সেই কারণেই এই কবির দল নীলু রামপ্রসাদী দল নামে বিখ্যাত ছিল। নীলু

ঠাকুরের নিজস্ব রচনা গীত খুব বেশী ছিল না। প্রসিদ্ধ কবি গীতি রচয়িতা কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য নীলু ঠাকুরের দলের জন্ম গীত রচনা করিয়া দিতেন।

রাঙ্গা ফলদাত্রী, ভূধাত্রী,
ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী আপনি,
ব্রহ্মরূপিণী, ব্রহ্মার জননী
ব্রহ্মরন্ধবাসিনী
হয় ব্রহ্মজ্ঞানী যারা সব,
তাদের নিরাকার তুমি ব্রহ্ম,
মা তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম,
তারা কি মর্ম্ম জানে তার !
হয় যে মন্ত্রে যে জন দীক্ষে
সেই মন্ত্র তারি পক্ষে,
হে দুর্গে আমি এই ভিক্ষে চাই,
যেন ভক্তি থাকে তোমার রাঙ্গাপায়,
আমার মুক্তি পদেতে কাজ নাই,
আমি শুনেছি শিবউক্তি সেবিব
শিব শক্তি
কোরেছি মনে মনে যুক্তি তাই।
ভবের ভাব্য ধন, শিবের সেব্য চরণ,
যেন জন্ম জন্মান্তরে পাই ॥
চন্দনাক্ত রক্ত জবা লয়ে,
কোরে শ্রীমস্তে অভিষিক্ত
জাহ্নবী জলযুক্ত,
দিব আরক্ত পদদ্বয়ে,
বলে নির্ব্বাণে কি আর হবে,
বিজ্ঞান দেহি যে শিবে,
সজ্ঞানে, এই ভবে
আসি যাই
ওমা, অলস-নাশনা,
রসনার বাসনা,
ঘোষণায় খুশি তব নাম ;
ওমা শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে,
দুর্গা বোলে ডাকি অবিশ্রাম।
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ উপেক্ষ,
দুর্গানাম উপলক্ষ যার।
নিত্য যেই জন, সত্য আচরণ,
তীর্থ পর্য্যটন কি কার্য্য তার।
গয়া গঙ্গা ব্রজ বারাণসী,
হয় ভ্রমণে ভ্রম তীর্থ,
কাবেরী কুরুক্ষেত্র,
ঐ পদে যত তীর্থরাশি।
স্মরণ করিয়ে তারা,
মুদিয়ে নয়নতারা,
বদনে তারা তারা গুণ গাই ॥

যজ্ঞেশ্বরী

যজ্ঞেশ্বরী বাংলার একজন খ্যাতনাম্নী স্ত্রীকবি। ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর প্রভৃতি কবি গায়কদের সমসাময়িক ছিলেন যজ্ঞেশ্বরী। তাঁহার নিজের এক কবির দল ছিল। যজ্ঞেশ্বরী নিজেই দলের জন্য গীত রচনা করিতেন। অসাধারণ সুনাম ও যশের সঙ্গে এই মহিলা কবি বাংলা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার গীত রচনার অতি অল্পই সন্ধান মেলে। কি পুরুষ কবি, কি স্ত্রী কবি—বাংলাদেশ কখনও গুণীর যোগ্য সমাদর করিতে ভোলে নাই, ভুলিবেও না। যজ্ঞেশ্বরীর দুইটি মাত্র রচনা এই সঙ্গে সন্নিবেশিত হইল।

কর্ম্মক্রমে আশ্রমে সখা হলে
যদি অধিষ্ঠান;
হেরে সুখ, গেল দুঃখ,
দুটো কথার কথা বলি প্রাণ॥
আমায় বন্দী করে প্রেমে,
এখন ক্ষান্ত হলে হে ক্রমে ক্রমে
দিয়ে জলাঞ্জলি এ
আশ্রমে।
আমি কুলবতী নারী,
পতি বই আর জানিনে;
এখন অধীনী বলিয়ে ফিরে
নাহি চাও;
ঘরের ধন ফেলে প্রাণ,—
পরের ধন আগুলে বেড়াও
নাহি চেন ঘর বাসা
কি বসন্ত কি বরষা,

সতীরে করে নিরাশা,
অসতীর আশা পুরাও।
রাজ্যে থেকে ভার্য্যের প্রতি
কার্য্যে না কুলাও॥
তোমার মন হল বার বাগে,
গেল জন্মটা ঐ পোড়া
রোগে,
আমার জন্মটা ঐ পোড়া
রোগে,
আমার সঙ্গে দেখা দৈবার্থ
যোগে
কথা কহিছ আমার সনে,
মন রয়েছে সেখানে,
প্রাণ মনে কর সখা,
পাখা হলে উড়ে যাও।
অনেক দিনের পরে, সখা তোমারে,
দেখতে পেলাম চোখেতে।

ভাল বল দেখি, তোমার
সখার সংবাদ।
ভাল ত আছেন প্রাণেতে॥
তার মনে ত নাই এ অধীনীরে,
নবীনার প্রাণধন, হয়ে তিনি
এখন,
ভেসেছেন সুখসাগরে।
ভাল সুখে থাকুন তিনি,
তাতে ক্ষতি নাই,
আমায় ফেলে গেলেন কেন
শাঁখের করাতে॥
বলো বলো প্রাণনাথেরে,
বিচ্ছেদকে তাঁর ডেকে নে যেতে।
যদি থাকে ধার, না হয় শুধবই
আসবো তার;

কেন ডসিল করে পোড়া
মজিল করাতে।
আমার হল উদোর বোঝা
বুধোর ঘাড়েতে॥
তিনি প্রাণ লয়ে হে হলেন
স্বতন্তর,
মদন তা বুঝে না, বলে শুনে না,
আমার ঠাঁই চাহে রাজকর।
দেখি ঠাঁই চাহে রাজকর।
দেখি খাপ দেশের পাপ বিচার,
দোহাই আর দিব কার,
সদা প্রাণ বধে কোকিল
কুহুস্বরেতে॥

সাতু রায়

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নদীয়া শান্তিপুরের নিকটবর্তী বৈচি গ্রামে সাতুরায় বা সাতকড়ি রায় জন্মগ্রহণ করেন। নিজের কোন কবির দল না থাকিলেও একজন প্রসিদ্ধ কবি-গীতি-রচয়িতা বলিয়া তিনি অসাধারণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। পেশাদারী গীত রচনার কাজ তিনি কখনও করেন নাই। রোজগারের জন্য তিনি অন্য চাকুরী করিতেন। তাই অবৈতনিকভাবে কবিওয়ালাদের কবিগান বাঁধার কাজ তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল। অল্প বয়সে তিনি শান্তিপুরের জমিদারের কাছারীতে কাজ করিতেন এবং এই সময় শিবচন্দ্র বাবুর সখের কবির দলে অনেক গান তিনি রচনা করিয়া দেন। বিখ্যাত ভোলা ময়রার দলেও তিনি অনেক গান রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে রাণাঘাটের জমিদার পালচৌধুরীদের তরফে অনেকদিন তিনি বারাসতের মোক্তারীর কাজ করিয়াছিলেন। সঙ্গীত রচনায় বাল্যকাল হইতেই তাহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। জাতিতে সাতু রায় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

কও কথা বদন তুলে, হও সদয়,

এই ভিক্ষা চাই ॥

রাধার অধৈর্য্যে, এলেম অপার্য্যে,

তোমার কংস রাজ্যের অংশ ল'তে

আসি নাই ॥

সঙ্গিনী প্রধানা, রঙ্গিণী যে জনা,

ভঙ্গিক্রমে কৃষ্ণে কয় ;

ছিলে নব্য রাখাল, হ'লে ভব্য ভূপাল,

এবে সভ্য এই কংসালয় ।

আমার এই দশা (দেখ হে !)

আমি ব্রজের সেই বৃন্দে ;—

বিক্রীত শ্রীমতীর পদারবিন্দে ।

পার কি চিন্‌তে, কেন সচিন্তে,

তোমার চিন্তা কি চিন্তামণি, চিন্তা নাই ॥

অধোবদনে রবে যদি, বাঁকা মদনমোহন,

তোমার কুবুজার দোহাই ।

তোমার সহাস্য বদনে নাহি রহস্য,

কিসে এত ঔদাস্য ।

তোমার চন্দ্রাস্য নহে আজি প্রকাশ্য ।

যেন সর্ব্বস্ব নিতে এলেম ভাবছ তাই

অন্ত মনে কেন রইলে, কথা কইলে,

ক্ষতি কি তোমার ।

(শ্যাম হে) যেতে হবে না পুনঃ বৃন্দাবন,

ল'তে হবে না রাধার ভার ।

তোমার দাসত্ব গিয়েছে, রাজত্ব বেড়েছে,

তত্ত্ব কর্ত্তে হয় একবার ;

আমরা অর্থলোভে, আসি নাই হে

কেবল স্বার্থ ভেবে শ্রীরাধার ॥

সে ত রাজার নন্দিনী, আর

রাজ্যেশ্বর ;—

তুমি ত নূতন রাজা বংশীধর ॥

তোমার কি ধর্ম্ম, তোমার কি কর্ম্ম

মর্ম্ম জানতে পাঠালেন ব্রজের রাজা রাই ॥

*

বল উদ্ধব ! তোমার মনে আবার কি

আছে ?

একবার এসে অক্রুর মুনি, কর্লে কৃষ্ণ-

কাঙালিনী,

ব্রজের ধন নীলকান্ত মণি, হ'রে লয়ে

গিয়েছে ।

উদ্ধবের আগমন দে'খে বৃন্দাবনেতে ;

বৃন্দে ধায়, গিয়ে খেদ জানায়,

পথমধ্যেতে ।

কও হে উদ্ধব, কও কিমর্থে আগমন ?—

আসা সুলক্ষণ, কি হে বৈলক্ষণ,

কোন্ ছলে গোকুলে আসি কর্‌লে

পদার্পণ !

দেখে মথুরা-নিবাসী ভয় হয়,

একজন এসে ছদ্মবেশে,

প্রেম ভেঙে, বাদ সেধেছে ।

সাধু হও যদ্যপি, তথাপি সন্ধ হতেছে ।

যেমন সেই অক্রুর দেখ্‌তে সুধার্ম্মিক ;—

তোমায় ততোধিক, দেখ্‌ছি শতাধিক,

সুধারা বৈষ্ণবের ধারা, সজ্ঞানী সাত্বিক ।

কিন্তু কুগ্রামনিবাসী যারা হয় ;

ধর্ম্মরহিত, তাদের চরিত, ধর্ম্মশাস্ত্রে

লিখেছে ॥

*

ফেরো উদ্ধব ! শূন্য ব্রজে প্রবেশ করো

না ।

কৃষ্ণ বিনে গোষ্ঠ শূন্য, কানন শূন্য, নগর শূন্য,
কমলিনীর কুঞ্জ শূন্য, সকল শূন্য দেখ না ॥
কৃষ্ণের কথায়, আজ হেথায় আগমন তোমার ;
গোপিকার বিরহ-বিকার, করতে প্রতিকার।
কৃষ্ণ প্রেমানল, মনানলময় ;—
সে কি নির্ব্বাণ হয় ! দেখ গোকুলময়,
হতেছে খাণ্ডবের মতন অগ্নিবৃষ্টিময় !
দিলে প্রবোধবারি, কি হইবে তায় !
দাবানলে যে বন জ্বলে, জল দিলে তা নিবে না।
করি কৃতাঞ্জলি বলি হে, কথা ঠেলো না।
দেখ্‌গে হে উদ্ধব, ব্রজের দুঃখ সব ;—
আমরা গোপী সব, জীবন থাকতে শব ;
সবার দশা সমান দশা, করেছেন কেশব।
ঘুচবে সকল জ্বালা, এলে সেই কালা ;
নৈলে বেঁচে কি সুখ আছে ম'লেই ঘোচে যন্ত্রণা।
নবীন বিরহিণি বিদেশিনি ! কোথায় যাস্‌ গো বল,
কুঞ্জবনে ফিরে ফিরে, কি জন্যে চাস্‌ ফিরে ফিরে,
নয়নের নীরে নীরে, ভাসে নয়ন শতদল ॥
চঞ্চলা চপলার মত, নিতান্ত চঞ্চল।
হরি ভয়ে করী যেমন, পলাইয়ে যায় ;—
সখি ! তোর দেখি তেম্‌নি ধারা
ধরিতে না পারে ধরা,
এমন ধারা মেয়ের ধারা, কভু ভাল নয়।

এলি এম্‌নি ছলে বৃন্দাবনে।
ভ্রমণ করিস্‌ বনে বনে, কি আছে তোর মনে মনে.
মনের কথা আমায় বল ॥
দুর্জ্জয় মানেতে হয়ে অপমান,
কালাচাঁদ, সেই মানের করতে শেষ !
ব্রজরাজ, ত্যজে রাখাল সাজ,
যুবরাজ, ধরলেন আজ যুবতীর বেশ :
কপালে সিন্দুর বিন্দু, সহাস্য বদন ;—
তাতে সজল নয়নোপরে, কজ্জল উজ্জল করে,
জলধরে শোভা ধরে, বিজুলি যেমন।
হে'রে মনমোহিনী মনের সঙ্গে,
কৌশলে জিজ্ঞাসে বৃন্দে,
বিধুমুখি, বৃন্দাবন কি করতে এলি রসাতল ? ॥
কিবা গজেন্দ্রগতি যুবতী গো !
গলায় গজমতি দুলছে ;
কবরী আ-মরি কি শোভা পায় !
কনক চাঁপা তায় ঝুলছে।
অঙ্গে সোণা, কাণে শোনা,
সেই সোণা গোকুলের ধন ;
প্যারী তায়, দুর্জ্জয় মানের দায়,
মানকুণ্ডে দেছে বিসর্জ্জন।
সেই হ'তে নিকুঞ্জেতে, কেহ সুখী নাই ;—
ভাসে শুকশারী নয়ন-জলে,
কোকিল কাঁদে তমাল-ডালে,
ভ্রমর কাঁদে শতদলে,
কুঞ্জে কাঁদেন রাই।
কাঁদে স্থানে স্থানে ব্রজাঙ্গনা,

কেউ কারো কথা শুনে না,
বিঃহেতে প্রাণ বাঁচে না,
দুঃখে বহে নয়ন-জল ॥
দে'খে তোর ভঙ্গি রঙ্গিণি গো!
চেনো চেনো চেনো জ্ঞান করি;
সদাই সন্ধ মনে, তাইতে ব্যানে,
কিছু বলি বলি বলিতে নারি ॥
তরুণ অরুণ, যেন দুনয়ন,
কিরণেতে জগত আলোময়;
শশধর জিনি কলেবর, অধর তুলনা
নাহি হয়।
ক্ষীরোদ মন্থনে যেমন, নীরদ বরণ,
সুরাসুরে করে ছলা, মন্‌মোহিনী চিকণ
কালা,
ষোল কলা দে'খে ভোলার ভুলে গেল
মন।
অঙ্গে অম্বর সম্বর নাই,
এলো থেলো দেখ্‌তে পাই,
চ'লে যেতে রাজপথে, ধূলাতে লুটায়
অঞ্চল ॥

নিরদয় পদদ্বয়, লিখি নাই সেই
আশঙ্কায়।
সই, সময় যখন মন্দ হয়, চিত্র ময়ূরে
গেলে হায়
বিচিত্র কি গো তার,
যদি চিত্র শ্যাম মধুপুরে চলে যায়।
গোবিন্দের পদারবিন্দে,
বৃন্দে গো, হৃদয়ে করেছি ধারণ।
অন্য সব অবয়ব ভূমেতে করেছি
লিখন ॥
লিখে লিখি নাই ত্রিভঙ্গের সেই
শ্রীচরণ।
কি কারণ বিবরণ শোন্‌গো,
তার চরণের কি আচরণ।
শ্যামকে লয়ে গেল মথুরায়,
আনলে না আর পুনরায়, সই সই গো,
রইলো সচল গিয়ে, অচল হয়ে মথুরায় ॥

আনটুনী সাহেব

জাতিতে আনটুনী সাহেব পর্তুগীজ হইলেও বাংলা দেশে কবিওয়ালা হিসাবে তিনি প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাহার পিতা ফরাসডাঙ্গার একজন অবস্থাপন্ন অধিবাসী ছিলেন। বাংলার এক ব্রাহ্মণ যুবতীর সঙ্গে কালক্রমে আনটুনীর প্রণয় সংঘটিত হয়। স্বীয় কুলত্যাগ করিয়া আনটুনীকে অবলম্বন করিলে আনটুনীর ফরাসডাঙ্গায় বাস করা প্রায় অসম্ভব হইয়া ওঠে। তখন তিনি সেই যুবতীকে লইয়া আসিয়া গরীটি গ্রামে বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার সেই বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আজিও বর্তমান রহিয়াছে। কথিত আছে যে সেই ব্রাহ্মণ কন্যা আনটুনীর ন্যায় একজন ম্লেচ্ছকে প্রিয়পদে বরণ করিলেও হিন্দুধর্মানুমোদিত আচার তিনি যথারীতি পালন করিতেন এবং তাঁহারই উৎসাহে আনটুনী অপরিসীম আগ্রহে হিন্দু-ধর্মানুযায়ী দুর্গোৎসবাদি পূজাপার্বণের অনুষ্ঠান করিতেন। এই সময়ে দেশে কবিগানের খুবই প্রচলন। পূজা-পার্বণে অ্যানটুনীর বাড়ীতেও কবিগান হইত। বাংলার মেয়ের সাহচর্যে আনটুনী বাংলাভাষা চমৎকার শিখিয়াছিলেন। তাই কবির দলের গান তিনি বুঝিতেনও অনায়াসে। ক্রমে এই ধরনের কবিগানে আনটুনী একটা নেশা জন্মিল যেন। এই সময় তিনি ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রচুর ক্ষতি করিয়াও একটি সখের কবির দল নিজেই খুলিয়া বসিলেন। গীতিকার গোরক্ষনাথ ঠাকুর প্রথম প্রথম তাঁহার সেই দলের জন্য গীত রচনা করিয়া দিতেন। শেষে গোরক্ষনাথকে ছাড়িয়া দিয়া তিনি নিজেই দলের জন্য গীত রচনা শুরু করিলেন। কিছুকাল পরে এই সখের দল ক্রমে পেশাদার দলে পরিণত হয়। আনটুনী সাহেব পুরাপুরি বাঙ্গালীর পোশাকে, কবিগানের আসরে অবতীর্ণ হইতেন। পর্তুগীজের গৌরবর্ণে বাঙ্গালীর পোশাকে তাঁহাকে মানাইত চমৎকার।

খৃষ্টে আর কৃষ্ণে কিছু প্রভেদ নাইরে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে,
এও কোথা শুনি নাই॥

আমার খোদা যে, হিঁদুর হরি সে—
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে
আমার মানব-জনম সফল হবে,
যদি রাঙ্গা চরণ পাই॥

অপাঙ্গে করুণা কর,
ওগো মাতঃ মাতঙ্গি
ভজন সাধন জানি না মা!
জেতে আমি ফিরিঙ্গী *
জয়া যোগেন্দ্রজায়া,
মহামায়া মহিমা অসীম তোমার।
একবার দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে,
যে ডাকে মা তোমায়,
তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার॥
মা, তাই শুনে এ ভবের কূলে,
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, বিপদকালে,
ডাকি—দুর্গা কোথায় মা, দুর্গা কোথায় মা।
তবু সন্তানের মুখ চাইলে না মা,
আমায় দয়া কোর্‌লে না মা,
পাষাণে প্রাণ বাঁধ্‌লি উমা,
মায়ের ধর্ম্ম এই কি মা?
অতি কুমতি কুপত্র ব'লে,
আপনিও কুমাতা হ'লে—আমার কপালে,
তোমার জন্ম যেমনি পাষাণ-কুলে,
ধর্ম্ম তেমনি রেখেছ
দয়াময়ী আজ আমায় দয়া কোর্‌বে কি মা,
কোন্ কালে বা কারে তুমি দয়া ক'রেছ।
জানি, তোমার সাধন করি,
ব্রহ্মা হ'লেন ব্রহ্মচারী—দণ্ডধারী;

দেখ সকল ফেলে ক্ষীরোদজলে
ভাস্‌লেন শ্রীহরি;
আবার শূন্য করে সোণার কাশী,
ওগো শ্যামা সর্ব্বনাশী,
শিবকে করে শ্মশানবাসী,
সন্ন্যাসী তায় সাজিয়েছ।
নাম কেবল করুণাময়ী, করুণা শূন্য হ'য়েছ॥
মা তুমি দক্ষরাজকুমারী, দক্ষযজ্ঞে গমন করি,
যজ্ঞেশ্বরী যজ্ঞ হেরি নয়নে,
শিব বিহনে, শিব অপমানে, মা সেই অভিমানে,
এমন সাধের যজ্ঞ ভঙ্গ দিলি,
দক্ষরাজায় নিদয় হলি,—আপনি মলি,
তারেও মেলি, পিতার দুঃখ ভাব্‌লিনে।
তখন, যার অপমান শুনে কানে,
প্রাণ ত্যজেছ বিষাদ মনে—দক্ষভবনে
আবার আপনি উমা, কঠিন প্রাণে,
তার বুকেতে পা দিয়েছে।
তুমি তার, তার, তার, না তার, না তার,
আপনার গুণে তোর্‌বো,
দুর্গানাম তরি, মস্তকেতে করি,
যতন করিয়ে রাখ্‌বো;
আমার অন্তে শমন এলে, অজপা ফুরালে,
দুর্গা দুর্গা বলে ডাক্‌বো॥

---

* এই গানের পদান্তর দৃষ্ট হয়:—
আমি ভজন সাধন জানিনে মা
নিজেতে ফিরিঙ্গী।
'যদি দয়া করে কৃপা কর, হে শিব মাতঙ্গী'

মা অসাধ্য তোমার সাধন, কোরলে
সাধন,
কেবল তার নিধন হ'তে হয়।
একবার তারা ব'লে যে ডেকেছে, সেই
ডুবেছে,
তারা তোমার ধারা তো মায়ের
ধারা নয়॥
মা, রাবণরাজা অন্তিমকালে, রঘুনাথের
রণস্থলে,
দুর্গা ব'লে ডেকেছিল বদনে।
তবু তার পানে ফিরে চাইলিনে,
তার দুঃখ ভাব্‌লিনে,
তারে ধ্বংস ক'রে ভগবতী,
নিদয় হলি ভক্তের প্রতি,
শেষকালে তার বংশে বাতি,—
দিতেও কারে রাখ্‌লিনে॥
আগে ছিল না তার কোন শঙ্কা,
বাজাতো জয়কালীর ডঙ্কা,—অতি তেজ
ডঙ্কা,
আবার ছল করে তার সোনার
লঙ্কা
দগ্ধ করে এসেছ॥ *

*এই গানটি আন্টুনীর দলে গীত হইত। কিন্তু কাহারও কাহারও মতে গানটি—ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তীর রচিত।

নীলমণি পাটনী

হরু ঠাকুর ও রামবসুর পরে কবিওয়ালা হিসাবে নীলমণি পাটনী অসাধারণ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাহার নিজেরও একটি কবির দল ছিল। সে দলেরও একসময় খুবই প্রতিপত্তি ছিল। নীলমণি পাটনীর রচিত গীত এখন খুব অল্পই পাওয়া যায়। সামান্য কয়েকটি এই সঙ্গে সন্নিবেশিত হইল। গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গীত রচয়িতাগণও তাঁহার দলে গীত রচনা করিতেন।

মা মহারাধ্যা তারা,
তোমার নাম, মোক্ষধাম, তন্ত্রে শুনতে
পাই।
তাইতে তারা, তোমায় তারা,
তারা তারা তারা বোলে, ডাক্‌ছি মা
সদাই।
তুমি তারা, স্বং ত্রিগুণধরা, অনন্ত
ব্রহ্মাণ্ডের তারা,
তোমায় ধরা সে, সে ত বিষম দায়।
তারা গো মা, কেবল ভক্তির ফল-
সাধনার ফলে,
ডাকি দুর্গা দুর্গা বোলে,
ধোরেছিল ব্যাধের ছেলে, কালকেতু
তোমায়।
এবার বেঁধেছি মন আঁটা-আঁটি,
কোরেছি মন খুব খাঁটী,
তারা গো মা, এবার ধোরেছি পাষাণের
বেটী,

আর পালাতে পার্‌বিনে।
তারা গো আজ তারাধরা ফাঁদ পেতেছি
মা,
হৃদয় কাননে॥
আমায় বোলেছে সেই মহাকাল,
আছে গুরুমহামন্ত্র জাল,
সাধনপথে সেই জাল পেতে
থাক্‌বো কিছু কাল,—
এখন ভক্তি-ডোর কোরেছি হাতে,
তারা যদি যাস্‌ সে পথে,
ধোর্‌বো মা তোর হাতেনাতে বাঁধবো
দুটী চরণে॥
মন-কারাগারে, তোমায় রাখ্‌বো
মা অতি যতনে।
তোমায় লোকে দেয় নানা পূজা,
ষোড়শোপচারে পূজা,
তেমন পূজা কোথা পাব বল্‌,
তারা গো মা কেবল গঙ্গাজল অঞ্জলি
কোরে,
মানকে নৈবেদ্য করে,
দিব মা তোর চরণ ধোরে, নির্ম্মল
গঙ্গাজল।
আমি কোথা পাব অন্ন বলি, মহিষাদি
অজাবলি,
দিব ছয় রিপুকে নরবলি, দুর্গা বোলি
বদনে।
মা, এবার পলাবার পথ তোমার নাই,
উপায় নাই, সন্ধান নাই।
তারা ধোর্‌বো বোলে তারা,
মুদিয়ে পাপ চক্ষের তারা,
রেখেছি জ্ঞান-চক্ষের তারা প্রহরী
সদাই॥
মা কে জানে তোমার লীলে,
কি ছলে কোন্‌ ভাবেতে রও;
কোরে যতন, বহু যতন,
ধনধান্য নানা রতন, দিলেও তুষ্ট
নও।
তোমায় রাবণ সেই লঙ্কাপুরে,
অতি যত্নে যত্ন কোরে,
পূজা কোরে সবংশেতে যায়।
তারা গো, আবার শ্রীমন্তে প্রসন্ন
হোয়ে,
বিনা পূজায় আপনি গিয়ে
মশানেতে অভয় দিয়ে, রক্ষা কোরিল
তায়।
এখন পরমার্থ পরম ধনে,
আছিস্‌ মা তুই পরম ধনে,
তারা গো, তোমায় যে ভজেছে,
সেই পেয়েছে, ব্যাস লিখেছেন
পুরাণে॥

গোরক্ষনাথ

গোরক্ষনাথের নিজস্ব কোনও কবির দল ছিল না। অন্য যে কোন দলে, প্রধানত আনটুনী সাহেবের দলে তিনি গীত রচনা করিয়া দিতেন। একবার চুঁচুড়ার কোনো বিশিষ্ট ভদ্রলোকের গৃহে তিনি বাঁকিয়া বসেন। আনটুনী সাহেবের নিকট তখন তাহার বহুদিনের বেতন পাওনা। গোরক্ষনাথ বলিয়া বসিলেন সব পাওনা না মিটাইয়া দিলে তিনি আর কোনো গীত রচনা করিয়া দিবেন না। তখন দুর্গাপূজা আগতপ্রায় তাই আনটুনী সাহেব প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া নিজেই আগমনীর গান রচনা করিয়া সে আসরে মানরক্ষা করিলেন। গোরক্ষনাথের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক সেখানেই শেষ হইল। গোরক্ষনাথের অধিকাংশ গান এখন দুষ্প্রাপ্য।

ভাগ্যে যা আছে তাই হবে সই,
কি হবে ব্যাকুল হলে?
এখন ভ্রান্তি পরিহরি, বাঁচাও সই
কিশোরী,
হরিমন্ত্র শুনাও প্যারীর শ্রবণ-মূলে
কেন ব্রজধাম, ত্যাজে
যাবেন শ্যাম,
রাধার দুঃখের কপাল না হলে!
মনে জ্ঞান হয়, জন্মান্তরে,
আমরা কৃষ্ণ হরি সখি, নি'ছিলাম
কার।
বুঝি সেই শাপে এ মনস্তাপে,
দহিল প্রাণ গোপিকার।
নহিলে যার নামে বিপদ যায়,
প্রাণ সঁপে সেই শ্যামের পায়
রাধার প্রাণ যায়, গোকুল ভাসে দুঃখ
সলিলে

গিয়াছেন মধুপুরে শ্রীকৃষ্ণ ত্যাজিয়া
শ্রীবৃন্দারণ্য,
কারে বল সই, শুন্‌তে রাধার
যন্ত্রণা।
ওযে শ্যামের চরণ-চিহ্ন, সখি ঐ
যার পদচিহ্ন
সেই মাধব যখন দুঃখ বুঝ্‌লে না।
অরণ্যে রোদন, করিলে এখন,
ঘুচ্‌বে না মনের বেদনা।
রাধার সুখের কপাল তো নয়,
তা হ'লে কি এমন দশা হয়?
কাঁদে কৃষ্ণহীন হয়ে রাধা, পড়ে ভূতলে।
প্রাণ তুমি আর পথে এসো না।
শুধু দেখা দিবে সখা, সে তো তা
মনেতে বুঝে না
তুমি যার, এখন তার, পুরাও
বাসনা।

তোমা হতে সুখ যা হবার।
প্রাণ তো হোয়ে বোয়ে গিয়েছে
আমার।
দেখা হোলে মরি জ্বলে,
এমন দেখা সখা আর দিও না॥
আগে তোমায় দেখ্‌লে সখা,
হোতো পরমো আহ্লাদ।
এখন তোমায় দেখ্‌লে ঘটে হরিষে
বিষাদ।
এসো বসো বলা হলো দায়।
কি জানি কে গিয়ে সখা, বোলে দিবে
তায়।
সে তোমাকে, আমার পাকে, করিবে
লাঞ্ছনা॥

উচিত নয় রসময়, হেথা আসা
এখন।
নূতন রঙ্গিণী তোমার করিবে
ভৎর্সন।
আমায় বরং সখা, দিও দেখা, যুগ-
যুগান্তে।
অনাদর নাহি কোরো নব্য
প্রেমেতে।
নবরসে সে যে রঙ্গিণী!
প্রাণ হোয়েছে তোমার প্রেমের
অধীনী।
আমায় যেমন জ্বলিয়ে ছিলে,
প্রাণ তারে এমন জ্বালা দিও না॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত কবিওয়ালা রাম বসুর পরবর্ত্তী কবি গীতি রচয়িতা হিসাবে গদাধর মুখোপাধ্যায়েরও প্রচুর প্রসিদ্ধি জন্মিয়াছিল। রাম বসুর ন্যায় কবিগানের আসরে বসিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষের গানের জবাব রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কালীঘাটের এক সখের দলে এবং ভোলা ময়রা, লক্ষ্মীনারায়ণ, যোগী বলরাম বৈষ্ণব, হরিমোহন, বন্দ্যোপাধ্যায় নীলু পাটনী প্রভৃতি কবিওয়ালাদের দলে ইনি গীত রচনা করিয়া দিতেন। তাহার রচিত সব গীতই বিশুদ্ধভাব মূলক ও কবিত্বপূর্ণ। গদাধর মুখোপাধ্যায় যখন যে দলের গীত রচয়িতা থাকিতেন সেই দলেরই প্রসার প্রতিপ্রত্তি তখন বাড়িয়া উঠিত। তাঁহাকে দলে রচয়িতা হিসাবে নিযুক্ত করার জন্য কবিওয়ালের দলে সে যুগে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলিত।

পুরবাসী বলে উমার মা,
তোর হারা তারা এল ঐ !
শুনে পাগলিনী প্রায়, অমনি
রাণী ধায়
বলে—কৈ মা উমা কৈ ?
কেঁদে রাণী বলে, আমার উমা এলে !
একবার আয় মা, একবার আয় মা,
একবার আয় মা ! করি কোলে।
অমনি দুবাহু পসারী, মায়ের গলা
ধরি',
অভিমানে কেঁদে রাণী বলে।
কৈ মেয়ে ব'লে, আন্‌তে গিয়েছিলে !
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার
পিতাও পাষাণ,
জেনে, এলাম আপ্‌না হ'তে,
গেলেনাকো নিতে,
রব না গো, যাব দু'দিন গেলে ॥
পরের ঘরে মেয়ে দিয়ে মা, মায়া
কি পাসরি।
কৈলাসেতে বলে আমায় সবাই ;—
"তোর কি মা নাই ? তোর কি মা
নাই ?"
অমনি সরমে ম'রে যাই ॥
তাদের বলি, আমার পিতে, এসেছিলেন
নিতে,
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে ॥
আমার মনের ব্যথা, আছে মনে গাঁথা'
মা, কি বলিবে অন্যে, পিতৃদত্তা
কন্যে ;
চক্ষে দেখা দিলে পাগল স্বামী, সকলি
জান তুমি,

এ কি ক'বার কথা !
ঘরেতে সতীনের জ্বালা গো, তাও ত
শুনেছ সব।
শিব-সোহাগিনীর প্রায়, রেখেছেন
মাথায়,
সদাই কলকল রব।
তরঙ্গিণীর অভিমানের কথা,
আমার সয় না, আমার সয় না,
আমার হয় না সংক্ষতা।
আমি ভাবি কোথা যাব, কোথায় গে
জুড়াব,
কাঁদি ব'সে বিল্ববৃক্ষমূলে ॥
হিমালয় আর কৈলাস শিখর,
নহে দূর যাতায়াতে ;—
মনে হ'লে মা ! দিনে শতবার,
তত্ত্ব নিলে ত পার মা নিতে।
বাৎসল্য ভাবতে তাচ্ছল্য, কি সে,
শুনি, কহ মা।
আমি হ'তেম তোমার মা,
জানাইতাম মা,
মায়ের কত স্নেহ মা !
তোমার কঠিন হৃদয়, পিতাও নিদয় ;
হোক্ মা, ও হোক্ মা !
একবার তত্ত্ব ত নিতে হয় !
আমি এ সুখ শরদে, মরি মনের
খেদে,
কথায় কথায় কোন্ বা ব'লে
পাঠালে ॥
তুমি ব্রজেতে প্রেমের দায় বিক্রীত
রাধার পায়,

কৃষ্ণধন, রাধার কেনা ধন, হ'য়েছ
একবার।
সে ধনে অন্তের নাহি অধিকার ॥
শুনি, কও কও কও হে চিন্তামণি,
মরি খেদে, কেন কৃষ্ণধন থাকতে রাই
কাঙ্গালিনী।
ক'রে রাইপক্ষে পক্ষপাত, হ'লে হে
কুব্জার নাথ,
হরি, মোলো দুঃখে রাই, একবার চক্ষে
চক্ষে দেখলে না
হোক্ হোক্ পূর্ণ হোক্ কুব্জার মনের
মনের বাসনা ॥
কুব্জা ক'রেছে চন্দন দান, বাড়ালে
দাসীর মান,
তাই বামে দিলে স্থান।
কিন্তু, রাধার বই কুব্জার শ্যাম, কেউ
বোল্‌বে না।
বোঝা ভার, শ্যাম হে তোমার
করুণা।
যথা রও, তার হও হে, দেখ বুঝে ;
অগ্রে রাধা রাধা নামের পর,
তোমার কৃষ্ণের নাম সাজে।
আছে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম, বিখ্যাত যুগল
নাম,
হরিমধুর যুগলভাব লুকাতে পারবে না।
ষোড়শ গোপিনী শ্রীবৃন্দারণ্যে, তার
মধ্যে রাধা,
গোপীপ্রধানা ধন্ত মান্ত রাজকন্তে।
সবে দাস্তক্রিয়া ক'রে, পেলাম না তোমারে,
কুব্জার ফলো ফল ;—স্বপনে তাও ত
জানিনে,

ওহে চন্দনদানের এত ফল ॥
আমরা ত ফুল তুলসী দিতাম
সখা,—
ওহে হরি, ভাল, তাতেও ত ছিলহে
চন্দন মাখা।
বুঝি কৃষ্ণসাধনের ফল, ভাগ্যগুণেতে
ফলে ফল,
সে ফল অভাগী গোপীর ভাগ্যে
ফলো না।
নিভৃত নিকুঞ্জে দেখেছি সবাই'
বিহারিতে রঙ্গে বিনোদবিহারী,
সাথে বিনোদিনী রাই।
লিখে দাসখত স্বহস্তে, শ্রীমতীর
শ্রীহস্তে
দিলেহে কুঞ্জেতে, দয়াময়, তা ত মনে
হয়,
সে খতে সাক্ষ্য আছেন ললিতে।
তোমার সেই দাসখত লও হে হরি,
খাতক গেল, মিছে খত রেখে,
কি করিবেন রাই কিশোরী।
নিজ কর্ম্মের ফল পেলেন রাই,
তোমার দোষ কিছুই নাই,—হরি,
কিন্তু মর্ম্মচ্ছেদ ক'লে ধর্ম্মে সবে না ॥

দুই রাজ্যে দু'জন রাজা, বল প্রজা হ'ক
কার।
তুমি রাজা, ব্রজে রাই রাজা,
কৃষ্ণ আমরা দোহাই দিব কোন্
রাজার।
ললিতে বিসাখা, বৃন্দে চিত্ররেখা, আসি
মধুধাম,

রাজসভায়, রাজসম্বোধনে কয়,
রাজা কৃষ্ণে ক'রিয়ে প্রণাম।
শুন শুন ওহে বনমালী, ব'লি ব'লি.
সব মনের দুঃখের কথা তোমারে ব'লি।
আমরা কোথায় যাই, ব্রজে রইলেন রাই,
তুমি রইলে, পেয়ে কংসের রাজ্যভার।
জান্তে এলাম তাই শ্যাম হে যমুনার
পার।
থাকি ব্রজে একবার মনে ক'রি ;
তা কি পারি শ্যাম, তোমায় না দেখে
প্রাণে মরি;
এলে মথুরায়, মন ব্রজে ধায়,
প্রাণ কাঁদে হে, বিচ্ছেদে সেই শ্রীরাধার।
যখন কুঞ্জে ছিল হৃষিকেশ—
প্রেমরাজ্যের কথা হ'য়েছে
শ্রীরাধার হে ;
ব্রজের রাজ্য ছিল রামরাজ্যের প্রায়,
নাহি ছিল দুঃখের লেশ।
পরমসুখেতে গোপিকাগণ হে ক'রিত
সুখে বাস,
উঠ্‌ত নিত্য রসের লহরী,
রাধাকৃষ্ণে করিতে বিলাস।
এখন কৃষ্ণ, হওয়াতে অন্যথা, দাঁড়াই
কোথা,
কোন্ রাজ্যে থাক্‌লে ঘুচিবে
মনের ব্যথা।

একবার মধুবন, আবার বৃন্দাবন,
যাতায়াত পরিশ্রম, সহে না আর।
রাই শত্রু রেখো না হে শ্যাম রায়,
বধ ক'রে ব্রজের রাধারে,
সুখে রাজ্য কর লয়ে কুব্জায়॥
বৃন্দে গে কৃষ্ণে কয়, শুনেছি
দয়াময়,
ক'রে ত সকল শত্রুনাশ।
ক'রে ধ্বংস, প্রধান শত্রু কংস,
যদুবংশের বাড়ালে উল্লাস॥
তোমার আর এক শত্রু ব্রজে
আছে,
সে মোলে সব কণ্টক ঘোচে,
মোলে, সেও হে প্রাণেতে বাঁচে ;
রাজার নন্দিনী, হ'ল বিরহিণী,
বল হে, কত দুঃখ সবে আর॥
ঋণের শেষ শত্রু শেষ, রাখ্‌লে প্রমাদ
ঘটায়॥
তুমি হ'য়ে রাধার প্রেমের ঋণী,
তায় কর্‌লে কাঙালিনী,
তোমার ও গুণ জানি জানি,
এখন বধিলে রাধার প্রাণ; বাড়িবে
অধিক মান,
মুক্ত হবে রাধার প্রেমের দায়॥

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী কবির দলের গীত রচয়িতা ছিলেন গদাধর এবং কৃষ্ণমোহনের মত তাঁহারও নিজস্ব কোন দল ছিল না। আনটুনী সাহেব, রামসুন্দর স্বর্ণকার প্রভৃতি কবিওয়ালাদের দলে ইনি গীত রচনা করিয়া দিতেন। তাঁহার গীতগুলি রচনা-মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ।

শ্রীমতি, এই মিনতি রাখ গো আমার।
পাবে সময়ে কালাচাঁদ, ঘুচিবে এ বিষাদ,
সও গো সও অল্প দিন আর দুখের ভার।
হবি কি পাগলিনী, কমলিনি,
কৃষ্ণবিরহের দায়?
ছি ছি ধৈর্য্য ধর, সহ্য কর দুখ,
সময়ে পাবে শ্যাম রায়।
আছে প্রমাদিনী ঐ যে কুটিলে;—
সাধে কৃষ্ণসাথে বাদ, পরিবাদ
ঘটালে এই গোকুলে।
দুঃখ অন্তরে রাখ রাই, প্রকাশে কার্য নাই
ঘটাস্‌নে জ্বালার উপর জ্বালা আর।
জেনো সকলি কপালে হয়,
রাধে গো, দোষ নাই কা'র।
বাঁধ ধৈর্য্যগুণে প্রাণ, কিশোরি,
ভাব কৃষ্ণের অভয় পদে, ঘুচিবে এ বিপদ,
বিপদের কাণ্ডারী হরি
ভাব একান্তে শ্রীকান্ত, হবে দুখ অন্ত,
হয় দুঃখান্তে সুখ, বিধি বিধাতার॥
নাহি একান্ত জানি বিনা শ্রীরাধার।
যতনে চরণে শরণ লয়েছি রাধার;
এ দায়ে রাখেন রাই যদি পায়,
নতুবা নিরুপায়, মানের দায় সখি,
আমার প্রাণ যায়॥
রাধার মাধব রাধার প্রেমে,
সদা গো বাঁধা আছি সই!
নাহি অন্য জনে জানি মনে সই,
একান্ত প্রাণের রাধা বই।
ব্রহ্ম সনাতনী, চিন্তা-স্বরূপিণী শ্রীমতী;—
কৃষ্ণবিরহে কি ভয় তার,
বিচ্ছেদ নাই শ্রীরাধার,
তুচ্ছ অনঙ্গে কি হবে তার দুর্গতি॥
ইচ্ছাময়ী নাম শ্রীরাধার,
রাই কৃষ্ণের মূলাধার,
ভিকারী আমি রাধার প্রেমের দায়॥*

একবার বলিস্ ত, আস্‌তে বলি মাধবকে
প্যারি, তোর সম্মুখে।
ঐ দেখ কালিয়ে, কুঞ্জের বাহিরে দাঁড়ায়ে,
কেঁদে বল্‌তেছে—'দয়া কর রাধিকে!"
প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণে, নিকুঞ্জের নিকটে,
হেরিয়ে বৃন্দে, শ্রীমতীরে কয়;
রাধে, কেঁদেছ যার আশাতে নিশাতে,
সেই শ্যাম প্রভাতে উদয়।

কৃষ্ণ অতি ম্রিয়মাণ, তাহে
লজ্জা-ভয় ;—
মুখে আধ আধ ভাষা, গললগ্নবাসা,
কাতর মাধব অতিশয়।
দেখে রূপের ছাঁদ, পাছে রাই
হয় উন্মাদ,
কৃষ্ণ আগে তাই পাঠিয়ে দিলেন
আমাকে।
যদি স্বেচ্ছা হয় বল গো প্রধানা
গোপিকে।
কৃষ্ণ সেজেছেন অতি বিপরীত ;—
যেন গ্রহণান্তে শশী উদয় হ'ল আসি',
সর্বাঙ্গে কলঙ্ক অঙ্কিত।
নাহি সর্বাঙ্গে সুরাগ, হৃদে কলঙ্কের
দাগ,

নাহি লাবণ্য কালাচাঁদের চাঁদমুখে॥
কভু কুবুজায় সুন্দরী, করি হে সুন্দরি,
কখনো ধরি রাধার রাঙ্গা পায়॥

সকলে জানে সই, রসময়ি! আমি
ইচ্ছাময়,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয়,
সই রে, আমা হ'তে হয়।
কভু ইচ্ছা ক'রে করি রাজত্ব ;—
করি কখনো ঘাটালি, কখনো রাধার
দাসত্ব।
কভু গোষ্ঠে চরাই গোধন,
কভু গোপের উচ্ছিষ্ট করি হে ভোজন,
কভু বাঁশীর গানে ভুলাই গোপিকায়।
কভু ভিক্ষা করি মান, মানিনী রাধার
মানের দায়।
কভু করে ধরি গিরি গোবর্দ্ধন ;—
ইন্দ্রদেবের ভয় হ'তে, রক্ষা করি
গোপীগণ,
কভু পুতনা করি নিধন, কভু ক'রি
গো সখি,
কালীয় দমন, কভু উদূখলে বাঁধেন
যশোদা আমায়।

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য

কবির দলের গীত রচনায় কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্যও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর প্রভৃতির দলে কৃষ্ণমোহন গীত রচনা করিয়া দিতেন। কৃষ্ণমোহন গদাধর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি রচয়িতাদের সমসাময়িক ছিলেন। কৃষ্ণ বিষয় গানে বিশেষ করিয়া 'মাথুর' গান রচনায় তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। কবির দলে গীত রচনা করিয়া পেশাদার রচয়িতা হিসাবেই তিনি জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন।

আজ কৃষ্ণ! চল হে নিকুঞ্জবন,
প্রাণাহুতি যজ্ঞ ক'রবেন রাই, লহ
তারি নিমন্ত্রণ।
আছেন চন্দ্রমুখী রাই, চাহিয়ে
ও চন্দ্রবদন॥
তুমি যে ছলে শ্যামরায়, এলে মথুরায়,
হ'য়ে এক যজ্ঞে নিমন্ত্রিত;
করলে সে যজ্ঞ সমাধান, হ'ল তা
জগতে বিদিত।
আবার এক যজ্ঞ হবে ব্রজধাম;—
শীঘ্র আসি' তাও পূর্ণ কর শ্যাম!
আমরা অবলা গোপবালা,
অনেক দুঃখে ক'রেছি সব যজ্ঞের
আয়োজন
তুমি হে যজ্ঞেশ্বর দয়াময়,
তোমা বিনে যজ্ঞ নাহি পূর্ণ হয়।
মানসে মানসে রাই করিবেন সে যজ্ঞ,
তোমার ঐ শ্রীচরণে সমর্পণ॥
ক'রে যজ্ঞের সঙ্কল্প প্যারী
আছেন যজ্ঞ-বেদিতে বসিয়ে;
সজল জলধরে করিয়ে ধ্যান,
তৃষিত চাতকিনী হ'য়ে।
তোমার বিচ্ছেদ হুতাশন, ক'রে সংস্থাপন,
সমিধ আপনারি অঙ্গ;
যোগিনীর প্রায়, আছেন মৌনে,
ত্যজিয়ে সখীর সঙ্গ॥
ক'রেছেন রাই আত্মমনসংযোগ;—
অপেক্ষা নাই সবই হ'য়েছে ত্রিযোগ।
আপনি কর্ত্তা হ'য়ে সম্মুখে দাঁড়ায়ে,
দুখিনীর যজ্ঞ কর সমাপন॥
স্বজনি গো! আমায় ধর গো ধর,
বুঝি কি হ'ল আমারে।
নিবিড় মেঘের বরণ, দলিত অঞ্জন,
কে আসি' প্রবেশিল অন্তরে॥
দারুণ বসন্ত তাপে, কৃষ্ণ বিচ্ছেদ,
কৃষ্ণরূপ ভাবতে ভাবতে রাই;
হলেন অচেতন, ধরে সখীগণ,
রাইতে রাই যেন আর নাই।
তখন চৈতন্য পেয়ে কমলিনী কয়;—
এ কি দায়, বিশ্বজয়ের প্রায়,
কে আমার হৃদয়ে উদয়?

এহেন জ্ঞান হয় আমার, ব্রহ্মাণ্ডের যত
তার,
পশিল আমার হৃদিপিঞ্জরে।
সই, ভাবিতে কেন অঙ্গ সিহরে!
একে শ্রীকৃষ্ণবিহনে দেহ শূন্য,
এতে অন্য ভার কি সয় গো সই!
এ দুঃখিনীর তাপিত অঙ্গেতে,
কে আসি' হ'ল অবতীর্ণ।
একে সহজে দীনে ক্ষীণে মলিনে,
বিরহ-বিষেতে জরা;
আমার আপনার অঙ্গ আপনি ভার,
বহিতে দুঃখের পসরা॥
আমার অকস্মাৎ কেন গো হ'ল এখন;
যেন এ দেহের সঙ্গেতে, করিছে
প্রাণ আকর্ষণ
মনে ভাবি গো একবার, অন্তরে কি
কি আমার,
দেখি গো হৃদয় বিদীর্ণ কোরে॥
এমন দুঃখের সময় কালাচাঁদ,
আমার অন্তরে প্রবল, বিচ্ছেদ দাবানল,
পাছে তাঁর শ্যামাঙ্গ সই দগ্ধ হয়॥
অন্তরের ধন কৃষ্ণ, অন্তরে রাখিতে,
কার বা অসাধ?
কিন্তু ললিতে! কপাল গুণেতে,
ঘটিল হরিষে বিষাদ॥
কৃষ্ণবিলাসের সই, আমার এ অঙ্গ,
দুঃসহ কৃষ্ণবিরহ, তাতে আসিয়া
জ্বালায় অনঙ্গ।
সে যে ত্রিভঙ্গ কালিয়ে, মানসে হেরিয়ে,
জুড়াই সই! তেমন কপাল আমার নয়॥
মনের দুঃখে বনে ভ্রমণ ক'রে রাই,
বনফুলের মালা গেঁথে পাঠালে।
আছ কুব্জার প্রেম সম্বোধনে,
ব'সে রাজ সিংহাসনে; হাদে হে
চিকণকালা!
রাই দিলে চিকণ মালা,
ও মালা কার গলায় দিব মধুমণ্ডলে॥
কুসুম-হার করে ল'য়ে,
বৃন্দে নিবেদন করে কৃষ্ণের পায়;
বধু হে, এলে রেখে, শ্রীমুখ না দেখে,
শোকে রাই অশোক বনে সীতার প্রায়॥
তোমার মধুর শ্রীবৃন্দাবন, কুঞ্জবন
ফেলে রাখে,—
মনের বিষাদে, তোমার বিচ্ছেদে;—
বসন্তে কিশোরী, বনে ভ্রমণ করি,
"কোথায় হে বনমালি!" ব'লে কাঁদে।
রাধার চক্ষের জল চন্দনমাখা,
মালায় আছে রেখা, লেখা কৃষ্ণনাম;
কৃষ্ণ, তায় পথে পথে কাঁদালে॥
ক'রে চিত্র বিচিত্র সাজালে।
(শ্যাম হে, তোমার গরবিনী রাই)
বনের কুসুম তুলে, নানা জাতি
জাতি যূথি—
দগ্ধ হয়ে শ্যাম শোকে,
মুগ্ধ মধুর বন দে'খে শ্যাম হে
তোমার গরবিনী রাই,
মধুর ভাবে গেঁথেছিল মধুমালতী॥
হ'য়ে বিচ্ছেদ ব্যাকুল, বকুল ফুল,
গেথে মালা প্যারী সে জ্বালায়;
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, গেথে কৃষ্ণকলি,
মূর্চ্ছা যায় কৃষ্ণ ব'লে পড়ে ধূলায়।
কৃষ্ণ, দেখ হে, একবার দেখে যাও

বসন্তের প্রাণান্ত হ'ল।
ব্রজের দুঃখানল, রাধার শোকানল,
প্রবল হয়ে বিচ্ছেদ দাবানল,
তোমার ঋতুরাজ সসৈন্যে পুড়ে মোলো ॥
বসন্তে শ্রীকান্তে সম্বোধিয়ে,
বৃন্দে কয় ব্রজের বিবরণ ;
কৃষ্ণ হে, কৃষ্ণতাপে দগ্ধ,
তোমার সেই মধুর বৃন্দাবন।
শুক শারী ডাকে না হে কৃষ্ণ ব'লে ;
মধুকরের মধুমধু রব, সে রব নাই হে ;

কোকিল নীরবে ব'সে আছে তমালে।
হ'ল সুখহীন বৃন্দাবন, শুন মধুসূদন !
এ মধুর কাল ফলে শুকাল ॥
কেন শ্যাম, তা'য় গোকুলে পাঠালে বল।
ব্রজধামে ঋতুরাজের আগমনে,
নব নব তরুলতা সব,
সুখে মুঞ্জরিয়ে ছিল কুঞ্জকাননে।
তাহে মলয় সমীরণ, জ্বালায়ে হুতাশন,
বৃন্দাবন সেই অনলে দহিল ॥

ভবানী বেনে

গন্ধবণিক ভবানীচরণ, ভবানী বেনে নামেই খ্যাত ছিলেন। তাঁহার নিজের কবির দল ছিল, এবং নিজেই দলের জন্য গীত রচনা করিতেন। বর্দ্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনার নিকটে 'সাতগেছে' গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কালে স্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার সন্নিকট বরানগরে আসিয়া তিনি সপরিবারে বসবাস করিতে থাকেন। নিজের কবির দলের অসাধারণ প্রতিপত্তির সঙ্গে প্রচুর অর্থ উপার্জনও তিনি করিতেন।

বোঝা গেল না হরি, তোমার কেমন
করুণা।
জানা গেল—নাহি নারীবধের
ভাবনা।
ত্যজে ব্রজেতে কিশোরী,
এলে মধুপুরী,
পুরাতে কুবুজার মনো বাসনা।
সকলি বিস্মৃতো, ব্রজনাথ, হোলে
কি একোকালে
তোমার দোষ নাই, গোপীর ছিল
কপালে।

ভেবে দেখহে গোকুলে, করিলে
কি লীলে,
তা কি তোমার পড়ে না মনে।
শ্যাম, নন্দ উপানন্দ সুনন্দ,
আরো রাণী যশোমতি।
হা কৃষ্ণ যো কৃষ্ণ, কোথা প্রাণোকৃষ্ণ,
বোলে লোটায় ক্ষিতি ॥
আরো শুন হরি, নিবেদন করি,
ব্রজেরো সমাচার
কি কব মাধব, সে অতি চমৎকার।
ব্রজ-গোপিকা সকলের, নয়নের জলে,

কেবলো প্রবলো হেরি যমুনা ॥
সখি কও শুনি সমাচার আসিবেন সে
হরি পুনঃ কি ব্রজে আর।
হবে কি আমার হেন কপাল আবার ॥
মথুরা নগরে মাধবেরো দেখে এলে
কিরূপ ব্যবহার।
না হেরে নবীন জলধররূপ, আকুল
চাতকী প্রাণ,
দিবা নিশি আমার সেই শ্যাম-ধ্যান
জীবনযৌবন ধনপ্রাণ, হরি বিনে
সকলি আঁধার।
হায় ভূপতি নাকি হয়েছে হার,
মধুপুর-সুখবিলাসী,
স্বরূপকহনা সেথানেরাজার কোনমহিষী ॥
ব্রজের চূড়া-ধড়া নাকি ত্যজেচেন
শ্যাম রায়।
কুবুজা নাকি বামে শোভা পায় ॥
ব্রজের দুখের কথা শুনে হরি
কি দিলেন উত্তর তার ॥
একবার কুঞ্জবনে কৃষ্ণ বলে ডাক্‌রে
কোকিলে।
মধুর কুহুধ্বনি শুনে, তাপিত প্রাণ,
জুড়াবে গোপীগণে।
নীরব হয়ে বসে কেন রইলি
তমাল-ডালে ॥

জুড়াবে গোকুলবাসী গোপী সকলে,
শুনাও মধুমাখা মধুস্বর, ওরে পিকবর,
রাধার কর্ণকুহরে।
সুমধুর স্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।
জানি দুঃসহ বিরহ ও নামে নির্ব্বাণ হয়,
কৃষ্ণ-প্রেমের জ্বালা যাবে কৃষ্ণনাম নিলে ॥
বসন্ত সময় ব্রজে হল না বসন্তের অভ্যুদয়
দূতী কৃষ্ণবিচ্ছেদে মনের খেদে
কোকিলেরে কয়,
সেই বৃন্দাবনচন্দ্র শ্যাম বৃন্দাবনে নাই,
দুঃখের কি দিব সংখ্যা, কৃষ্ণপদ পঙ্কে,
অঙ্গ ফেলে আছে রাই;
জুড়ায় কমলিনীর জীবন,
ব্যথার ব্যথী এমকনে—
ওরে পক্ষ, হও সাপক্ষ, দুখিনী বলে ॥
আমরা দুখিনী গোপী বিরহিনী
কৃষ্ণবিরহে,
দেখরে বিহঙ্গ, বনে ত্রিভঙ্গ,
অনঙ্গে অঙ্গ দহে,
কৃষ্ণ হয়েছে রাধার কলেবর,
শোনরে ওরে পিকবর,
সে পায় জীবন এখন ওরে
কৃষ্ণনাম শুনালে ॥

দাশরথি রায়

সুবিখ্যাত দাশরথি রায় বাঙ্গলার পাঁচালী রচয়িতার সম্রাট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার রচিত সব বিখ্যাত পাঁচালী বাস্তবিকই নবরসের অমৃত ভাণ্ডার। আজ প্রায় এক শতাব্দী অতীত হইতে চলিল, তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আজও বাংলাদেশে এমন নগর শহর বা গ্রাম নাই, যেখানে আবাল বৃদ্ধবনিতার মুখে তাঁহার নাম শুনিতে পাওয়া যায় না। কৃতী-পণ্ডিত হইতে নিরক্ষর কৃষক পর্যন্ত সকলেরই মুখে আজও তাঁহার পাঁচালীর সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। দেশের সর্ব স্তরের লোককেই তিনি মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত পাঁচালীর পালাগুলি ভাব ও ভাষার রত্নাকর—কাব্যে যমকে, অনুপ্রাসে অলঙ্কারে ভরা। এক কথায় বাংলা ভাষার অতুল সম্পত্তি।

১২১২ সালের মাঘ মাসে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার সন্নিকট বাঁধমুড়া গ্রামে দাশরথি রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায় এবং মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। দেবীপ্রসাদের চার পুত্রের মধ্যে দাশরথি দ্বিতীয়। দাশরথির মাতুলের নাম রামজীবন চক্রবর্ত্তী। পীলাগ্রামে তাঁহার মাতুলালয় ছিল এবং তিনি শৈশব হইতে মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তৎকালে প্রচলিত বাংলা ভাষার পর তিনি ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা করেন। বাল্যকাল হইতেই অন্যান্য শিক্ষা অপেক্ষা গীত বাদ্যের শিক্ষাতেই তাঁহার প্রবল আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। যৌবনের প্রারম্ভে স্ত্রী কবিওয়ালী অক্ষয়া পাটনীর দলে তিনি প্রবেশ করেন। সেই কবির দলে তিনিই গীত ও ছড়া রচনা করিয়া দিতেন।

তাঁহার এই ধরনের আগ্রহে ও কৃতিত্বে তাঁহার মাতুল মহাশয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন; এবং এক আত্মীয়ের দ্বারা অনেক চেষ্টায় সেই দল হইতে তাঁহাকে ছাড়াইয়া আনিয়া এক নীল কুঠিতে তিন টাকা বেতনের মুহুরীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু এই ধরনের চাকুরীতে বিশেষভাবে অতৃপ্ত দাশরথি অল্পদিন পরেই সেই চাকুরীতে জবাব দিয়া আবার সেই অক্ষয়া পাটনীর কবির দলে প্রবেশ করেন। এইসব কারণে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের মাথা হেঁট হয়। গ্রামস্থ সকলের ভর্ৎসনায় অবশেষে দাশরথির মনে একদিন হঠাৎ ঘৃণা জন্মিল, এবং সেই দিন হইতেই তিনি ওই কবির দলের সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করেন।

তাঁহার জীবনের অক্ষয় কীর্তির বীজ এইবার অঙ্কুরিত হইল। নিজে পালা রচনা করিয়া তিনি নিজেই এক পাঁচালীর দল সৃষ্টি করেন। ক্রমে সেই অঙ্কুরিত বীজ পত্র-পুষ্পপল্লব সমাবেশে এক সুবিশাল মহীরুহে পরিণত হয়। অতি অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার নব প্রতিষ্ঠিত পাঁচালীর সুখ্যাতি একেবারে দেশময় বিস্তৃতি লাভ করে। তৎকালে বাংলাদেশে এমন জেলা, মহকুমা, নগর ও গ্রাম ছিল না যেখানে রসরাজ কবিবর দাশরথি রায়ের অমৃতময়ী পাঁচালীর গান বিজয় ঘোষণায় প্রতিধ্বনিত না হইত। প্রথম প্রথম লোকে দাশরথিকে তিনটি মাত্র টাকা দিয়াই পাঁচালীর গান করাইত। শেষে শতমুদ্রার বিনিময়েও সেই দাশরথি তাঁহাদের দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিলেন। এই পাঁচালীর দল হইতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া পীলাগ্রামে এক সুন্দর বৃহৎ অট্টালিকা ও দুইটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৬৪ সালের ২রা কার্তিক কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী তিথিতে তিনি সজ্ঞানে দেহরক্ষা করেন।

মানিনী শ্যামচাঁদে রাধে কি অপরাধে
কে গেল বল গো শুনি এ বাদ
সেধে।
ঠেকিলাম আজু এ কি প্রমাদে।
ম্লান শশীমুখো কেন লো রাই,
হেরি গো আজু এত আহ্লাদে॥
এই দেখে এলাম,
শ্রীকৃষ্ণ সহিতে হাস্যকৌতুকে,
ছিলে গো রাই অতি পুলকে ;
ইতিমধ্যে বিচ্ছেদো অনল
উঠিল কি বাদানুবাদে॥

সুরট—ঝাঁপতাল।

মম মানস! সদা ভজ, দ্বিজ-চরণ-পঙ্কজ।
দ্বিজরাজ করিলে দয়া বামনে ধরে
দ্বিজরাজ॥
হরিতে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য নাহি পান
বিধি,
সে রোগের ঔষধি কেবল, ব্রাহ্মণ-
চরণ-রজঃ॥
যার গমন দ্বিজরাজে, নখরে দ্বিজরাজ-
সাজে,
দ্বিজপদ-শোভিত ব্রজরাজ-হৃদয়-
সরোজ।
ভ্রান্ত হ'য়ে পদে পদে, হেন দ্বিজের
অভয় পদে,
দাস না হয় দাশরথি দুখ পায় সে দোষ
নিজ॥

ললিত—ঝাঁপতাল।

হর নিদয়, হরি নিদয়, মোরে হর-
কামিনি
তুমি যদি নিস্তার-পথ কর ত্রিপথ-
গামিনি!
স্বীয় কর্ম্ম-দোষে ভবে, পেয়ে দুখ পদ
পদে,
হ'লে পতিত পদে পতিতে রাখো,
পতিতপাবনি! পদে, শুনে ধরেছি পদ,
হরি-পদ-রজবিহারিণি!

আরাধিয়ে পীতাম্বর, হর পূজো না
পেয়ে বর,
বড় দুখ পেয়েছি গিরিবর-নন্দিনী !
জীবনান্ত জেনে অন্তে, এসেছি তব
জীবনে,
এখন, জীবনরূপিণি গঙ্গে !
তোমা বিনে ত্রিভুবনে,—
কে আছে আর দাশরথির দুঃখ-
নিবারিণী ।

সুরট-মল্লার—ঢিমে-তেতালা ।

তারার, দেখলে রূপ হরের নয়ন
উথলে ।
ভূভার হারিণী স্বয়ং ভূতলে ।
শশী আসি নখবাসী, তরুণ অরুণ আসি
পদতলে ।
হেরি যোগেন্দ্রকামিনী, স্বরূপিণী
সৌদামিনী,
হতমানিনী, গগনে সঘনে চলে ।
মরি কি রূপ-মাধুরী, হিমগিরির-
কুমারী,
হেমগিরি মলিন দুখানলে
নন্দ-হিতার্থে, কৃষ্ণের
প্রীত্যর্থে,
জনমিল যোগমায়া আসি, যশোদা-
নন্দিনী-ছেলে ।
ত্রিলোচনী এলোকেশী, সুরূপসী
খর্ব্বকেশী,
শশী-মসী-দোষী মুখ-মণ্ডলে ।
শ্রুতি-নাসার তুলনা, শ্রুতি-মূলেতে
মেলে না,
অতুলনা ললনা শ্রুতি বলে,—
দাশরথি শুন, পাবি দরশন,
কর জ্ঞান-চক্ষুযোগ, যোগমায়ার পদ-
কমলে ॥

সিন্ধু মল্লার—কাওয়ালী ।

সে কি কালো দেখে এলি কাল-
যায় ।
কালের কাল যায়, সে কাল-পূজায়,
সেই কালো-দরশনে, জীবের কাল-
দরশন যায় ।

আমি ভালো জেনে তোরে ভালবাসি
লো অন্তরে,
ভাল শুনিবার তরে সে তো ভাল নয় !
আজ, ভাল জানা গেল, তোর ভাল
নয় লো ভাল,
ভাল হলে হতো ভালে ভালোদয় ।
কাল ভালরূপ যেনে ভালরূপ,
শশিভাল যাঁকে ভাল বাসে,—
তোর ভাল লাগে না তায় ।

ও জটিলে একি বটে, থেকে জলধি-
নিকটে,
জলাভাবে যাবে জীবন পিপাসায় !
দাশরথি ! কেন জল গুণজলধির
জল,—
যত দূরে মিলে গিয়ে, ঢাল কায় !
ও-পায় মিল রে,—জনমিল রে—
জল-রূপিণী জাহ্নবী ঐ জলদ বরণ-
পায় ।

খাম্বাজ—পোস্তা।

যে ভাবে তারা-পদ, ঘটে কি তার
অপদ
সে পদ ব্রহ্মপদ, মুক্তিপদ-প্রদায়িনী॥
কি আর করিবে কালে, মহাকাল যাঁর
পদতলে,
ডাকিলে জয় কালী ব'লে,
কাল ভয়ে পালায় অমনি॥
মায়ের মায়া অনন্ত, না পায় অন্ত,
কালহরা কালীমন্ত্র তারিণী ত্রিগুণ-
ধারিণী॥
মা আমার দক্ষিণে কালী, কখন বা হন
করালী,
কখনও হন বনমালী, কভু রাধা
মন্দাকিনী॥

সিন্ধুভৈরবী—কাওয়ালী।

ব্রজধামের তুল্য ধাম আর কোথাও নাই।
সঘনে বদনে কেবল হরি ধ্বনি শুন্‌তে
পাই॥
কৃষ্ণ-প্রেমে সবে মত্ত,
ভুলে গেছে সকল তত্ত্ব,
বলে কৃষ্ণের তত্ত্বকথা বল ভাই।
পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা,
তাদের মুখে কৃষ্ণ-কথা,
অনুকম্প অনুগতা,
জানে কেবল তাহারাই॥

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

আয়রে কানাই আয়রে গোঠে
রজনী পোহাইল।
ডাকিছে ঐ সঘনে ধেনু,
গগনে ভানু উঠিল॥
বেরো রে রাখালের রাজা,
শ্রীনন্দের নন্দন,
করেতে ধর মুরলী, কটিতে ধটী বন্ধন,
রাখালমণ্ডলী মাঝে নেচে চল॥
ও ভাই! মায়ে বল বুঝাইয়ে,
দিবে তোরে সাজাইয়ে,
অলকা-আবৃত করি বদন কমল,—
মোহন চূড়ে বকুল-মালা
মদনের মনোহারী,
শিরোপরি শিখি-পুচ্ছ
ওরে বঙ্ক-মাধুরি!
গলে গুঞ্জমালা যাতে ভুবন করে আলো।

অহংঝিঁঝিট—যৎ।

বলরাম রে! আজি মোর নীলমণি-ধনে
গোষ্ঠে বিদায় দিতে পারব না।
কুস্বপন দেখেছি কালি,
না জানি কি করেন কালী, রে,—
যেন কালীদহে ডুবেছে
আমার কালিয়ে সোণা।
ইথে যদি দ্বন্দ্ব করে,
নন্দ মন্দ কয় আমারে,
এ পাপ সংসারে রব না রে,
গোপালকে লয়ে ঘরে ঘরে,
রাখিব প্রাণ ভিক্ষা ক'রে,
তবু গোপালের মা-যশোদা
নাম থাক্‌বে ঘোষণা।

গোবিন্দ অধিকারী

হুগলী জেলার থানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিকট জাঙ্গিপাড়া গ্রামে অনুমান ১২০৫ সালে গোবিন্দ অধিকারীর জন্ম হয়। তিনি বৈরাগী কুলোদ্ভব। বাল্যকালে পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করেন। পরে আমতার নিকটবর্ত্তী ধুরখালি গ্রামনিবাসী গোলকচন্দ্র দাস অধিকারীর নিকটে তিনি কীর্ত্তন শিখিতে আরম্ভ করেন। এই সূত্রে বহু মহাজন পদাবলী তাঁহার কণ্ঠস্থ হয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কণ্ঠ অতি মধুর ছিল। গোলকচন্দ্রের কীর্ত্তনের দল ছিল। প্রথমত গোবিন্দ অধিকারী সেই দলে কীর্ত্তনের দোহারী করিতেন। শেষে নিজেই একটি কীর্ত্তনের দল করিলেন। কিন্তু সে দলের আশানুরূপ সুফল না হওয়ায় এই দলকে তিনি যাত্রার দলে পরিণত করিলেন। তাঁহার যাত্রার দলের প্রথম পালা 'কালীয় দমন'। এই যাত্রার দল হইতেই তাঁহার সৌভাগ্য লক্ষ্মীর উদয় হয় এবং তাঁহার সুখ্যাতি বাংলা দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পালা-ই তিনি যাত্রা করিতেন, এবং এই উপলক্ষে কৃষ্ণ বিষয়ক অনেক ভাল ভাল গীত তিনি রচনা করেন। সেই সকল গানের অনুপ্রাসের ঘটায় এক সময়ে তিনি বাংলা দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার কৃষ্ণ যাত্রায় তিনি নিজে দূতী সাজিতেন। তাঁহার দূতী গিরির অভিনয় দেখিতে ও গান শুনিতে বহু দূর হইতে লোকে হাঁটিয়াও যাইত। দূতী সাজিয়া আসরে নামামাত্র একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইত শ্রোতৃবর্গের মধ্যে। অনেকে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিতেন। যাত্রার সম্প্রদায়ের সহিত তিনি হাওড়ার সন্নিকট শালিমারে থাকিতেন। এই শালিমার গঙ্গাতীরে ৭২ বৎসরে বয়সে তাঁহার গঙ্গালাভ ঘটে।

গোবিন্দ অধিকারী যাত্রা করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছিল। চুক্তির টাকা ছাড়াও যাত্রার আসরে অনেক অর্থ তিনি 'পেলা' হিসাবে পাইতেন। তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া দরিদ্র ব্যক্তিও নিজের গায়ের উত্তরীয় খুলিয়া পর্য্যন্ত পারিতোষিক দিতেন। শেষ বয়সে তিনি কয়েকটি জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন।

ঠাকুরদাস দত্ত

১২০৮ সালে হাওড়া জেলার অন্তর্গত 'ব্যাটরা' গ্রামে ঠাকুরদাস দত্তর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামমোহন দত্ত। প্রথম জীবনে ঠাকুরদাস পিতার চেষ্টায় তাঁহারই সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ামে, কেরাণীগিরি কাজে নিযুক্ত হন। তরুণ বয়স হইতেই সঙ্গীত রচনায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। বহু পেশাদার ও অপেশাদারী দলের জন্য তিনি যাত্রার পালা লিখিয়া দিলেন। শেষে চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া তিনি এক পাঁচালীর দল করেন। অচিরে সেই দল অসাধারণ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১২৮৩ সালের ২১শে বৈশাখ তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন।

কমলাকান্ত

সাধক রামপ্রসাদের ন্যায় কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যও একজন সাধক ও ভাবুক কবি ছিলেন। শ্যামা সঙ্গীত রচনায় তাঁহার সিদ্ধি অভূতপূর্ব্ব। তাঁহার রচিত গীত-গুলিতে ভক্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত।

বর্দ্ধমান জেলার 'অম্বিকা-কালনা' গ্রামে কমলাকান্তের জন্ম হয়। ১২১৬ সালে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজশচন্দ্র বাহাদুরের সভাপণ্ডিতের আসন অলঙ্কৃত করিতে তিনি বর্দ্ধমানে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। তেজশচন্দ্র সাধক কমলাকান্তকে অপরিসীম শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে আপন মন্ত্রগুরুপদে বরণ করেন, এবং রাজবাড়ীর অনতিদূরে কোটাল-হাত গ্রামে গুরুদেব কমলাকান্তের জন্য একটি সুন্দর বসতবাটি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। প্রত্যেক বৎসর শ্যামা পূজার রাত্রে ভক্ত-সাধক কমলাকান্তের এই গৃহে সবিশেষ ধুমধাম সহকারে পূজা হইত।

কথিত আছে—কমলাকান্ত একবার দস্যু হস্তে পতিত হন। প্রাণরক্ষার অন্য কোনো উপায় না দেখিয়া, ভাবাবেগে গলিতাশ্রুলোচনে তিনি উচ্চকণ্ঠে মা কালীর নামগান গাহিতে আরম্ভ করেন। দস্যু দলপতিসহ দলের সকল দস্যুরই প্রাণমন, সেই ভাবপূর্ণ সুমধুর গীত শ্রবণে দ্রবীভূত হয়। দলপতিসহ সকল দস্যুই আসিয়া কমলাকান্তের চরণে করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। স্ত্রীর মৃতদেহ দাহ করিতে গিয়া সংসার বিরাগীর ন্যায় শ্মশানে শ্যামা মায়ের নাম গান গাহিতে গাহিতে কমলাকান্ত নৃত্য করিয়াছিলেন। মা কালীর প্রতি ভক্ত কমলাকান্তের অপার ও অগাধ

নির্ভরতা ছিল। কমলাকান্তের অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া মহারাজ তেজশচন্দ্র যখন তাড়াতাড়ি গুরুদেবকে গঙ্গাতীরস্থ করিবার উদ্যোগ আয়োজন করেন, সেই চরম মুহূর্তেও মুমূর্ষু কমলাকান্ত একটি সঙ্গীত রচনা করিয়া গাহিয়াছিলেন, গীতটির প্রথম কলি :—

"কি গরজ, কেন গঙ্গাতীরে যাব
আমি কাল মায়ের ছেলে হ'য়ে ;
বিমাতার কি শরণ লব ?"

সাতু বাবু

আনুমানিক ১২১৬ সালে আশুতোষ দেবসরকার (সাতুবাবু) কলিকাতার অন্তর্গত সিমুলিয়া বা সিমলে পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুবিখ্যাত রামদুলাল সরকার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের নাম প্রমথনাথ দেবসরকার বা লাটুবাবু। সে আমলে সাতুবাবুর ন্যায় দয়ালু ও দাতা বিরল ছিল। অসাধারণ সঙ্গীতানুরাগের জন্য তিনি সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়র, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি বিখ্যাত স্থান হইতে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন প্রসিদ্ধ সব সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়ক আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, তিনি সঙ্গীত-চর্চ্চা করিতেন। ইহা ব্যতীত সে সময় যে কোন গুণী সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়ক অথবা বাদক কলিকাতায় আসিলে, সাতুবাবুর নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থ ও উৎসাহ পাইতেন। হিন্দুধর্ম প্রচার, প্রসার ও অন্যান্য ব্যাপারে সাতুবাবু অসাধারণ উৎসাহ ও উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় এবং উদ্যোগে, ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় হিন্দুদিগের এক বিরাট সভা হয়। সভার একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, মিশনারীদের বিদ্যালয়ে, এদেশীয় ছাত্র প্রেরণ না করা। ১২৫৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী

১২১৭ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাজনঘাটে বিখ্যাত এক বৈষ্ণবংশে কৃষ্ণকমলের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মুরলীধর গোস্বামী। তাঁহাদের আদি নিবাস পূর্ববঙ্গে ছিল। মাত্র সাত বৎসর বয়সে কৃষ্ণকমলকে বৃন্দাবনধামে লইয়া গিয়া মুরলীধর পুত্রের ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ছয় বৎসর পরে কৃষ্ণকমল শ্রীবৃন্দাবন হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া নবদ্বীপে পাঠ সাঙ্গ করেন।

হুগলীর অন্তর্গত 'সোমড়া-বাকীপুর' গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। 'রাই-উন্মাদিনী', 'স্বপ্ন-বিলাস', 'সুবল সংবাদ' প্রভৃতি তাঁহার কয়েকখানি বিখ্যাত গ্রন্থ আছে। তাঁহার 'রাই-উন্মাদিনী' সবিশেষ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কি রচনা-মাধুর্য্যে, কি কাব্য ব্যঞ্জনায় অপূর্ব এই গ্রন্থ রচনা করিয়াই গোস্বামী মহাশয় অমর হইয়াছেন। ১২৯০ সালের ১২ই মাঘ চুঁচুড়ার নিকট গঙ্গাতীরে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ

কলিকাতায় খিদিরপুরে, ১২১৭ সালের ২২শে শ্রাবণ শনিবার কাশীপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। খিদিরপুরে তাঁহার মাতামহ রামনারায়ণ বসু সর্বাধিকারীর বাড়ী। কাশীপ্রসাদের বাল্যজীবনের অধিকাংশ সময়ই মাতুলালয়ে অতিবাহিত হইয়াছিল। দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার রীতিমত শিক্ষা আরম্ভ হয় নাই। অবশেষে কিছুদিন পর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। তাহার পর অসাধারণ যত্ন ও অধ্যাবসায় সহকারে তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইতে সমর্থ হন। এই সময়ে তিনি ইংরাজী কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহার রচনা এতই উচ্চদরের হইত যে, তাঁহার কয়েকটি ইংরাজী কবিতা, তৎকালীন "গভর্নমেণ্ট-গেজেটে" ও "এশিয়াটিক সোসাইটি জর্নালে" প্রকাশিত হয়। ইংরাজী কবিতা ছাড়া তিনি কয়েকখানি ইংরাজী পুস্তকও রচনা করেন।

এই সব গ্রন্থগুলির মধ্যে "বাংলা ভাষায় গ্রন্থ ও বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণ" সম্বন্ধে তিনি যে ইংরাজী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে তিনি ভারতচন্দ্র, নিধুবাবু প্রভৃতি বিখ্যাত রচয়িতাদের কবিত্বের সমালোচনা করেন। নিধুবাবুর গীতরচনার অনুকরণে তিনি অনেকগুলি প্রণয় সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন! নিধুবাবুর রচনার ন্যায় তাঁহার সে সকল সঙ্গীতেও বেশ রসোত্তীর্ণ এবং ভাব-পরিপূর্ণ। ১২৮০ সালের ২৭শে কার্ত্তিক কাশীপ্রসাদ পরলোকগমন করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, খাঁটি বাঙ্গালী কবি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন স্বভাব-কবি স্বল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কবিতায় শ্লেষ ও ব্যঙ্গ-প্রকাশে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

চব্বিশ-পরগনা জেলার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ১২১৮ সালের ২৫শে ফাল্গুন কবি ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। তিনি শৈশবকাল হইতেই কলিকাতায় জোড়াসাঁকোতে, মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। বাল্যকালে ঈশ্বরচন্দ্রের লেখাপড়ায় তাদৃশ মনোযোগ ছিল না। তবে প্রতিভাবলে, সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে ঈশ্বরচন্দ্র মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি শখের পেশাদারী কবি ও হাফ্-আখ্ড়াইয়ের দলে গীত রচনা করিয়া দিতে আরম্ভ করেন। ভবানীপুরের শখের দলে এবং রসময় বসু, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়চাঁদ দাস প্রভৃতি তৎকালীন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদের কবির দলে তিনি গীত রচনা করিয়া দিতেন। ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ তাঁহার 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। উক্ত সংবাদপত্র ব্যতীত,—'সংবাদ-রত্নমালা' 'পাষণ্ডপীড়ন' 'সাধু-রঞ্জন' নামক অপর তিনখানি সংবাদপত্রেরও সম্পাদনা তিনি কিছুদিন করিয়াছিলেন। 'পাষণ্ডপীড়ন' এবং 'রসরাজ' এই দুইটি পত্রিকা একসময় কবিতাযুদ্ধে কলিকাতা নগরীকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। তবে 'প্রভাকর' পত্রিকা সম্পাদনা করিয়াই তিনি যশস্বী হন। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার 'প্রভাকর' পত্রিকায় বহু প্রাচীন কবিদের লুপ্তপ্রায় কবিতা, গীত ও পদাবলী বহু আয়াসে ও যত্নে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার অসামান্য সেবা করিয়া গিয়াছেন ইহা ব্যতীত রাজনীতি ও সমাজনীতিও গদ্যে এবং পদ্যে এই 'প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। 'প্রবোধ-প্রভাকর' ও 'হিত-প্রভাকর' নামে দুইখানি কবিতা গ্রন্থে শ্লেষ ও ব্যঙ্গময়ী কবিতা রচনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা সর্বব্যাপী স্বীকৃত হয়। 'বোধেন্দু-বিকাশ', 'কবি-নাটক', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি বিখ্যাত কয়েকখানি নাটকও তিনি রচনা করেন।

এক সময়ে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হয়। সেই অমূলক সংবাদ উপলক্ষ করিয়া তিনি 'প্রভাকরে' একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন।—

"কে বলে ঈশ্বরগুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর
যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।"

কবিতা ও হাফ্-আখ্ড়াইয়ের দলের গীত ছাড়াও তিনি অন্যান্য বহু গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কয়েকটি আগমনী ও প্রণয়-সঙ্গীত মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার রচিত গীতগুলি অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ। ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ রাত্রি প্রায় ১টার সময় মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে কবি ঈশ্বরচন্দ্র দেহরক্ষা করেন। এক সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের যশ ও প্রতিপত্তি এতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে জনসাধারণ তাঁহাকে ঈশ্বরচন্দ্র কবীশ্বরী বলিয়া অভিহিত করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিত।

রূপচাঁদ পক্ষী

রূপচাঁদ দাস বা রূপচাঁদ পক্ষী ১২২১ সালের মাঘমাসে জন্মগ্রহণ করেন। উড়িষ্যা প্রদেশের চিল্‌কা হ্রদের সন্নিকটে তাঁহার পূর্বপুরুষগণের আদিনিবাস ছিল। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের বংশে কোন উত্তরাধিকারী না থাকায়, গৌড়েশ্বর ষড়ঙ্গদেব সেই সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রূপচাঁদের পিতামহ হরেকৃষ্ণদাস মহাপাত্র সেই গৌড়েশ্বর ষড়ঙ্গদেবের বংশসম্ভূত। হরেকৃষ্ণ দাসের পুত্র গৌরহরি দাস মহাপাত্র। গৌরহরি কলিকাতায় থাকিয়া, রাজা হরিহর ভক্তের আম-মোক্তারী করিতেন। এই গৌরহরি দাস রূপচাঁদের পিতা। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতে রূপচাঁদের বিশেষ অনুরাগ দেখা যাইত, বিশেষ করিয়া সঙ্গীত রচনা ও আলোচনায়। সকল প্রকার গীত রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

বিশেষ করিয়া বিদ্রূপাত্মক ও ব্যঙ্গ গীত রচনায় সেকালে তাহার সমকক্ষ কেহ ছিল না বলিলেই চলে। তাঁহার রচিত প্রায় সমস্ত গানেই 'পক্ষী' বা "খগরাজ" ভনিতা দেখিতে পাওয়া যায়। রূপচাঁদ বড়ই আমোদপ্রিয় ও রসিক-পুরুষ ছিলেন।

দেখিতে কতকটা খাঁচার আকারের একখানি গাড়ী তাঁহার ছিল। উপাধি পক্ষী—আর গাড়ীর আকৃতি খাঁচার মত, ইহা হইতেই তাঁহার চরিত্রের রঙ্গ-রসিকতা বেশ টের পাওয়া যায়। সেই খাঁচার মত গাড়ী করিয়া তিনি কলিকাতার বড় বড় লোকের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইতেন।

প্রচুর গীত তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। কোনরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিলেই বা হুজুক উঠিলেই, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বিষয়ে গীত রচনা করিয়া ফেলিতেন। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, গঙ্গার পোল, বিধবা বিবাহ, কন্যাদায় প্রভৃতি বিষয় উপলক্ষ করিয়াও তিনি বহু গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেকালে রাস্তায়, ঘাটে, রেলে, ষ্টীমারে বহু ভিখারীকে তাঁহার রচিত গান গাহিতে দেখা যাইত। তাঁহার রচিত কয়েকখানি গানে ইংরাজী শব্দের যোজনা দেখিতে পাওয়া যায়।

প্যারীচাঁদ মিত্র

টেকচাঁদ ঠাকুর নামে বিখ্যাত প্যারীচাঁদ মিত্র ১২২১ সালের ৮ই শ্রাবণ কলিকাতার নিমতলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ মিত্র।

রামনারায়ণ সঙ্গীতবিভায় সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে ও উদ্যোগে রাধামোহন সেন মহাশয়ের "সঙ্গীত তরঙ্গ" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পুত্র প্যারীচাঁদ, বাংলা, ফার্সী ও ইংরাজী এই তিনটি ভাষাতেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্যারীচাঁদ কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর ডেপুটী লাইব্রেরীয়ানের পদে মনোনীত হন। পরে উক্ত লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান ও সেক্রেটারীর পদেও উন্নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে এই উচ্চপদ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া, তিনি ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। এইবার লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হন। এবং তিনি স্বীয় ক্ষমতাবলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। বাংলা সাহিত্য তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তাহার রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' তৎকালীন আধুনিক বাংলাভাষায় প্রথম উপন্যাস। বাংলা ভাষাকে তিনি এক নূতন রূপে রূপায়িত করেন। পিতার ন্যায় তিনিও সঙ্গীতালোচনা এবং গীত রচনা করিয়া সবিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। ১২৯০ সালে তিনি দেহরক্ষা করেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিল্বগ্রামে ১২২২ সালে মদনমোহনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়। গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার পর রামধন পুত্র মদনমোহনকে কলিকাতায় আনিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়া দেয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্বও স্থাপিত হয়। অসাধারণ মেধাগুণে অচিরেই তিনি সাহিত্য অলঙ্কার, জ্যোতিষ, দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন।

কলেজ শিক্ষা শেষ হইবার পূর্বেই তিনি বাসবদত্তার পদ্যানুবাদ রচনা করেন। মদনমোহন শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া প্রথমে শিক্ষা বিভাগে পণ্ডিতের কার্য করিতে আরম্ভ করিয়া পরে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন। শিক্ষা বিভাগ হইতে তিনি মুর্শিদাবাদে জজ পণ্ডিতের পদ পান। জজ পণ্ডিতের পদ হইতে পরে তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে পর্যন্ত উপনীত হইয়াছিলেন। শিশুশিক্ষার প্রাথমিক কয়েকখানি বই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। জীবিতকালেই অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ১২৬৪ সালের ২৭শে ফাল্গুন, মুর্শিদাবাদের কান্দীতে বিসূচিকারোগে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মধুকান

যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমার অধীনে উলুশিয়াই গ্রামে ১২২৫ সালে মধুসূদন কিন্নর বা মধুকান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম তিলক চন্দ্র কিন্নর। তিলকচন্দ্রের চারটি পুত্রের মধ্যে মধুই জ্যেষ্ঠ। পিতার দৈন্যদশা প্রযুক্ত মধু বাল্যকালে লেখাপড়া বিশেষ কিছুই শিক্ষা করিতে পারেন নাই। কথিত আছে,—মধু অল্প স্বল্প পড়িতে পারিতেন বটে, তবে লিখিতে তিনি আদৌ পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার রচিত সঙ্গীতে সংস্কৃত মূলক শব্দবিন্যাস অনুপ্রাস এবং অলঙ্কারের ঘটা দেখিয়া, তাঁহার লেখাপড়ার সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদে আদৌ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। গীত রচনায়, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশে সকলেই চমৎকৃত হইতেন। কৈশোরোত্তর কালে মধু ঢাকায় দুইজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছোটে খাঁ ও বড়ে খাঁর নিকটে গিয়া সঙ্গীত শিক্ষা করেন। সেখানকার শিক্ষা সাঙ্গ করিয়া আসিয়া তিনি যশোহর জেলায় রাঢ়খাদিয়ানিবাসী রাধামোহন বাউলের নিকটে ঢপ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। এই ঢপসঙ্গীতেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা এবং ইহাতেই তাঁহার নাম অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

একে একে তিনি মান, মাথুর অক্রুর সংবাদ ও কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি বহু পালা রচনা করেন, গীতে সুরযোজনায় তিনি কাহারও অনুকরণ করেন নাই। যাহা করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টি। এককালে "মধুকানের সুর" অসাধরণ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মধুকানের অধিকাংশ গীত "সূদন" ভণিতাযুক্ত। একবার কোন একজন প্রশ্ন করেন,—"মধু! তুমি মধু নাম পরিত্যাগ করে "সূদন" ভণিতা দাও,—ইহার কারণ কি?

উত্তরে মধু বলিয়াছিলেন,—'মধু পাছে বিষ হয় সেই ভয়ে মধু নাম দিতে আমার সাহস হয় না।"

১২৭৫ সালে কৃষ্ণনগরে এক আসরে ঢপ গাহিতে গাহিতে সহসা তাঁহার যকৃতে বুকে ও পিঠে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা অনুভূত হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জরও দেখা দেয়। এই কালরোগেই ৫৫ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

শ্রীধর কথক

১২২৩ সালে গঙ্গাতীরে হুগলী জেলায় বাঁশবেড়িয়া গ্রামে একজন মহামনস্বী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। কাব্যে দর্শনে, অলঙ্কারে, স্মৃতিতে, সর্বোপরি সঙ্গীতে

অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া এই কবি-মনস্বী, নিজের কুল এবং বাংলাদেশ ও ভাষা সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা সন্দর্শন করিয়া, বাংলার আবালবৃদ্ধ-বনিতা বিস্ময়াভিভূত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে দিক্‌দিগন্তে তাঁহার যশোগান করিয়াছিলেন। সেই কবিমনস্বী কথকশিরোমণি—শ্রীধর।

বাল্যে প্রতিভা—কৈশোরে, যৌবনে প্রতিভা, প্রৌঢ়ত্বে প্রতিভা,—ইহা পূর্বজন্মার্জিত কত পুণ্যের ফল, ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। শ্রীধরের যৌবন প্রতিভারই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার বাল্য-প্রতিভার পরিচয়ও অপূর্ব বিস্ময়কর। পাঁচ বৎসর বয়সকালে শ্রীধর পাঠশালায় প্রবিষ্ট হন। একমাসের মধ্যেই আশ্চর্য্যজনকভাবে বালক শ্রীধর ধারাপাত পাঠ সাঙ্গ করেন, এবং চৌদ্দ বৎসর বয়সেই ব্যাকরণ কাব্য ও ভাগবতে তিনি অলৌকিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। হুগলী জেলায় গোস্বামী-মালিপাড়া গ্রামের ৺রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় শ্রীধরের ভাগবত শিক্ষা ও মন্ত্রদীক্ষার গুরু।

বাল্যে কবিত্ব শক্তিতে এবং শ্রীধর প্রকৃতই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। সহপাঠীদের সঙ্গে পাঠকালে শ্রীধর সর্বাগ্রে পাঠ সাঙ্গ করিয়া, হয়ত কখনও কোন একটি সহপাঠীর নামে গীত রচনা করিতেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে গাহিয়া সকলকে শুনাইতেন। তপ্তকাঞ্চনতুল্য বর্ণ গৌরবে সুন্দর পুরুষ শ্রীধরের সুললিত কণ্ঠে তাঁহার স্বরচিত সেই গান শুনিয়া সহপাঠীরা মুগ্ধ হইত।

যৌবনকালেই মানুষের কবিত্বশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়। এই যৌবনকালেই শ্রীধর সঙ্গীতের পাঁচালী এবং কবি গাহিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহার এই রীতি-নীতি কবিত্ব গুরুজনদের বিশেষ প্রীতিপ্রদ হয় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত জীবনকৃষ্ণ শিরোমণি, এই সব ব্যাপারে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করেন। গভীর দুঃখে শ্রীধর একটি বন্ধুর সঙ্গে মুর্শিদাবাদে গিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ভাগবত-বিশারদ স্বভাব কবি, সুকণ্ঠ গীতশিল্পীর রসতরঙ্গতরঙ্গোময় কাব্যোচ্ছ্বাসে ব্যবসায়ের কূটপ্রবৃত্তি কোথায় ভাসিয়া গেল। নিতান্ত বিদগ্ধচিত্তে শ্রীধর ব্যাবসায় ছাড়িলেন। এইবারে বহরমপুরে গিয়া তিনি কালীচরণ ভট্টাচার্য্যের কাছে কথকতা শিক্ষা করিতে সুরু করিলেন। নিবিষ্ট সাধনায় কথকতায় তিনি চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। কথকতার মধ্যে নাটকীয় ভাবরসাদির অভিব্যক্তিতে ভরা। কোন অবস্থায় মানুষের কি ভাব হয়, কথকতার ভিতরে সাজবদনভঙ্গিমায় এবং বাক্যরঙ্গে তাহার বিকাশ করিতে হয়। কথকতা শিক্ষার কালে শ্রীধর কখনও কখনও কোন বালকের হাতে সন্দেশ দিয়া অল্পক্ষণ পরেই আবার তাহা কাড়িয়া লইতেন। তাহার পর দুইটি বিশাল চক্ষুর ভিতর

দিয়া অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপে বালকের তখনকার সেই ভাবের ছবি মনের পটে আঁকিয়া রাখিতেন। আবার হয়ত কখনও দন্তহীন বৃদ্ধের কথা এবং মুখের ভাবের ছবি গ্রহণের জন্য, কোন বৃদ্ধের সঙ্গে কথা কহিয়া তাঁহার রসনার গতিপ্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পর্য্যালোচনা করিতেন। সর্ববিধ ভাবাভিব্যক্তির বিকাশ-শিক্ষা তাঁহার এমনই সাধনা ছিল। তাই উত্তরকালে তিনি একজন আদর্শ কথক হইতে পারিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ কথক লালচাঁদ শিরোমণি তাঁহার পিতামহ। কথকতায় শ্রীধর পিতামহের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রতনকৃষ্ণ শিরোমণি। পিতার পাণ্ডিত্যগৌরব পতাকা শ্রীধর আরও উচ্চে তুলিয়া উড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু কবিত্বে তিনি ছিলেন কুলতিলক। শ্রীধর যে সুকথক ছিলেন ইহা বহু-বিঘোষিত। তিনি সুকণ্ঠ সু-গায়ক এবং সুপুরুষ ছিলেন তাহাও বহু প্রচলিত। তাঁহার কাব্যপ্রতিভাও আজ আর অবিদিত নহে। তাঁহাকে বাংলার দ্বিতীয় সারিমিঞা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার রচিত ভাবময় রসাল টপ্পা কিছুদিন পূর্বে এবং এখনও যাঁহারা টপ্পা গান করেন তাঁহাদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সেকালে যিনিই গাহিতে জানিতেন তাঁহারই মুখে শ্রীধর রচিত টপ্পা শোনা যাইত। সুরসিক গায়কশিল্পীমাত্রেই তাঁহার রচিত টপ্পা গান গাহিতে গাহিতে ভাবে বিভোর হইতেন। ইহা ছাড়াও শ্যামাবিষয়ক এবং কৃষ্ণবিষয়ক অপূর্ব ভাবময় বহু গীত শ্রীধর রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীধরের অনেকগুলি গীত নিধুবাবুর নামে প্রচলিত ছিল। রামনিধি গুপ্ত টপ্পা সঙ্গীতের রাজা। আর কালবশে শ্রীধরের নাম বাংলার শিক্ষিত সাহিত্য সমাজ হইতে একরকম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কবি নাম এককালে লুপ্তপ্রায় হইলেও গীতগুলি তাঁহার লুপ্ত হয় নাই কোনদিনই। অনেকেই ভাবিতেন, সুন্দর কবিত্ব সুমধুর টপ্পা এক নিধুবাবু ভিন্ন আর কাহারও হইতে পারেনা। অনেকেরই ধারণা ছিল,—

"ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানিনে॥
বিধুমুখে মধুর হাসি,—দেখতে বড় ভালবাসি,
তাই তোমায় দেখিতে আসি,—দেখা দিতে আসিনে।"

উপরিউদ্ধৃত গীতখানি নিধুবাবুর রচনা। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে,—রচনাটি শ্রীধরের। বহুদিন পূর্বে কয়েকজন সাহিত্যানুরাগী ভদ্রলোক, শ্রীধরের সমগ্র সঙ্গীত রচনা উদ্ধার করিবার মানসে শ্রীধরের ভ্রাতুষ্পুত্র কথকপণ্ডিত অতুল্যচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। তাঁহারা শুনিয়াছিলেন, শ্রীধর স্বয়ং তাঁহার

সমগ্র গীত রচনা একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই জীর্ণ, কীটদষ্ট খাতাখানি পণ্ডিত অতুল্যের নিকট ছিল। দেখা গেল শ্রীধরের স্বহস্ত লিখিত সেই খাতাখানিতে, 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।' রচনাটি লিপিবদ্ধ ছিল। কিন্তু খাতায় লিখিত গীত রচনাটির সঙ্গে প্রচলিত গীত রচনাটির পার্থক্য ছিল। শ্রীধরের খাতায় লিখিত গানটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে।
আমার সে ভালবাসা, তোমা বই জানিনে।
বিধুমুখের মধুর হাসি, দেখিলে সুখেতে ভাসি,
তাই আমি দেখিতে আসি,—দেখা দিতে আসিনে।'

নিম্ন উদ্ধৃত কয়েকখানি গীত রচনাও নিধুবাবুর নামে প্রচলিত ছিল।

১। "ওই যায়, যায় চায় ফিরে সজল নয়নে,
ফিরাও গো, ফিরাও গো ওরে অমিয়বচনে।
হেরি ওর অভিমান, দূরে গেল মোর মান,—
অস্থির হতেছে প্রাণ, প্রতি পদার্পণে।"

২। "তবে কি সুখ হত।
মন যারে ভালবাসে, সে যদি ভালবাসিত।
কিংশুক শোভিত-ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টকহীনে,
ফুল হইত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত।
প্রেম সাগরেরি জল, হতো যদি সুশীতল,
বিচ্ছেদ বাড়বানল, তাহে যদি না থাকিত।"

নিম্নলিখিত অন্য আর একখানি রচনা বহুদিন অন্য একজনের নামে প্রচলিত ছিল। পরে শ্রীধরের বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল।

"সখি আমায় ধর ধর।
রুনিতম্ব-হৃদি-পয়োধর-ভারে
ভূমেতে ঢলিয়া পড়ি।
ছিলাম অন্যমনে, বেণুরব শুনে,
কেন বা ধাইয়ে আইলাম কাননে,
উহু মরি মরি।
বাজিছে চরণে নব নব কুশাঙ্কুর।
ঘোরা তিমিরা রজনী সজনী।

কোথায় না জানি, শ্যাম গুণমণি।
পৃষ্ঠে দুলিছে লম্বিত বেণী,
কাল হইল মোর ;—
চাতকিনী যেমন ধায় বারি পানে,
তেমতি আমি ফিরি বনে বনে
নব জলধরে না হেরে নয়নে,—
প্রাণ হতেছে অস্থির।”—ইত্যাদি

শ্রীধরের কৃষ্ণ বিষয়ক গীত এবং কালী বিষয়ক সঙ্গীত যেন ভক্তি ও রসের সুধার প্রস্রবণ। তাঁহার টপ্পা রচনা ভাল, না, দেব-দেবী বিষয়ক রচনা ভাল ইহার বিচার করিতে বলিলে মনে হয় তাঁহার সবই ভাল। তাঁহার রচিত বহু টপ্পা গীত বেদ-বেদান্ত ভাবমাখা। যে প্রেমে বিরহ নাই, বিচ্ছেদ নাই, কলঙ্কভয় নাই, সেই আদর্শ প্রেমের কথা তিনি বহু রচনায় লিখিয়াছেন। সেইরূপ একখানি রচনায় সিন্ধু ভৈরবী সুর সংযোগে তিনি বলিতেছেন,—

পর-সনে প্রেম করা ঘটে কেমনে ?
ছিল না রবে না প্রেম, পরে বিচ্ছেদ কারণে।
পীরিতেরি রীতিক্রম, অভ্যাস কর প্রথম,
আপনাতে হলে প্রেম, কি কাজ করে দুজনে ?
আপনি যে প্রেমময়, ইহা কি নিশ্চয় নয় ?
বারংবার শ্রুতি কয়—জনশ্রুতিতেও জানে।
নিজসহ প্রেম হলে, কেউ তারে কিছু না বলে,
ভাসে না কলঙ্ক জলে, পোড়ে না মন-আগুনে।

শ্রীধরের রচনা বাংলার অতুল সম্পদ। যোগ্য সমাদরে বাংলাদেশ বহুদিন তাঁহাকে স্মরণ করিবে।

রসিকচন্দ্র রায়

হুগলী জেলার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বরের পশ্চিমে 'পালাড়া' গ্রামে ১২২৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে রসিকচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন। পালাড়া গ্রামে তাঁহার মাতুলালয় এবং এই মাতুলালয়েই তিনি শৈশবে প্রতিপালিত হন। হরিপালের প্রসিদ্ধ রায় বংশ তাঁহার পিতৃকুল। তাঁহারা রায় উপাধিধারী কায়স্থ। রসিকচন্দ্রের পিতার নাম রামকমল রায়। রামকমল মাতামহের কিছু বিষয় সম্পত্তি

পাইয়া হরিপাল হইতে আসিয়া শ্রীরামপুরের নিকটে বড়া গ্রামে বাস করেন। এই সময় রসিকচন্দ্রও পিতার তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। বাল্যকালে রসিকচন্দ্রের লেখাপড়ায় প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। মাত্র দশ বৎসর বয়সের সময় তিনি সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।

পাঁচালীকারগণের মধ্যে কবি দাশরথি রায়ের পরেই রসিকচন্দ্রের আসন নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। তিনিও একাদশ খণ্ড পাঁচালী রচনা করিয়া গিয়াছেন। পাঁচালী ছাড়াও 'হরিভক্তি চন্দ্রি', 'কৃষ্ণ প্রেমাঙ্কুর' প্রভৃতি কয়েকখানি পদ্যময় গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া বহু কবি, যাত্রা, কীর্ত্তন, তর্জ্জা, ও বাউল সম্প্রদায় গীত তিনি রচনা করিয়া দিতেন। তাঁহার আঠার বৎসর বয়সকালে রচিত "জীবন তারা" নামে পদ্যময় আখ্যায়িকাখানি অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হেতুবাদে গভর্ণমেণ্ট উহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। তাঁহার বাড়ীর সন্নিকটে একটি সুন্দর পুষ্পোদ্যান ছিল। সেই সুন্দর উদ্যানে কবি রসিকচন্দ্র অবসর সময় যাপন করিতেন। শেষ ও পরিণত বয়সে তিনি মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকরণে একটি সুন্দর কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কিয়দংশ মাত্র 'অনুসন্ধান' পত্রে প্রকাশিত হয়। মধ্যে মধ্যে দাশরথি রায়, রসিকচন্দ্রের এই সুন্দর উদ্যানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। তখন উভয় কবির মধ্যে বিলক্ষণ কাব্যালোচনা ও রসালাপ চলিত। ১৩০০ সালে ৭৩ বৎসর বয়সে কবি রসিকচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

কালী মির্জ্জা

গীতিকার কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ওরফে কালী মির্জ্জা। হুগলী জেলার গুপ্তি-পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বিজয়রাম চট্টোপাধ্যায়। বিজয়রামের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ কালিদাস বা কালী মির্জ্জা, কনিষ্ঠ রঘুনাথ। জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁহার ঠাকুর বংশীয় মহাত্মা গোপীমোহন ঠাকুরের আশ্রয়ে অতিবাহিত হয়। তাঁহার সঙ্গীত বিদ্যায় এবং বিবিধ সদ্গুণে মুগ্ধ হইয়া মহানুভব গোপীমোহন, তাঁহাকে আপন পারিষদ মধ্যে গণ্য করিয়া লন। কালীমির্জ্জা পলাশী যুদ্ধের সাত-আট বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বিংশতি বৎসর মধ্যে পরলোকগমন করেন।

বাল্যকাল হইতেই তিনি প্রখর-বুদ্ধিশালী এবং অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। এ ছাড়া সঙ্গীত বিদ্যার অনুশীলন করিয়া তিনি কাশী লক্ষ্ণৌ দিল্লীতে মহাত্মা গোপীমোহন

ঠাকুরের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। এর পূর্বে তিনি বর্দ্ধমানের যুবরাজ প্রতাপচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন। বর্দ্ধমান পরিত্যাগ করার পরও যুবরাজ প্রতাপচাঁদ মির্জ্জা মহাশয়কে মাসিক ১৫ টাকা করিয়া ভাতা দিতেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে মহাত্মা রামমোহন রায় কখনও কখনও মির্জ্জা মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিবার মানসে যাইতেন। পশ্চিমাঞ্চলে বহুদিন বসবাস করিয়া হিন্দুস্থানী বেশভূষায় অভ্যস্ত হওয়ায় সে সময়ের বড়লোকেরা তাঁহাকে মির্জ্জা আখ্যা প্রদান করেন। অত্যন্ত সদাশাপী ও অমায়িক হওয়ায়, তিনি সকলেরই প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে গুপ্তিপাড়া ব্রাহ্মণ সমাজের বহুদিনের প্রখ্যাত দলাদলি মির্জ্জা মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধের সময়ে তাঁহার অমায়িক ব্যবহারের গুণে বিদূরিত হয়। কলিকাতায় কোন ভারতবিখ্যাত সুগায়ক উপস্থিত হইলে যে সঙ্গীতের আসর হইত, মির্জ্জা মহাশয় প্রায়ই তাহাতে আমন্ত্রিত হইতেন। হিন্দু হিসাবে, সেকালের হিন্দুসমাজে রীতিমত তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। সেই কারণে তিনি শেষ জীবনে কাশীবাসী হন। মির্জ্জা মহাশয় ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ। গৌরাঙ্গ, দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ ও বিশালবক্ষ লইয়া যখন তিনি যেখানে উপস্থিত হইতেন, অচিরেই তিনি সকলের মনোহরণ করিতেন। প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার ৺কাশীপ্রাপ্তি ঘটে।

রাধামোহন সেন

কায়স্থ কুলোদ্ভব কবি রাধামোহন সেনদাস কলিকাতার কাঁসারীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নিবাসও ওইখানেই ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তাঁহার জন্ম হয়। অতি অল্প বয়সেই তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। রাধামোহন যেমন সুগায়ক, তিনি সুকবি এবং অনুরূপ সুরসিক পুরুষ ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ছাড়াও ফারসী ভাষাতেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত সঙ্গীত তরঙ্গ একখানি অমূল্য সঙ্গীত বিজ্ঞানের গ্রন্থ। এই গ্রন্থই প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণ করে,—তিনি কিরূপ সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। 'রসসার সঙ্গীত' রাধামোহন রচিত একখানি অন্যতম সঙ্গীত পুস্তক। ১২৪৫ সালে, তাঁহার এই গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত হয়। দুইখানি সঙ্গীত সম্বন্ধীয় পুস্তক ছাড়াও তিনি 'অন্নপূর্ণা-মঙ্গল' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থে, তিনি যে সকল স্থান ভ্রম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে সেই সব সম্বন্ধে নিজের অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

গোপাল উড়ে

উড়িষ্যা প্রদেশে কটক জেলার জাজপুর গ্রামে অতি দুঃখী পিতার ঘরে গোপালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা আদা ও বেগুনের চাষ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। জাতিতে তাঁহারা করণ। গোপালের পিতার নাম মুকুন্দ। মুকুন্দর তিন পুত্র। তাহার মধ্যে গোপাল মধ্যম বা দ্বিতীয়। ১৮/১৯ বৎসর বয়সকালে গোপাল কলিকাতায় আসেন। ইতিপূর্বে গোপালের বিবাহ হইয়াছিল। প্রথম জীবনে গোপাল গান গাহিতে জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার গলার স্বর অত্যন্ত মধুর ছিল।

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বের কথা। কলিকাতায় বৌবাজারে রাধামোহন সরকার নামে একজন গণ্যমান্য গীতশিল্পে উৎসাহী ব্যক্তি একটি বিদ্যাসুন্দরের যাত্রার দল স্থাপন করেন। এই বিদ্যাসুন্দরের যাত্রাই কলিকাতা বা বাংলাদেশে প্রথম সখের যাত্রা। রামমোহনের বয়স তখন ৩০ বৎসর। যাত্রার আখড়াই হইত রাত্রিতে কিন্তু প্রথম প্রথম বলিয়া উৎসাহে তাহা চলিত সারাদিন। বৌবাজারের মতিলাল গোষ্ঠী, (হৃদয়রাম) বাঁড়ুজ্যে গোষ্ঠী, ধর গোষ্ঠী সকলেই এই যাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে—টেলিমেকস অনুবাদক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এই যাত্রায় সখী সাজিয়া অভিনয় করিতেন।

একদিন মধ্যাহ্নে বৈঠক চলিতেছে এমন সময় রাজপথে মধুর কণ্ঠের একজন ফিরিওয়ালার হাঁক শোনা গেল,—

"চাঁপাকলা"

তাঁহার হাঁক বৈঠকখানায় বাবুদের কাণে আসিয়া পৌছিল। আসরে তানপুরা ও অন্যান্য যন্ত্রাদি যে সুরে বাঁধা ছিল এবং যে গান্ধার প্রবণ রাগিনী গীত হইতেছিল ফিরিওয়ালার কণ্ঠস্বরের "চাঁপাকলা" হাঁকটি পরিষ্কার মধুরভাবে সে গান্ধারে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। বিশ্বনাথ মতিলাল মহাশয় তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন —ওরে কে আছিস, গান্ধারে হেঁকেছে হেঁকেছে যে চাঁপাকলাওয়ালা। কয়েকজন গিয়া চাঁপাকলাওয়ালাকে ধরিয়া আনিল। সেই চাঁপাকলাওয়ালাই গোপাল উড়ে।

বৈঠকখানায় আসিয়া পৌছিল চাঁপাকলাওয়ালা। চারিদিক হইতে প্রশ্নের ঝড় বহিতে লাগিল। বাড়ী কোথায়, কি জাতি, কোন বর্ণ,—পিতার নাম কি, বয়স কত, গান গাহিতে জানে কিনা, ব্যবসায়ে কত উপার্জন হয়? একে একে সকলের প্রশ্নের উত্তর দিয়া গোপাল বসিবার স্থান পাইল। গুণগ্রাহী বাবুদের

অনুগ্রহে, গোপালের ফিরিওয়ালাগিরি ঘুচিল এবং রাধামোহনের নিকট দশটাকা বেতনে নিযুক্ত হইল।

চাকরী গোপালের হইল। কিন্তু কাজ কিছুই নাই। বাবুদের সঙ্গীতের গুরু হরিকিষণ মিত্রের নিকট গোপাল গান করিতে লাগিল। কণ্ঠে প্রকৃতির অপার দান তাই গোপালকে 'সা রে গা মা সাধিতে হইল না'। পরিবর্তে অতি সহজেই এবং অল্প আয়াসেই ঠুংরি গান সব আয়ত্ত করিতে লাগিল গোপাল; এবং মাত্র এক বৎসরের মধ্যে সব ছোক্‌রাদের চেয়ে অধিকতর গুণী হইয়া উঠিল। মাত্র এই এক বৎসরের মধ্যেই গোপাল এত ভাল বাংলাভাষা শিখিল যে তাহার কথা শুনিয়া কেহ আর তাহাকে উড়িষ্যাবাসী বলিয়া বুঝিতে পারিত না। বেশভূষায় চালচলনে গোপাল দ্বিধাহীন চিত্তে এদেশবাসী হইয়া বাংলা ভাষা ও গানের সাধনা করিয়া সর্বতোভাবে সফলতা অর্জন করিল।

পুরা দুই বৎসর আখড়াইয়ের পর রাধামোহন সরকারের যাত্রা খোলা হইল। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীতে প্রথম যাত্রার আসর বসিল। এই আসরে গোপাল মালিনী সাজিয়া ছিল। দর্শকেরা সকলেই মালিনীকে প্রকৃতই মনে করিয়াছিলেন। মালিনীর গানে, ভাবভঙ্গীতে ও অভিনয়ে দর্শকমাত্রই যেন চিত্র-পুত্তলিকাবৎ নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। গোপালের জয়-জয়াকার হইল। রাধামোহনের আনন্দের আর সীমা রহিল না। গোপালের বেতন পঞ্চাশ টাকা হইয়া গেল। ইহার পর আরও দুইবার রাধামোহনের যাত্রায় আসর হইয়াছিল। একবার হাটখোলার দত্ত বাবুদের বাড়াতে, আর একবার সিমলে ছাতুবাবুর বাড়ীতে। এই যাত্রা এবং তাহার আনুষাঙ্গিক ব্যাপার রাধামোহনের লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে রাধামোহনের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে দলেরও মৃত্যু সূচিত হয় কিন্তু যাহা থাকিবার তাহা রহিল। সুযোগ্য গোপাল উড়ে আর বিদ্যাসুন্দরের পালা। গোপাল, 'বিদ্যাসুন্দর' পালার আমূল সংস্কার সাধন করিলেন। সহজ বাংলা ভাষায় গীত রচনা করিয়া গোপাল নূতন পালার সৃষ্টি করিলেন।

নিজের দলে প্রায় দশ বৎসর যাত্রা করিয়া গোপালের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে বাংলাদেশের বিশিষ্ট সকল বারোয়ারীতেই যাত্রার আসরের বায়না পাইতেন। তৎকালীন যাঁহারা একবার তাঁহার গান শুনিতেন তাঁহারা আর জীবনে গোপালকে বিস্মৃত হইতে পরিতেন না।

সুপুরুষ গোপালের বর্ণ গৌর এবং আকৃতি কৃশ ও খর্ব ছিল। গালে মুখে দাঁড়িগোঁফের রেখা ছিল খুবই কম। বিনয়ী ও শিষ্ট গোপাল কথা কহিতেন বড় সুন্দর এবং ইহাই ছিল তাঁহার জীবিকার্জনের বড় পথ। চল্লিশ বৎসর বয়সে এই সুন্দর ভাস্বকার মানুষটির অকালবিয়োগ ঘটে।

মাইকেল মধুসূদন

১২৩০ সালের ১২ই মাঘ শনিবার যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁহার পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত এবং মাতা জাহ্নবী দেবী। গ্রামের পাঠশালাতেই মধুসূদনের বাল্যকালের শিক্ষার শুরু। বার বছর বয়সে পিতা রাজনারায়ণ তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া হিন্দু কলেজে ভর্তি করিয়া দেন। ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী অধ্যাপক জাতীয় ব্যক্তিদের সাহচর্য্যে মধুসূদন ক্রমে ক্রমে ইউরোপীয় আচার ব্যবহারের চরম পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। অবশেষে তিনি স্বধর্ম পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজদের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন মাদ্রাজ গমন করেন। এই সময়ে "ক্যাপটিভ" তাঁহার প্রথম ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ। স্থানীয় ইংরাজী সংবাদ পত্রেও তিনি নিয়মিতভাবে লিখিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে এক ইংরেজ মহিলা রেবেকার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলে তিনি দেশের নিষ্ঠাবান হিন্দুদের বিরাগভাজন হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহার কাব্যপ্রতিভাকে সকলেই আন্তরিকভাবে ভালবাসিতেন। মাদ্রাজে আটবৎসর থাকিবার পর তিনি পুনরায় সস্ত্রীক কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুরোধে তিনি সংস্কৃত নাটক "রত্নাকর" ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ১৮৫৮ সালের ৩১শে জুলাই পাইকপাড়ার বেলগাছিয়া বাগানে সেই নাটক মহাসমারোহের সঙ্গে প্রথম অভিনীত হয়।

এই সূত্রেই বোধহয় মাতৃভাষার প্রতি মধুসূদনের ক্রমে ক্রমে ভালবাসা জন্মিতে থাকে। উক্ত বেলগাছিয়ায় অভিনীত নাটকটি শোনার পরই তিনি একে একে 'পদ্মাবতী' 'একেই কি বলে সভ্যতা, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রভৃতি বহু নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তাঁহার 'তিলোত্তমা সম্ভব' নামে প্রথম কাব্য-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে "মেঘনাদবধ", "কৃষ্ণকুমারী" নাটক-"ব্রজাঙ্গনা" ও "বীরাঙ্গনা" কাব্যগ্রন্থ সমূহ প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ চিরদিনই প্রতিভার পূজারী। তাই এই সময়ে তাঁহার এই অসামান্য প্রতিভা-সৌরভে দিক্‌দিগন্ত পূর্ণ হইয়া যায়।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন ব্যারিস্টারী পড়িবার জন্য তিনি ইংলণ্ড গমন করেন। প্রবাসে অবস্থান কালেই তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচিত হয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চমাসে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে তাঁর রোজগারের পরিমাণ ছিল খুবই অল্প। অবশেষে অসহনীয় দারিদ্র্য যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে ১২৮০ সালের ১৬ই এই অসীমক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিভাধর ব্যক্তির জীবনসূর্য মহাকালের অস্তাচলে ঢলে পড়ে।